ছবি বানানোর গল্প
হুমায়ূন আহমেদ

ছবি বানানোর গল্প □ হুমায়ূন আহমেদ

বাংলাদেশের জনগণের অহংকার ও গৌরব এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় এই মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আমাদের উজ্জ্বল শিল্প মাধ্যমগুলোতে যেমন চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে নানা ভাবে এসেছে। এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গত পঁচিশ বছরে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ছবিতে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল খন্ডিত, অনেকাংশে বিকৃত বা অনুপস্থিত এবং সেজন্যেই ছবিগুলো অনুল্লেখ্য।

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার **হুমায়ূন আহমেদ** নিবেদিত মনে ও প্রাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন। তাঁর উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি', এক অসাধারণ কাহিনী। সেই অসাধারণ কাহিনীর অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ দিয়ে অর্জন করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার '৯৪-এর শ্রেষ্ঠ কাহিনীসহ পুরস্কারের বিভিন্ন শাখায় মোট **৮টি** পুরস্কার। যা এদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক অনন্য ও বিরল ঘটনা।

এ বছর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে আমরা প্রকাশ করলাম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবি আগুনের পরশমণি নিয়ে লেখক-পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ-এর নতুন বই

ছবি বানানোর গল্প।

এই গল্প ছাড়াও বইটিতে আরো রয়েছে চিত্রনাট্য, ওয়ার্কিং চিত্রনাট্য, মূল উপন্যাস ও অপ্রকাশিত বেশ কিছু রঙ্গীন স্থির চিত্র।

আমাদের বিশ্বাস কুশলী লেখকের ঈর্ষণীয় দক্ষতায় ও বিষয় বৈচিত্র্যের অনন্যতায়

ছবি বানানোর গল্প

বইটি এ দেশের প্রকাশনায় সংযোজন করবে নতুনতম বিশিষ্টতা। এবং স্বভাবতঃই আমাদের প্রত্যাশা পাঠকমাত্রই তা অনুভব করবেন খুব সহজেই।
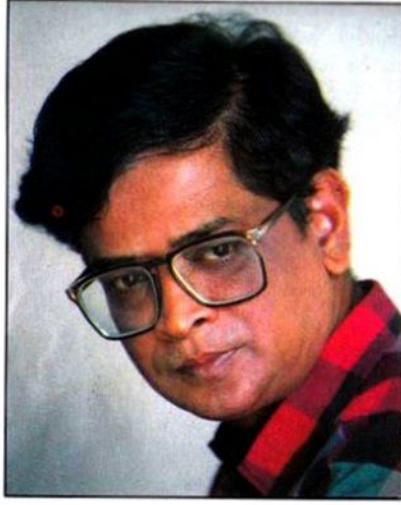
হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনারত।

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে হুমায়ূন আহমেদ একটি বিশিষ্ট নাম। গল্প-উপন্যাস, নাটক, টিভি নাটক, কল্প বিজ্ঞান, শিশুসাহিত্য— যেখানেই হাত দিয়েছেন তা হয়ে উঠেছে পাঠক ও দর্শক নামক জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত ও বিমোহিত করার সোনার কাঠি। তাইতো সবকিছুতেই পেয়েছেন উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা।

তাঁর প্রতিটি বইয়ের কাহিনী বিন্যাসে পরিমিতি বোধ ও বর্ণনায় সাবলীলতা সহ যে প্রসাদগুণ সহজেই লক্ষণীয় তাতে পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করে রাখে।

একমাত্র লেখালেখিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে সম্প্রতি তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর নিজের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি'র চলচ্চিত্রায়নের মাধ্যমে। এবং এই মাধ্যমেও তিনি তাঁর স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে অর্জন করেছেন জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি।

একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, শিশু একাডেমী পুরস্কার, বাচসাস পুরস্কার সহ পেয়েছেন আরো অনেক নামী দামী জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পুরস্কার। আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'অনারারী ফেলো ইন রাইটিং' সম্মানে সম্মানিত করেছে। সম্প্রতি জাপানের NHK টেলিভিশন তাঁকে নিয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছে।

মেধা, মনন ও প্রতিভার যথার্থ সংমিশ্রণ-এর নাম হুমায়ূন আহমেদ— একথা সবিনয়ে বলা যায়।

প্রচ্ছদ □ ধ্রুব এষ

ছবি বানানোর গল্প
হুমায়ূন আহমেদ
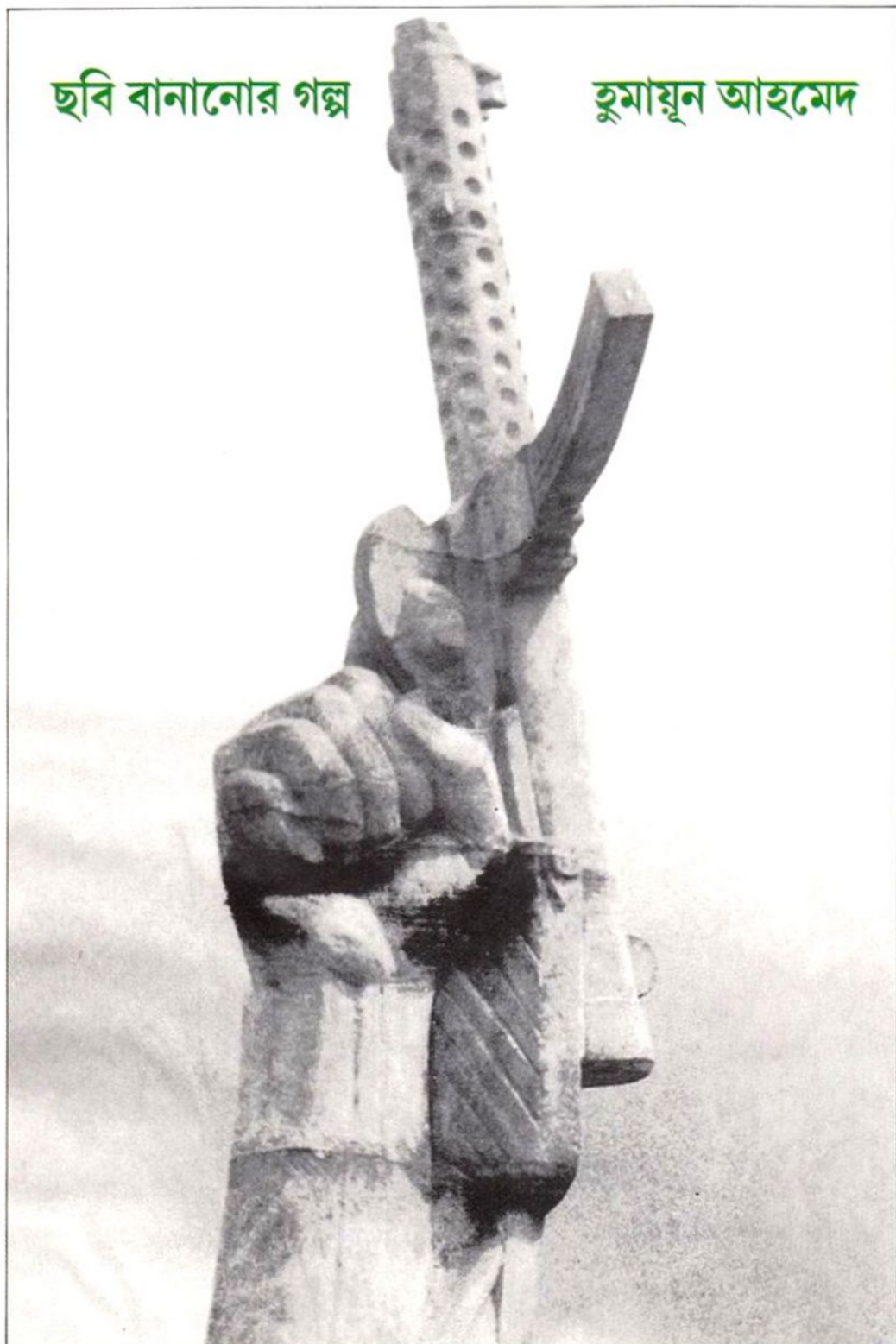
ছবি বানানোর গল্প ☐ হুমায়ূন আহমেদ
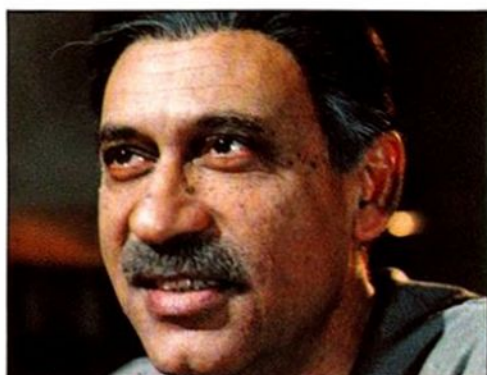
ছবি বানানোর গল্প □ হুমায়ূন আহমেদ

প্রথম প্রকাশ □ জুলাই, ১৯৯৬
প্রকাশক □ আহমেদ মাহফুজুল হক
সুবর্ণ
১৫০ ঢাকা স্টেডিয়াম (দোতলা) ঢাকা ১০০০
ফটোকম্পোজ □ জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ ঢাকা ১২০৪
মুদ্রণ □ লিপি প্রিন্টিং প্রেস
৭/৩, ভগবতী ব্যানার্জী রোড ঢাকা ১২০৩
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ □ ধ্রুব এষ

পরিবেশক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ISBN-984-459-021-3

মূল্য ঃ ২২৫·০০ টাকা মাত্র

STORY OF FILM MAKING
HUMAYUN AHMED

First Published □ July, 1996
Publisher □ Ahmed Mahfuzul Haq
SUBARNA
150 Dhaka Stadium (1st Floor) Dhaka 1000
Cover Design & illustration □ Dhruba Esh

Distributors
MOWLA BROTHERS
39 Bangla Bazar Dhaka 1100
KAKALI PROKASHANI
38/4 Bangla Bazar Dhaka 1100
ISBN-984-459-021-3

Price : Tk. 225.00 □ US $ 12.00

উৎসর্গ

আগুনের পরশমণির বিন্তি, গাজীপুরের পুতুল একদিন আমাকে এসে বলল, আমার জীবনের একটা স্বপ্ন হল হঠাৎ একদিন আমি দেখব আপনি আমাকে একটা বই উৎসর্গ করেছেন। আপনি আমাকে একটা বই উৎসর্গ করলে আমি আমার বাকী জীবনে কারো কাছেই কিছু চাইব না। আমার এই স্বপ্ন কি আপনি পূর্ণ করতে পারেন না ?

আমি বললাম 'না'। তারপরেও ছবি বানানোর গল্প বইটি

হোসনে আরা পুতুল

এর জন্যে।

আশা করি বাকী জীবনে সে কারো কাছে কিছু চাইবে না।

প্রকাশকের নিবেদন

জননন্দিত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ যখন তাঁর লেখার মাধ্যমে পাঠকপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন, যখন এদেশের প্রকাশনা জগতকে যথেষ্ট শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যখন এদেশের পাঠক আরও নিত্যনতুন বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ তাঁর লেখার জন্য উণ্মুখ হয়ে আছেন, যখন তাঁর একেকটি বই অতীতের মুদ্রণ সংখ্যা একের পর এক অতিক্রম করছিল, ঠিক তখনই তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। ফলে স্বভাবতঃই আমার মত নগণ্য একজন প্রকাশকের মনে কিছুটা কৌতূহল ও সেই সঙ্গে আশংকাও জন্ম নিয়েছিল। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না লেখালেখির জগত থেকে সিনেমার জগত-এ তাঁর পা রাখার কি এমন হেতু রয়েছে। তা-ও আবার এদেশের সবচে' উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের দুঃসাহসিক প্রয়াস নিয়ে।

যদিও আমরা সবাই জানি তিনি দীর্ঘদিন থেকে পরম পারঙ্গমতার সাথে টিভি নাটকে তাঁর অনন্য শক্তিমত্তা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ঈর্ষণীয় অবস্থানে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু 'ছবি বানানো' যে জটিল প্রযুক্তিগত একটি বিশাল কর্মকান্ড এ বিষয়ে তাঁর ধারণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কতটুকু তা আমার কাছে একেবারেই অজানা ছিল। এ নিয়ে তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে কিছু কথা হয়েছে। আমি অবলীলায় আমার আশংকার কথা তাঁকে জানিয়েছি। তিনি প্রত্যুত্তরে সপ্রতিভভাবে তাঁর কথা বলেছেন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'ছবি বানানো'র খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তবুও আমি আমার নিজের মনে প্রবল সন্দেহ নিয়ে চলছিলাম।

ইতিমধ্যে অনেক চলচ্চিত্র সমঝদার, ছবি বানানোর ব্যাকরণ সম্পর্কে ছিটেফোটা অভিজ্ঞ এবং সর্ববিষয়ে একপেশে ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ একবাক্যে হুমায়ূন আহমেদের চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে কাজ করাকে তাঁদের সহজাত কথায় অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেছেন। আমিও প্রায়ই সায় দিয়ে চলতাম তাঁদের মতামতকে। তাঁদের অনেক মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতাম এবং মনে মনে নিশ্চিত হলাম হুমায়ূন আহমেদ এ ব্যাপারে অর্থাৎ ছবি পরিচালনায় এদেশের অনেক ব্যর্থ পরিচালকের খাতায় নাম লেখাবেন। মনটা স্বভাবতঃই আশংকা ও বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ছবি প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁর কাজের প্রতি কিছুতেই আস্থা রাখতে পারছিলাম না।

হুমায়ূন আহমেদের ছবির কাজ একদিন যথাসময়ে মহাধুমধামে শুরু হল। কয়েকদিন পর পর এফডিসি'তে ছবির সেটে উপস্থিত হই। শুটিং-এর বিভিন্ন পর্যায় দেখি, অনেক কিছুই বুঝি না। আড়ালে আবডালে পরিচিত অনেকের সাথে কথা বলি। আমাকে অবাক করে সবাই আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁর পরিচালনায় অভিনয় করে তৃপ্তিবোধ করছেন এবং কলাকুশলীরাও তাঁর কাজের প্রতি আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। এবং কথা প্রসঙ্গে দৃঢ় আশা প্রকাশ করে সবাই জানালেন, 'আগুনের পরশমণি' এদেশের ছবির ইতিহাসে একটি 'নতুন মাত্রা' যোগ করবে। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকাগুলোও ছবির সচিত্র খবর ছেপে ছবি সম্পর্কে আশার কথা শুনালেন এদেশের পাঠক ও দর্শকদের। তবুও যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটছিলো না।

অনেকের মত আমিও তাঁর সাফল্য কামনা করেছি। আমার আশংকা ও সন্দেহ যেন সর্বাংশে বিরাট মিথ্যে প্রমাণিত হয় এই ইচ্ছেকে লালন করেছি সঙ্গোপনে, আন্তরিকভাবে শুভকামনা করেছি অবচেতন মনে।

আমার এই কামনা ও ইচ্ছের কথা অলক্ষ্যে বিধাতা শুনেছেন হয়তো। হ্যাঁ, অবশ্যই শুনেছেন। তা না হলে 'আগুনের পরশমণি' ছবিটির 'প্রিমিয়ার শো'র আগে ছবিটি যখন এফডিসিতে কয়েকদিনের ব্যবধানে পর পর দু'বার দেখলাম তখন নিজেই আনন্দে, বিস্ময়ে ও শিহরণে হয়েছি লা-জওয়াব। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো মুহূর্তের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার সযতনে লালিত নিজের সীমাবদ্ধ চিন্তা ও ধারণার জন্য লজ্জিত হয়েছি মনে মনে, নিজের অজ্ঞতার জন্য ধিক্কার দিয়েছি নিজেকে নিজে। এবং অতিসহজেই পরিচালকের কাজের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছি শতবার।

অন্যদিক ছবি বানাতে গিয়ে তাঁর যে অতি প্রয়োজনীয় নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে সেসব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা তিনি যখন শুটিংয়ের ফাঁকে ও কাজের অবসরে অনেকের কাছে তাঁর স্বভাবসুলভ রসময় ভাষা ও ভঙ্গীতে বলতেন তা আমরা অনেকেই নিবিষ্ট মনে সেসব শুনে তখন দারুণভাবে উপভোগ করতাম। এবং সেসব কথা শোনার জন্য প্রায়ই তাঁর আশেপাশে থাকার চেষ্টা করতাম।

পরবর্তী সময়ে একটি ভাবনা আমার মধ্যে দ্রুত কাজ করে। আমি তাঁকে আমার ভাবনার কথা জানাই। বলি, ছবি বানাতে গিয়ে আপনার বেশকিছু অভিজ্ঞতার কথা আমরা অনেকেই অনেকদিন শুনেছি। এতদিন যা যা শুনেছি সেগুলো একটি বইতে আমি আপনার অসংখ্য পাঠক ও দর্শকের কাছে তুলে ধরতে চাই। সেই সঙ্গে যোগ করতে চাই আপনার

নিজের হাতে করা 'আগুনের পরশমণি'র চিত্রনাট্য এবং কিছু কিছু 'স্থিরচিত্র'- যা পাঠকমাত্রকেই দেবে ভিন্নস্বাদ ও অনন্য আনন্দ।

আমার এই ভাবনাকে পুঁজি করে হুমায়ূন আহমেদকে সময়ে অসময়ে বার বার তাগাদা দিয়েছি, প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিয়েছি। আমার সৌভাগ্য তিনি আমার এই তাগাদা ও নাছোড়বান্দাগিরি সহজ ও আন্তরিকভাবে নিয়েছেন কোনরকম বিরক্তবোধ না করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের ছবির প্রতি আমার দুর্বলতা, পক্ষপাতিত্ব ও আকর্ষণ তো ছিল আর তাছাড়া এর সাথে যুক্ত হয়েছে আরো ছোট্ট দুটি ঘটনা 'আগুনের পরশমণি' ছবিতে। প্রথমতঃ এই ছবিটির কিছু উল্লেখযোগ্য দৃশ্য আমাদের ওয়ারীর বসতবাড়িতে চিত্রায়িত। (শুটিং শেষ হবার পর আমরা বাড়িটির আংশিক ভেঙ্গে নতুন বাড়ী বানিয়েছি। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এই বাড়িটিকে যখন সেলুলয়েডে দেখবে তখন তাঁদের কাছে তা গর্বিত স্মৃতি হিসেবে বিবেচিত হবে।)

দ্বিতীয়তঃ আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা তিথি এই ছবিতে আসাদুজ্জামান নূরের ছোটবোনের সামান্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছে। এটা তিথির জন্য ও আমাদের সবার জন্য আনন্দের ও গৌরবের।

যথাসময়ে 'আগুনের পরশমণি' ছবিটি মুক্তি পেলো। অনায়াসেই ছবিটি এদেশের দর্শকমাত্রকেই করেছে আলোড়িত, করেছে বিমোহিত। মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ সময়ের কথা স্মরণ করে অনেকেই হয়েছেন ভারাক্রান্ত ও অভিভূত এবং নতুন প্রজন্ম জেনেছেন মুক্তিযুদ্ধের অনেক দুঃসাহসী ও নির্মম ঘটনা। আমাদের সবার মাঝে এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন করে জাগ্রত করেছে এই ছবি, এই গভীর বিশ্বাস আমার মত অনেকের মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে এবং এটা ছিল সঙ্গতকারণেই।

ইতিমধ্যে এই ছবি যখন তার ন্যায্যপ্রাপ্য হিসেবে ১৯৯৪ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বিবেচিত ও নির্বাচিত হয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ৮টি শাখায় পুরস্কৃত হয়েছে তখন আমাদের অনেকের চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের এই প্রয়াস যখন জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেলো তখন সবাই মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

ছবিটি মুক্তি পাবার পর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও পত্র-পত্রিকাগুলো তাদের অকৃপণ প্রশংসা ও ইতিবাচক আলোচনার মাধ্যমে এদেশের অসংখ্য দর্শকের দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছেন মুক্তিযুদ্ধের ছবির প্রতি। আমি এই সুযোগে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা বইটির পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে চাই দ্বিধাহীনভাবে, নতুন করে আবার স্মরণ করার জন্যে।

□ 'আগুনের পরশমণি ছবিটি দেখে আমি অভিভূত। একাত্তুরের অবরুদ্ধ নগরীর প্রতিহিংসা, আবেগ, আকুতি, ভালোবাসা আর ঘৃণার এ এক বিশ্বস্ত দলিল। আমাদের চেতনার শিখাকে প্রদীপ্ত রাখার জন্যে এমন শিল্প সার্থক নির্মাণেরই প্রয়োজন।' — **অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক**। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

□ ...... 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এ ছবি দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে দেবে এবং সে আগুনের স্পর্শে আমরা সবাই সোনার মত খাঁটি হবো। নতুন করে স্বাধীনতার মর্ম অনুধাবন করতে পারবো।'
- প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ। মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী।

□ মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের একটি পরিবারকে নিয়ে 'আগুনের পরশমণি' তৈরি হয়েছে। ছায়াছবির পরিভাষায় এটা কতটুকু ছবি হয়েছে সে আলোচনায় না গিয়েও নির্দ্বিধায় বলা যায় এটি একটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়স্পর্শী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি — **যায়যায়দিন** ঢাকা।

□ অবলুপ্ত চৈতন্যের স্বাক্ষর- 'আগুনের পরশমণি'। .... হুমায়ূন আহমেদ সার্থক দর্শকের মনে অহেতুক আতিশয্যের কোন সুড়সুড়ি দিতে চাননি। ছবিটি অহেতুক রোমান্টিকধর্মী করে কিংবা যুদ্ধের ভয়াবহতার পৌনঃপুনিক দৃশ্যের অবতারণা করে। সর্বত্রই পরিমিতিবোধ দর্শককে আশ্বস্ত রেখেছে। — **দৈনিক সংবাদ** ঢাকা।

□ 'আগুনের পরশমণি' হৃদয়ে ঝড় তোলার মত ছবি। মানুষ এখনো মুক্তিযুদ্ধের যে কোন কিছুতেই সমান আলোড়িত হয়। তাঁদের মধ্যে সেই চেতনা এখনো বিদ্যমান। 'আগুনের পরশমণি' সেই প্রমাণ রেখেছে। — **দৈনিক খবর** ঢাকা।

□ হুমায়ূন আহমেদ আগুনের পরশমণি' ছবি করে একজন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার এবং সেই সঙ্গে দেশপ্রেমিকের পরিচয় দিয়েছেন। — **ভোরের কাগজ** ঢাকা।

□ 'আগুনের পরশমণি' মুক্তিযুদ্ধের অনন্য দলিল — **দৈনিক পূর্বকোণ** চট্টগ্রাম।

□ দুই ঘন্টার ছবি 'আগুনের পরশমণি'। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও ছবির মধ্যে কোন ছন্দপতন

হয়নি। প্রতিটি সংলাপকে মনে হয়েছে ছবির জন্য সঠিক। সব মিলিয়ে 'আগুনের পরশমণি' একটি বাস্তব চিত্র। — **সাপ্তাহিক খবরের কাগজ** ঢাকা।

☐ 'আগুনের পরশমণি' ছবির কাহিনীর মধ্যে দিয়ে পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের সেই বিক্ষুব্ধ অসহনীয় অবস্থার মধ্যেও রোমান্টিকতা এনেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। ..... মুক্তিযুদ্ধের ছবি হিসেবে 'আগুনের পরশমণি' একটি ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। যা আমাদের গর্বের ইতিহাস। — **দৈনিক বাংলা** ঢাকা।

☐ 'আগুনের পরশমণি' ছবি তৈরির জন্য হুমায়ূন আহমেদকে ধন্যবাদ। 'বাঙালী তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে চিরদিন। একটি জাতির মুক্তিযুদ্ধকে চিত্রায়িত করার সাথে সাথে তিনি তাঁদের বিশ্বাসকেও ধারণ করেছেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে অবহেলা ও কটাক্ষ করেননি'। — **বাংলাবাজার পত্রিকা** ঢাকা।

☐ এতবড় মাপের ছবি বাংলাদেশে আগে কখনো হয়নি —জানিনা সামনে কেউ আসবেন কিনা এরকম ছবি বানানোর মেধা নিয়ে। — **কবীর আনোয়ার** চলচ্চিত্র পরিচালক।

☐ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি 'আগুনের পরশমণি' এবং এই আগুনটাও প্রতীকী। দ্বিবিধ ব্যাখ্যা হতে পারে এর —যুদ্ধের আগুন এবং স্বাধীনতা রূপ প্রভাত সূর্যের উত্তাপ। বাংলা শো অপেরার সিনেম্যাটিক ভার্সানে তৈরির একটা প্রচেষ্টা এতে লক্ষণীয় এবং সম্ভবতঃ হুমায়ূন আহমেদ সচেতনভাবেই একাজটা করেছেন। দৃশ্যান্তরের সিনেম্যাটিক স্বাভাবিক দুরত্বকে পরিহার করে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন পুরো কাহিনী ও চিত্রনাট্যে। ঘটনাগুলোকে ঘটিয়েছেন খুব নির্লিপ্তভাবে। যুদ্ধের উন্মত্ততা এবং জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ সুতীব্র নয় কিন্তু তীক্ষ্ণ। — **দৈনিক জনকণ্ঠ** ঢাকা।

☐ বদি আলম ও আমি ২৮ নং রোডের একটি অফিস বাড়িতে থাকতাম '৭১ সালে। আপনার 'আগুনের পরশমণি' ছবির বদি, আমাদের বদি ? তার নামও ছিল বদিউল আলম। সেদিন এফডিসি'তে ছবিটি দেখলাম। আলম, ফতে ও আমি। বদিকে বারবার মনে পড়ছিল। আমার মনে হলো আলমই কি বদি ? অথবা ফতে ? এমন হতে কি পারতো না —আমিই আপনার বদি ? সবাই চোখের পানি ফেলছে আমার জন্যে ? পাশে বসা আমার স্ত্রী দু'বার আমার হাত চেপে ধরেছিল, ডুকরে কেঁদেছিল, তাকি আমার জন্যে ? ছবির শেষে অবাক হয়ে আমাদের দেখছে; দেখছে আমি বেঁচে আছি। আমি কি সত্যিই বেঁচে আছি ? বদি কিন্তু বেঁচে থাকবে আপনার 'আগুনের পরশমণি'তে। আমাদের আগুনের স্পর্শ দিতে। বদি বেঁচে আছে। — **শাহাদত চৌধুরী** সাপ্তাহিক বিচিত্রা। ঢাকা ও মুক্তিযুদ্ধে ২নং সেক্টরের ক্র্যাক প্লাটুন সদস্য বদিউল আলমের সহযোদ্ধা।

প্রকাশক বন্ধু আলমগীর রহমানের সৌজন্যে প্রাপ্ত 'আগুনের পরশমণি' প্রসঙ্গে কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখক সমালোচকদের মন্তব্য তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

☐ বাংলাদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের পরিচালিত একমাত্র ছবি 'আগুনের পরশমণি'। যদিও ছবি দেখে সে কথাটা একবারও মনে হয়নি। ছবির প্রথম দিকটা কিছুটা অসংলগ্ন এবং গতিহীন মনে হলেও সময়ের সঙ্গে মুগ্ধ হতে হয়েছে পরিণত দৃশ্য পরিকল্পনা ও ঘটনা প্রবাহে। বাইরের দৃশ্যের তুলনায় ঘরোয়া পরিবেশে অনেক বেশী সুপরিচালনার ছাপ রেখেছেন পরিচালক। ..... অভিনয়কারী শিল্পী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির জন্য মনে কেড়েছেন। এ ছবিতে গানের ব্যবহার প্রশংসনীয়। বিশেষ করে পরিস্থিতি অনুযায়ী রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহার ভালো লেগেছে। — **ত্রিদিব ঘোষ**।

☐ প্রেম আর যুদ্ধের একাকার হয়ে ওঠা ছায়াছবি 'আগুনের পরশমণি'। বাংলাদেশের ছবি। আগুনের পরশমণি ছবিটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, মানুষ, প্রেম-বিরহ, স্বদেশ প্রেমের মেল বন্ধন। পরিমিতি বোধের দাবীদার ছবির দৃশ্যপট। স্বৈরাচারীর ছড়ানো যুদ্ধ বিভীষিকার বিস্তর উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছবিটিতে যা দর্শকদের আতংকিত করেছে। ..... একটা বিশেষ সময়কে ধরে রাখলেও তা কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে মানবিক ঘাত প্রতিঘাতে, দৃশ্যায়নে। — **সমীরণ দত্ত গুপ্ত**।

☐ বাংলাদেশ থেকে একফালি মেঘ কলকাতার বুকে। ..... হুমায়ূন আহমেদ একজন নামী লেখক এবং তিনি ছবিও তৈরী করেন। অবশ্যই ভাল মানের ছবি। ...... বর্তমান উৎসবে প্রদর্শিত হুমায়ূন আহমেদের আগুনের পরশমণি ছবিটিকে সাহায্য করেছিল সরকার। সাফল্য এসেছে হাতে হাতে। — **দেবাশিস চৌধুরী**।

উল্লেখিত মন্তব্য ও মতামত ছাড়া আরো অনেক লেখা আমার অগোচরে অলক্ষ্যে রয়েছে অবশ্যই। সেগুলো এখানে না দিতে পারার— এই অপরাগতার জন্য আমি দুঃখিত।

ছবির চিত্রনাট্য যোগাড় করে রাখা হয়েছিল বইটিতে সংযুক্ত করার জন্য। কিন্তু অসুবিধায় পড়লাম তখনই যখন চিত্রনাট্যটি কম্পোজে দেয়া হলো। কারণ পরিচালক ছবি বানাতে গিয়ে শুটিং এর প্রয়োজনে চিত্রনাট্যটির উপরে বিভিন্ন রংয়ের কালিতে এত আকাঁজোকা, কাটাছেঁড়া ও লেখালেখি করেছেন যে, তা থেকে কম্পোজ করা দুঃসাধ্য ছিল। এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন বিপাশা হায়াত। তার কাছে সযতনে রাখা আরেকটি চিত্রনাট্য আমাকে দিয়ে। এই সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইলো।

'আগুনের পরশমণি' ছবি তৈরীর সময় প্রচুর স্থিরচিত্র (Still Photo) তোলা হয়েছিল। সেখান থেকে বাছাই করে কিছু রঙ্গীন স্থিরচিত্র বইটিতে যুক্ত করা হলো। আমার ইচ্ছা ছিল স্থিরচিত্রে পরিচালক হুমায়ূন আহমেদকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে তুলে ধরবো, ধরে রাখবো। যেমন তিনি ক্যামেরার পিছনে আছেন, তিনি পাত্র-পাত্রীদের দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন, শুটিং এর অবসরে মজা করে আড্ডা দিচ্ছেন ইত্যাকার বিষয়। এই ধরনের সব ছবি হাতের কাছে ছিল। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ এক কথায় সব বাতিল করে দিলেন। তিনি বললেন- 'আপনি নিজে অথবা অন্য কেউ যদি কখনো আমার ছবি বানানো নিয়ে বই লেখেন তখন আমার নানান ভঙ্গিমার ছবি ব্যবহার করবেন। এই বইটি যেহেতু আমি লিখেছি, আমি আমার কোন ছবি দেব না।'

আমি তাঁর এসব কথা ও মুক্তি মেনে নিতে পারিনি। তারপরেও তার কথা না রেখে উপায় কি ?'

আমি এই সুযোগে 'নুহাশ চলচ্চিত্রে'র সৌজন্যে প্রাপ্ত বইটিতে ব্যবহৃত স্থিরচিত্র গুলোর জন্য এবং চিত্রগ্রাহক জনাব সমেজকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং এই ব্যাপারে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন নুহাশ চলচ্চিত্রের ব্যবস্থাপক জনাব মিনহাজুর রহমান। তাকে আমার অনেক ধন্যবাদ।
সবশেষে হুমায়ূন আহমেদের জবানীতে 'ছবি বানানোর অভিজ্ঞতা' সমৃদ্ধ এই বই যদি একজন পাঠককে সামান্যতম আনন্দ দিতে পারে তাহলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে মনে করব।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে এই ধরনের বই এবারই প্রথম।

ঢাকা
১.৬.৯৬

আহমেদ মাহফুজুল হক

ছবি বানানোর গল্প

স্বপ্নের জন্ম

আমার প্রথম দেখা ছবির নাম 'বহুত দিন হোয়ে' । খুব যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা তা না । আমার শিশুজীবনের খানিকটা গ্লানি ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে । বড় মামার সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছি । মামা নিতান্তই অনাগ্রহের সঙ্গে আমাকে নিচ্ছেন । তাঁর ধারণা বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাঁদতে শুরু করব । মাঝখান থেকে তাঁর ছবি দেখা হবে না । আমি যে কাঁদব না তা মামাকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করছি । মামা বুঝছেন না ।

'কাঁদলে কিন্তু আছাড় দিয়ে ভুঁড়ি গালিয়ে ফেলব ।'

'কাঁদব না মামা ।'

'পিসাব পায়খানা যা করার করে নাও । ছবি শুরু হবে আর বলবে পিসাব— তা হবে না ।'

'আচ্ছা ।'

'কোলে বসে থাকবে নড়াচড়া করবে না । নড়লে চড় খাবে ।'

'নড়ব না ।'

এতসব প্রতিজ্ঞার পরেও মামা বিমর্ষ মুখে আমাকে নিয়ে রওনা হলেন । সিলেটের রঙমহল সিনেমায় ছবি দেখতে গেলাম । গেটে দু'টা সিংহের মূর্তি । দেখেই গা ছমছম করে । মনে হয় গেটের ওপাশে না জানি কত রহস্য ।

মামা টিকিট কিনলেন । সেসময় লাইন টাইনের কোন ব্যাপার ছিল না । মনে হয় এখনো নেই, ধস্তাধস্তি করে টিকিট কাটতে হত । টিকিট হাতে ফিরে আসা আর যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসা কাছাকাছি ছিল । বাচ্চাদের কোন টিকিট লাগতো না । তারা কোলে বসে দেখতো কিংবা চেয়ারের হাতলে বসে দেখতো ।

ছবি শুরু হতে দেরী আছে । মামা চা কিনলেন । আমার জন্যে দু'পয়সার বাদাম এবং চানাভাজা কেনা হল । মামা বললেন, এখন না । ছবি শুরু হলে খাবে । আমি ছবি শুরুর জন্যে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি । চারদিকে লোকজন, হৈ চৈ কোলাহলে নেশার মত লাগছে । বুক ধক্ ধক্ করছে না জানি কি দেখব । ছবি শুরুর প্রথম ঘন্টা পড়ল । সেই ঘন্টাও অন্যরকম, বেজেই যাচ্ছে, থামছে না । লোকজন হলে ঢুকতে শুরু করেছে— মামা ঢুকলেন না । আমাকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন । গম্ভীর গলায় বললেন, 'পিসাব কর । ছবি শুরু হবে, আর বলবে পিসাব তাহলে কান ছিঁড়ে ফেলব' (প্রিয় পাঠক, মামা অন্য কিছু ছেঁড়ার কথা বলেছিলেন । সুরুচির কারণে তা উল্লেখ করছি না ।)

অনেক চেষ্টা করেও পিসাব হল না । এদিকে দ্বিতীয় ঘন্টা পড়ে গেছে । মামা বিরক্ত মুখে বললেন, চল যাই । আমাকে বসিয়ে দেয়া হল চেয়ারের হাতলে । হল অন্ধকার হয়ে গেল । ছবি শুরু হল । বিরাট পর্দায় বড় বড় মুখ । শব্দ হচ্ছে, গান হচ্ছে, তলোয়ারের যুদ্ধ হচ্ছে । কি হচ্ছে আমি কিছুই বুঝছি না । তবে মজাদার কিছু যে হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি । বড়মামা একেকবার হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছেন । তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হলের সব লোকও হাসছে । আমি বললাম, মামা কি হচ্ছে ?

মামা বললেন, চুপ । কথা বললে থাবড়া খাবি ।

আমি খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, মামা পিসাব করব ।

মামা করুণ ও হতাশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন । আমি তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটু পর পর বলতে লাগলাম, মামা আমি পিসাব করব । মামা আমি পিসাব করব । সম্ভবত তখন ছবির কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছিল । মামা পর্দা থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, নিচে নেমে পিসাব করে ফেল । কিছু হবে না । আমি তৎক্ষণাৎ মাতুল আজ্ঞা পালন করলাম । সামনের সীটের ভদ্রলোক মাথা ঘুরিয়ে মামার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, এই ছেলেতো প্রস্রাব করছে ! আমার পা ভিজিয়ে ফেলেছে !

মামা বললেন, ছেলেমানুষ প্রস্রাবতো করবেই । আপনার ঘরে ছেলেপুলে নেই ? পা তুলে বসুন না ।

সেই সময়ের মানুষদের সহনশীলতা অনেক বেশী ছিল । ভদ্রলোক আর কিছুই বললেন না । পা তুলে মনের

আনন্দে ছবি দেখতে লাগলেন।

আমার প্রথম ছবি দেখার অভিজ্ঞতা খুব সুখকর না হলেও খারাপও ছিল না। অন্ধকার হল, পর্দায় ছবির নড়াচড়া আমার ভালই লাগল। ইন্টারভ্যালের সময় বাদাম এবং কাঠি লজেন্স খাওয়ার একটা ব্যাপারও আছে। বাসা থেকে রিকশায় করে হলে যাওয়া এবং ফেরার মধ্যেও আনন্দ আছে, রিকশায় চড়ার আনন্দ। কাজেই ছবি দেখার কোন নড়াচড়া পেলেই আমি এমন কান্নাকাটি, হৈ চৈ শুরু করে দেই যে আমাকে না নেয়া ছাড়া কোন পথ থাকে না।

সিলেটে আমাদের বাসায় মেহমান লেগেই থাকতো। শাহজালাল সাহেবের দরগা জিয়ারতের মেহমান। তাঁরা প্রথম দিন শাহজালাল সাহেবের দরগায় যেতেন (আমি সঙ্গে আছি, দরগার গেটে হালুয়া কেনা হবে। যার স্বাদ ও গন্ধ বেহেশতি হালুয়ার কাছাকাছি) শাহজালাল সাহেবের মাজার জিয়ারতের পর আসে শাহ পরাণ সাহেবের মাজার জিয়ারতের প্রশ্ন। অধিকাংশ মেহমান সেই মাজার এড়িয়ে যান। গরম মাজার, ভুল ত্রুটি হলে মুশকিল। মাজার পর্ব শেষ হবার পর মেহমানদের ছবি দেখার আগ্রহ জেগে উঠে। সিলেট শহরে তখন দুটি ছবি ঘর। দুই ছবি ঘরে দু'রাত ছবি দেখা হয়। আমি তখনও সঙ্গে আছি।

সবচে' মজা হত মা'র সঙ্গে ছবি দেখতে গেলে। পুরানো শাড়ি দিয়ে রিকশা পেঁচানো হত। বোরকা পরা মায়েরা রিকশায় ঘেরাটোপে ঢুকে যেতেন। আমরা বাচ্চারা পর্দার বাইরে। এক একজন মহিলার সঙ্গে চার-পাঁচটা করে শিশু। 'দুটি সন্তানই যথেষ্ট' এই থিয়োরী তখনও চালু হয়নি। সে সময় দু'টি সন্তান যথেষ্ট নয় বলে বিবেচনা করা হত।

সিনেমা হলে মহিলাদের বসার জায়গা আলাদা। কালো পর্দা দিয়ে পুরুষদের কাছ থেকে আলাদা করা। ছবি শুরু হবার পর পর্দা সরানো হবে। তার আগে নয়। মহিলাদের অংশে খান্ডারনী টাইপের একজন আয়া থাকে। তার কাজ হল ছবি শুরু হবার পর সামনের কোন পুরুষ মানুষ পেছন দিকে তাকাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেউ তাকালেই বিকট চিৎকার— ঐ কি দেখস? চউখ গালাইয়া দিমু। ঘরে মা ভইন নাই?

পর্দায় উত্তম সুচিত্রার রোমান্টিক সংলাপ হচ্ছে আর এদিকে চলছে শিশুদের চেঁ ভ্যাঁ। মায়েদের তাতে ছবি উপভোগ করতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। এই শিশুদের সামলাচ্ছেন, এই সুচিত্রার কষ্টে চোখের পানি ফেলছেন। সাধে কি আর বলে মেয়েরা সর্বংসহা।

সে বছরই শীতের শুরুতে হঠাৎ বাসায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। দেয়ালের ছবি সব নামিয়ে ফেলা হতে লাগল। বাসায় যে ফরসি হুক্কা আছে তা ঘষেমেজে পরিষ্কার করা হতে লাগল, দেশ দেকে দাদাজান আসবেন। আমি খুব উল্লসিত বোধ করলাম না। কারণ দাদাজান নিতান্তই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ইবাদত বন্দেগী নিয়ে থাকেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন বলেই বোধহয় আমাদের সবসময় পড়া ধরেন। সন্ধ্যাবেলা নামাজ শেষ করেই বলবেন, কই বই নিয়ে সবাই আস দেখি। পড়া না পারলে তাঁর মুখ স্কুলের স্যারদের মতই গম্ভীর হয়ে যায়। এরকম মানুষকে ভাল লাগার কোন কারণ নেই। গল্প যে তিনি একেবারেই বলতেন না তা না, বলতেন তবে বেশীর ভাগই শিক্ষামূলক গল্প। 'ঈশপ' টাইপ। সব গল্পের শেষে কিছু উপদেশ।

এক রাতের কথা, দাদাজানের সম্ভবত মাথা ব্যথা। আমাদের পড়তে বসতে হল না। বাতি নিভিয়ে তিনি শুয়ে রইলেন। আমাকে ডেকে বললেন, দেখি একটা গল্প বলতো।

আমি তৎক্ষণাৎ গল্প শুরু করলাম। সদ্য দেখা সিনেমার গল্প। কোন কিছুই বাদ দিলাম না। সুচিত্রা উত্তমের প্রেমের বিশদ বর্ণনা দিলাম। দাদা শুয়ে ছিলেন, এই অংশে উঠে বসলেন। তাঁর মুখ হা হয়ে গেল। আমার ধারণা হল, তিনি গল্প খুব পছন্দ করছেন। গল্প শেষ করে উৎসাহের সঙ্গে বললাম আরেকটা বলব দাদাজান?

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন না, তোর মাকে ডাক।

মা এসে সামনে দাঁড়ালেন। দাদাজান একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় অনেক কঠিন কঠিন তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হল। বক্তৃতার সামারী এন্ড সাবসটেন্স হচ্ছে— বাবা মা'র প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সন্তান সৎভাবে পালন। সেই কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা হচ্ছে। ছেলে সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। গান-বাজনা, নাটক-নভেল, সিনেমা সবই আত্মার জন্যে ক্ষতিকর। এই ছেলের ভয়ংকর ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আর যেন না হয়

সেই চেষ্টা করতে হবে। বউমা তোমাদের সবার জন্যে সিনেমা নিষিদ্ধ। কারণ তোমাদের দেখেই তোমাদের ছেলেমেয়েরা শিখবে। যাই হোক, আমি খাস দিলে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করছি যেন সিনেমা নামক ব্যাধির হাত থেকে তোমরা দূরে থাকতে পার।

দাদাজানের প্রার্থনার কারণেই কিনা কে জানে তিনি সিলেট থাকতে থাকতেই বাবা বদলি হয়ে গেলেন দিনাজপুরের জগদ্দল নামের এক জঙ্গলে। সিনেমা টিনেমা সব ধুয়ে মুছে গেল। তবে তাতে আমার তেমন ক্ষতি হল না। জগদ্দলের অপূর্ব বনভূমি আমার শিশুচিত্ত দখল করে নিল।

দাদাজানের প্রার্থনার জোর আট বছরের মাথায় কমে গেল বলে আমার ধারণা। কারণ আট বছরের মাথায় আবার সিনেমা ব্যাধি আমাকে গ্রাস করল। তখন মেট্রিক পাশ করে ঢাকায় পড়তে এসেছি। হোস্টেলে থাকি। বাবা মা থাকেন বগুড়ায়। পূর্ণ স্বাধীনতা। বড় হয়ে গেছি এরকম একটা ভাবও মনে আছে। আচার-আচরণে বড় হওয়াটা দেখাতে হবে। কাজেই দল বেঁধে সিনেমা দেখা। হাতের কাছে বলাকা সিনেমা হল। একটু এগুলেই গুলিস্তান। একই বিল্ডিং-এ 'নাজ'— ভদ্রলোকের ছবি ঘর। হোস্টেল সুপারের চোখ এড়িয়ে সেকেন্ড শো ছবি দেখার আনন্দও অন্য রকম। সেই সময় প্রচুর আজেবাজে ছবি দেখেছি। লাস্যময়ী নীলুর 'খাইবার পাস', 'সাপখোপের ছবি 'নাচে নাগিন বাজে বীণ', 'আগ কা দরিয়া', 'ইনসানিয়াৎ' (পাকিস্তানী ছবি। বম্বের ছবি না। তখন ভারতের ছবি আসতো না। দেশীয় ছবি প্রটেকশন দেবার জন্যে ভারতের ছবি আনা বন্ধ ছিল)। বলাকা সিনেমা হলে নতুন ছবি রিলিজ হয়েছে আর আমি দেখিনি এমন কখনো হয়নি। এমনও হয়েছে একই দিনে দু'টা ছবি দেখেছি, দুপুর দেড়টায় ইংরেজী ছবি— তিনটায় ম্যাটিনিতে উর্দু ছবি। আমাদের সময় ছবি দেখতে টাকা লাগত কম। আইয়ুব খান সাহেব ব্যবস্থা করেছিলেন— ছাত্ররা সিনেমা দেখবে হাফ টিকিটে। আই ডি কার্ড দেখালেই অর্ধেক দামে স্টুডেন্ট টিকেট। ছাত্রদের সিনেমা দেখানোর জন্যে আইয়ুব খান সাহেব এত ব্যস্ত ছিলেন কেন কে জানে। ক্রমাগত ছবি দেখে বেড়ালেও মনের গভীরে সবসময় মনে হত আমি যা করছি তা ঠিক না। ভুল করছি। নিজের ভেতর চাপা অপরাধ বোধ কাজ করতো। অবচেতন মনে হয়তো দাদাজানের বক্তৃতা খেলা করত। এই সময় একটা মজার ঘটনা ঘটল।

সুলতানা ম্যাডাম তখন আমাদের বাংলা পড়াতেন। ম্যাডাম সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন। ঝলমলে তরুণী। তখনো বিয়ে করেন নি। ছেলেদের কলেজে পড়াতে এসেছেন বলে খানিকটা বিব্রত। তবে চমৎকার পড়ান। আমরা ক্লাসে কোন ফাজলামী করলে আহত চোখে তাকিয়ে থাকেন। চোখের দৃষ্টিতে বলার চেষ্টা করেন— আমি তোমাদের এত পছন্দ করি, আর তোমরা এমন দুষ্টামী কর? আমাদের বড় মায়া লাগে। একদিন তিনি ক্লাসে এসে বললেন, আজ আমার মনটা খুব খারাপ। গতকাল একটা সিনেমা দেখে খুব কেঁদেছি। মন থেকে ছবির গল্পটা কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। সম্ভব হলে তোমরা ছবিটা দেখো। ছবির নাম— 'রোমান হলিডে'।

সেই রাতেই আমরা দল বেঁধে রোমান হলিডে দেখতে গেলাম। আমার জীবনের প্রথম দেখা ভাল ছবি। সামান্য একটা ছবি যে মানুষের হৃদয় মন দ্রবীভূত করতে পারে, বুকের ভেতর হাহাকার তৈরি করতে পারে আমার ধারণার ভিতর তা ছিল না। সত্যিকার অর্থে সেদিনই ছবির প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হলাম। আরম্ভ হল বেছে বেছে ছবি দেখার পর্ব। একটা ভাল বই যেমন কয়েকবার পড়া হয় একটা ভাল ছবিও অনেকবার করে দেখতে শুরু করলাম। সবচে বেশি কোন ছবিটি দেখেছি? সম্ভবত 'দি ক্রেইনস আর ফ্লাইয়িং'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী। মেয়েটির প্রেমিকা যুদ্ধে গিয়েছে। মেয়েটি জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ট্রেনে করে ফিরছে সৈনিকরা। মেয়েটি ফুল হাতে এসেছে স্টেশনে। কতজন ফিরেছে শুধু ফেরেনি সেই ছেলেটি। একসময় মেয়েটি হাতের ফুল, যারা ফিরেছে তাঁদের হাতেই একটা একটা করে দিতে শুরু করল। তার চোখ ভর্তি জল। হঠাৎ সে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল আকাশে ঝাঁক ঝাঁক বক পাখি। শীত শেষ হয়েছে বলে তারা ফিরে আসছে নিজবাসভূমে। আহা কি দৃশ্য।

আজ আমি মনে করতে পারছি না অসাধারণ সব ছবি দেখতে দেখতে কখনো মনের কোণে উঁকি মেরেছে কি না-আহা এরকম একটা ছবি যদি বানাতে পারতাম। অপূর্ব সব উপন্যাস পড়ার সময় এ ধরনের অনুভূতি আমার সবসময় হয়। 'পথের পাঁচালী' যতবার পড়ি ততবারই মনে হয় আহা এরকম একটা উপন্যাস যদি লিখতে পারতাম। ছবির ক্ষেত্রে এরকম না হবারই কথা। ছবি অনেক দূরের জগত, অসম্ভবের জগত, তারপরেও হতে পারে। মানুষের অবচেতন মন অসম্ভবের জগত নিয়ে কাজ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষের দিকে এসে অসম্ভবের জগতের এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল, তার নাম আনিস সাবেত। পদার্থ বিদ্যার তুখোড় ছাত্র কিন্তু তার ভালবাসা বস্তু জগতের জন্যে নয়। তার ভালবাসা অন্য এক জগতের জন্যে। সেই জগত ধরা ছোঁয়ার বাইরের জগত, আলো ও আঁধারের রহস্যময় জগত।

এক জোছনা রাতে রাস্তায় হাঁটছি। তিনি হঠাৎ বললেন, ফিল্মে জোছনা কিভাবে তৈরি করা হয় জান ?

আমি মাথা নাড়লাম—জানি না। জানার কোন প্রয়োজনও কখনো মনে করি নি। তিনি দেখি দীর্ঘ এক বক্তৃতা শুরু করলেন। জোছনার বক্তৃতা শেষ হবার পর শুরু হল জোনাকি পোকার বক্তৃতা। সত্যজিৎ রায় কিভাবে জোনাকি পোকার আলো পর্দায় নিয়ে এসেছেন সেই গল্প। চার পাঁচটা টর্চ লাইট নিয়ে কয়েকজন বসেছে। টর্চ লাইটগুলির মুখে কাপড় বাঁধা। তারা টর্চ জ্বালাচ্ছে আর নেভাচ্ছে।

আমি বললাম, ফিজিক্স ছেড়ে এখন কি এইসব পড়ছেন ?
তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি ঠিক করেছি ছবি বানানোকেই আমি পেশা হিসেবে নেব।
'এই বিষয়েতো আপনি কিছুই জানেন না।'
'কুবরিকও কিছু জানতেন না'।
'কুবরিক কে ?'
'স্ট্যানলি কুবরিক একজন ফিল্ম মেকার, সত্যজিৎ রায় যার একটা ছবি কুড়ি বার দেখেছিলেন।'
'আপনি তাঁর কোন ছবি দেখেছেন ?'
'একটাই দেখেছি—'স্পেস অডিসি ২০০১' অসাধারণ ছবি।'
আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনি তাহলে স্ট্যানলি কুবরিক হতে যাচ্ছেন ?'
আনিস ভাই বিরক্ত মুখে বললেন, আমাকে নিয়ে রসিকতা করবে না। আমি যা বলছি তা করব। অসাধারণ সব ছবি বানাবো। এই দেশের মানুষ মুগ্ধ হয়ে আমার ছবি দেখবে।
'ছবি বানাতে প্রচুর টাকা লাগে। আপনি টাকা পাবেন কোথায় ?'
'যেখান থেকেই পাই তোমার কাছে ধার করার জন্যে যাব না।'
'আপনি রাগ করছেন কেন ?'
'আমি তোমাকে আমার একটা স্বপ্নের কথা বলছি, তুমি হেলাফেলা করে শুনছ সেই জন্যেই রাগ করছি। মানুষের স্বপ্ন নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই।'
'আর করব না, সরি।'
'আমার স্বপ্ন কি তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে ?'
আমি বললাম, 'না, মোটেই হাস্যকর মনে হচ্ছে না।'
আনিস ভাইকে না বললেও আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছিল।

আনিস ভাই তাঁর ব্যক্তিগত স্বপ্নের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করতে চাইলেন। ছবি প্রসঙ্গে যে কোন বই পান নিয়ে আসেন। নিজে পড়েন। আমাকে পড়তে দেন। আমি না পড়েই বলি, পড়েছি।
অসাধারণ বই। ছবি দেখতে ভাল লাগে ছবির শুকনা থিয়োরী পড়তে ভাল লাগবে কেন ? আমার লাভের মধ্যে লাভ এই হল আমি অনেকগুলি নাম শিখলাম। 'আইজেনস্টাইন', 'বেটেলশীপ পটেমকিন', 'অক্টোবর', 'গদার', 'ফেলিনি', 'বাইসাইকেল থিফ'.... আমার এই অল্প বিদ্যা পরবর্তী সময়ে খুব কাজে এসেছে। অনেক আঁতেলদের ভড়কে দিতে পেরেছি। আঁতেলদের দৌড়ও ঐ নাম পর্যন্ত বলেই ব্যাপার ধরতে পারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার পর আনিস ভাইয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার এর চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ চলে এলাম। কাজকর্ম নেই বললেই হয়। সপ্তাহে দু'টা মাত্র ক্লাস। দুপুরের পর কিচ্ছু করার নেই। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে খানিকক্ষণ হাঁটি, রাতে গল্প লেখার চেষ্টা করি। থাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে। গেস্ট হাউস বেশীর ভাগ সময় থাকে খালি। গেস্ট বলতে আমি একা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বিচিত্র সব ভৌতিক শব্দ হতে থাকে। ভয়ে জেগে বসে থাকি। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। এই সময় আনিস ভাই মোটা এক খাতা হাতে ময়মনসিংহে উপস্থিত হলেন। তিনি একটি চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছেন। মোটা খাতায় সেই চিত্রনাট্য। জনাব আহমেদ ছফার লেখা 'ওংকার' উপন্যাসের চিত্রনাট্য। আমাকে শুনাবেন। আমি বললাম, কতদিন থাকবেন ?
'চিত্রনাট্য পড়তে যতদিন লাগে ততদিন থাকব।'

চিত্রনাট্য পড়তে তাঁর দীর্ঘদিন লাগল। এক সঙ্গে তাঁকে বেশী পড়তে দেই না। দু' এক পাতা পড়া হতেই বলি, বন্ধ করুন। চট করে শেষ করলে হবে না। ধীরে-সুস্থে এগুতে হবে। আবার গোড়া থেকে পড়ুন।

আমার ভয়, পড়া শেষ হলেই তিনি চলে যাবেন আমি আবার একলা হয়ে যাব। এক সময় চিত্রনাট্য পড়া শেষ হল। আমাকে স্বীকার করতে হল, অসাধারণ কাজ হয়েছে। আনিস ভাই ঢাকায় যাবার প্রস্তুতি নিলেন। রাতের ট্রেনে ঢাকা যাবেন। আমি স্টেশনে তাঁকে উঠিয়ে দিতে যাব। ট্রেন রাত দশটায়, আনিস ভাই সন্ধ্যা থেকেই মন-মরা। কি একটা বলতে গিয়েও বলছেন না। শুধু বললেন, খুব একটা জরুরী কথা আছে, এখন বলব না। ট্রেন ছাড়ার আগে আগে বলব।

জরুরী কথা কি হতে পারে আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। দুঃশ্চিন্তা বোধ করছি। আনিস ভাই ট্রেন ছাড়ার আগে আগে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, হুমায়ূন, আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কানাডায় যাচ্ছি ইমিগ্রেশন নিয়ে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।
আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন যাচ্ছেন ?
আনিস ভাই সেই কেনর জবাব দিলেন না। আমি বললাম, কবে যাচ্ছেন ?
'পরশু যাব। দেশের শেষ ক'টা দিন তোমার সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম।'
'আমরা ছবি বানাব না ?'

আনিস ভাই জবাব দিতে পারলেন না, ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি খুব অভিমানী। তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখলাম না। যে দেশ নিয়ে তাঁর এত স্বপ্ন সেই দেশ ছেড়ে কি করে তিনি চলে যান ? পিএইচডি করতে আমেরিকা গিয়েছি। হাতের কাছে কানাডা ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছে যেতে পারি। গেলাম না। আমার অভিমান ভালবাসার মতই তীব্র।

তাঁর সঙ্গে দেখা হল দশ বছর পর। এক দুপুরে হঠাৎ আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় এসে উপস্থিত। সমস্ত রাগ, অভিমান ভুলে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কত গল্প। গল্প ফুরাতেই চায় না। এক সময় ছবি বানানোর প্রসঙ্গ এসে পড়ল। তিনি জানালেন, একটা শর্ট ফিল্ম বানিয়ে হাত পাকিয়েছেন। ছবিটি জার্মান ফিল্ম ফ্যাস্টিভেলে 'অনারেবল মেনসান' পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মনমোর মেঘের সঙ্গী' গানের চিত্ররূপ দিয়েও একটা ছবি বানিয়েছেন ১৬ মিলিমিটারে। ছবি বানানোর টাকা এখন তাঁর হয়েছে। দেশে এসে ছবি বানাবেন। অসুস্থ মাকে দেখতে এক সপ্তাহের জন্যে দেশে এসেছিলেন, এক সপ্তাহ কাটিয়ে কানাডা ফিরে গেলেন। আবার যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল। চিঠি লিখি উত্তর আসে না। একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিলেন, টেলিফোন করলে নো রিপ্লাই আসে।
বছর খানিক পরের কথা। এক গভীর রাতে টেলিফোনের শব্দে জেগে উঠে রিসিভার হাতে নিতেই আনিস ভাইয়ের গলা শুনলাম। রাত তিনটায় ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর হঠাৎ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন, হুমায়ূন আমার ক্যানসার হয়েছে, থ্রোট ক্যানসার। আমি মারা যাচ্ছি। এখন টেলিফোন করছি হাসপাতাল থেকে। মাঝে মাঝে তোমাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করব, তুমি কিছু মনে করো না। মৃত্যুর আগে প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে ইচ্ছে করে।

তিনি হাসপাতালের বেড থেকে টেলিফোন করতেন। তিনিই কথা বলতেন। আমি শুনতাম। তাঁর গলার স্বর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ কথা বোঝা যেত না, কথা বলতে তাঁর কষ্ট হত। তারপরেও অনবরত কথা বলতেন, পুরানো সব স্মৃতির গল্প। তাঁর স্বপ্নের গল্প। সব গল্পই এক সময় ছবি বানানোতে এসে থামতো। আহা কি অবসেসানই না তাঁর ছিল ছবি নিয়ে।

মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু তাদের স্বপ্ন মরে না। আমিন ভাই মারা গেলেন, তাঁর স্বপ্ন কিন্তু বেঁচে রইল। কোন এক অদ্ভুত উপায়ে সেই স্বপ্ন ঢুকে গেল আমার মধ্যে। এক ভোরবেলায় আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে বললাম, গুলতেকিন! আমি একটা ছবি বানাবো। ছবির নাম 'আগুনের পরশমণি'।

একশ' রক্ত গোলাপ

আগুনের পরশমণি আমার প্রিয় কয়েকটি উপন্যাসের একটি । কি জন্যে প্রিয় সেই কচকচানিতে যেতে চাচ্ছি না । প্রিয় বিষয়ের কোন ব্যাখ্যা থাকে না । বৃষ্টি ও জোছনা আমার প্রিয় । কেন প্রিয় সেই ব্যাখ্যা দিতে পারব না । আগুনের পরশমণি লেখার সময় আগুনের পরশমণির নায়িকা রাত্রি এবং তার পাগলাটে ছোটবোন অপালাকে আমি চোখের সামনে দেখতে পেতাম । একদিন রাত্রি চুলে কি একটা গন্ধ তেল দিয়েছিল, সেই তেলের গন্ধ পর্যন্ত পেয়েছিলাম । ব্যাপারটা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে, তবে হাস্যকর মনে হলেও সত্যি । আমার লেখক জীবনে অনেক হাস্যকর ব্যাপার ঢুকে গেছে ।

সিনেমা করার জন্যে আগুনের পরশমণি বেছে নেয়ার প্রধান কারণ হল, এটি আমার অতি প্রিয় একটি গল্প । অপ্রধান কিছু কারণ আছে যেমন এটি মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প । পুরো গল্পটি একটা সেটে বলা হয়েছে । মধ্যবিত্ত পরিবারের একতলা একটা বাড়িতে কয়েকদিনের ঘটনা । অল্প কিছু পাত্র-পাত্রী নিয়ে কাজ । বিশাল আয়োজনের কিছু দরকার নেই ।

আমি প্রবল উৎসাহে চিত্রনাট্য লিখতে বসলাম । চিত্রনাট্য ব্যাপারটা হল ঘটনাগুলি সাজিয়ে দেয়া । কোনটার পর কোনটা আসবে । আমার মতে, চিত্রনাট্য তৈরি করার মানেই হল একটা ছবির ৫০ ভাগ কাজ শেষ করে ফেলা । ভাল চিত্রনাট্য হাতে থাকা মানে পুরো ছবিটা হাতের মুঠোয় থাকা । দৃশ্যগুলি পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানোর পরের অংশ শট ডিভিশন । একেকটা দৃশ্য ক্যামেরায় কিভাবে নেয়া হবে ? ক্যামেরা কি পাত্র-পাত্রীদের মাথার উপর থাকবে (টপ শট) ?, নাকি মূল চরিত্রের মুখের উপর ধরা থাকবে (বিগ ক্লোজ) ?, নাকি মূল চরিত্রের মুখের উপর ক্যামেরা এমনভাবে সরে আসবে যেন ঘরের সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া যায় (বিগ ক্লোজ টু লং শট), নাকি মূল চরিত্রের মুখের উপর থেকে ক্যামেরা আস্তে করে সরে আসবে অন্য একটি চরিত্রের মুখের উপর, মূল চরিত্রকেও খানিকটা দেখা যাচ্ছে (বিগ ক্লোজ টু ও এস, ক্যামেরা ট্রলী) । শট ডিভিশনে এই কাজগুলি করা হয় । ছবির একজন পরিচালক কতটা ওস্তাদ তা ধরা পরে তাঁর শট ডিভিশনে । উপন্যাস থেকে ভিস্যুয়েল মাধ্যমে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় তাঁর মেধা ও মনন, তাঁর স্টাইল ধরা পরে । একই দৃশ্য কুবরিক যে শট ডিভিশন করবেন, ফেলিনি তা করবেন না । একই দৃশ্য মাত্র ভিস্যুয়েল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের ভিন্নতার কারণে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দু'রকম মনে হবে ।

উদাহরণ দেই ।

নায়ক ও নায়িকা চা খেতে খেতে কথা বলছে ।

নায়ক ঃ তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস না ?

নায়িকা ঃ না ।

নায়ক ঃ কখনো বাসতে না ?

নায়িকা ঃ অতীত নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না । এখন বাসি না তা বলতে পারি ।

নায়ক ঃ তাহলে আমরা এখানে বসে চা খাচ্ছি কেন ?

নায়িকা ঃ খেতে ইচ্ছা না করলে খেও না !

নায়ক চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেললেন । ঝনঝন শব্দে কাপ ভেঙ্গে গেল ।

দৃশ্যটি নানানভাবে পর্দায় আনা যেতে পারে ।

(ক)

শুরুতে ছেলেমেয়ে দু'জনকে দেখা গেল । বসে চা খাচ্ছে । তারপর যখন যে কথা বলছে ক্যামেরা তাকেই ধরছে । শেষ দৃশ্যে আবার উপর থেকে দু'জনকে ধরা হল যাতে চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেলার ব্যাপারটা দেখা যায় । শট ডিভিশনের ভাষায়,

১· টপ টু শট । নায়ক নায়িকা চা খাচ্ছে ।

২· মিড ক্লোজ সিঙ্গেল শট, নায়ক চায়ে চুমুক দিয়ে কথা বলল ।

তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস না ?
৩· মিড ক্লোজ সিঙ্গেল শট, নায়িকা ।
নায়িকা ঃ না ।
৪· মিড ক্লোজ সিঙ্গেল শট, নায়ক ।
নায়ক ঃ কখনো বাসতে না ?
৫· মিড ক্লোজ শট, নায়িকা ।
নায়িকা ঃ অতীত নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না । এখন বাসি না তা বলতে পার ।
৬· মিড ক্লোজ শট, নায়ক ।
নায়ক ঃ তাহলে আমরা এখানে বসে চা খাচ্ছি কেন ?
৭· মিড ক্লোজ শট, নায়িকা ।
নায়িকা ঃ খেতে ইচ্ছা না করলে খেও না ।
৮· টপ শট । নায়ক চায়ের কাপ ছুঁড়ে ফেললেন । ঝনঝন শব্দে কাপ ভেঙ্গে গেল ।
মোট আটটা শটে দৃশ্যটি নেয়া হল ।
একই দৃশ্য একটা শট ব্যবহার করেও নেয়া যায় । যেমন

(খ)

মিড ক্লোজে নায়ককে ধরা হল । নায়ক কথা বলা শুরু করার পর ক্যামেরা সামান্য ঘুরে নায়িকাকে ধরল । তারপর সারাক্ষণই নায়িকাকে ধরে রাখল । শেষ দৃশ্যে দেখা গেল নায়িকার পেছনে চায়ের কাপটা ঝনঝন শব্দে ভাঙ্গছে ।

সংলাপ এবং অভিনয় সবকিছু ঠিক থাকার পরেও শুধুমাত্র ধারণ করার পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে দর্শকদের কাছে দুটি দৃশ্য সম্পূর্ণ দু'রকম লাগবে ।

কোন পরিচালক হয়ত গৎবাধা পথে অগ্রসরই হবেন না । তারা এগুবেন ভিন্ন পথে । নায়ক নায়িকাকে তিনি কোন গুরুত্ব দিলেন না । গুরুত্ব দিলেন চায়ের কাপের দিকে । চায়ের কাপ হয়ে দাঁড়াল দু'টি প্রধান চরিত্র । দু'টি চরিত্রের একটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল, অন্যটি টিকে রইল ।

চিত্রনাট্যের প্রথম ৬টি দৃশ্য লেখার পর মনে হল আমার কিছু পড়াশোনা করা দরকার । এটাতো টিভির নাটক না যে এক বৈঠকে সব শেষ করে দেব । এর নাম সিনেমা । অবশ্যি আগুনের পরশমণি আমার লেখা প্রথম চিত্রনাট্য না । শঙ্খনীল কারাগার ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য আমার করা । এই ছবি দেখে অনেকেই বলেছেন, তাদের কাছে নাটক নাটক মনে হয়েছে । এক ঘন্টার নাটকের জায়গায় তারা বড় পর্দায় দু'ঘন্টার নাটক দেখেছেন । চলচ্চিত্র বানানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা ব্যবহার করা হয়নি ।

ভুল যদি কিছু হয়ে থাকে তা যেন আমার আগুনের পরশমণিতে না হয় সেই চেষ্টাটা করা দরকার । বিষয়টা ভালমত জানা দরকার । বই-পত্র জোগাড় করে পড়াশোনা করা দরকার । বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেখানে কোন বই প্রয়োজন পড়লে সে বই আর পাওয়া যাবে না । সারা নিউমার্কেট খুঁজে ফিল্ম মেকিং-এর উপর চারটা বই জোগাড় হল ।

1. Film as Art: Rudolf Arnheim, Faber and Faber Limited.
2. Salam Bombay: Mira Nair and Sooni Taraporevala, Penguin.
3. The Major Film Theories: J Dudley Andrew, Oxford University Press.
4. The Film Sense: Serge Eisenstein, Faber and Faber Limited.

কিছু বই পাওয়া গেল টিভি লাইব্রেরীতে । কয়েকটা জোগাড় হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী থেকে । বিদেশে আমার বন্ধু-বান্ধব যারা আছে তাদের লিখলাম ফিল্ম মেকিং-এর উপর যে বই পাওয়া যায় আমাকে পাঠাও । বই আসা শুরু হল । একরাতে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলাম বই পড়া । আমার লেখালেখি মাথায় উঠল । ক্লাসের পড়াও ঠিকমত করে উঠতে পারি না এমন অবস্থা । থার্ড ইয়ার অনার্স ক্লাসে আমি থার্মোডিনামিক্স

পড়াই। মোটামুটি জটিল বিষয়। ভাল মত প্রিপারেশন না নিয়ে ক্লাসে যাওয়া ঠিক না। একদিন বোর্ডে একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করতে গিয়ে মাঝপথে আটকে গেলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের বলতে বাধ্য হলাম যে— 'আজ পারছি না। পরের ক্লাসে করে দেব।'

এর মধ্যেই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রফেসরের দুটি পদ খালি হল। আমি তখন সহযোগী অধ্যাপক। সহযোগী অধ্যাপক থেকে পুরোপুরি অধ্যাপক হবার সুযোগ এসে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকের এই হল স্বপ্নের শেষ সীমানা। শেষ সীমানাতে যেতে হলেও কিছু করণীয় আছে। রিসার্চ পেপার লাগবে, প্রমাণ করতে হবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় তার কিছু ভূমিকা আছে। আমি ল্যাবরেটরিতে যাওয়া অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার সম্বল হচ্ছে আমেরিকায় থাকার সময়টা আমি কাজে লাগিয়েছিলাম। আন্তর্জাতিক জার্নালে বেশ কিছু পেপার ছাপা হয়েছে। প্রফেসর হবার জন্যে তা যথেষ্ট হবার কথা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যদি বলে দেশে এসে তুমি কি করলে ? গল্প উপন্যাস লিখেছি বলে পার পাওয়া যাবে না।

আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে ফিরে প্রথম কয়েক বছর প্রচুর কাজ করেছিলাম। লেখালেখি না, রিসার্চের কাজ। সেই সব কাজের কোনটিই জার্নালে প্রকাশ করিনি। এখন তা করে ফেললে আমার অধ্যাপক হবার ব্যাপারটা নিয়ে আর চিন্তা থাকে না। সমস্যা হচ্ছে পেপার তৈরি নিয়ে কাজ শুরু করলে চিত্রনাট্য তৈরি নিয়ে কাজ করব কিভাবে। ঠিক করতে হবে কোনটা বেশি জরুরী চিত্রনাট্য না আমার অধ্যাপক হওয়া ?

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলাম। গুলতেকিনকে আমার সমস্যা গুছিয়ে বললাম। সে মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে বিয়ে করেছিলাম, চিত্র পরিচালককে বিয়ে করিনি। কাজেই আমি চাই তুমি ঠিকঠাক মত রিসার্চ পেপার তৈরি করবে। যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হবে। Full Professor- শুনতেওতো ভাল লাগে।

একটি আপ্তবাক্য আছে, স্ত্রীর পরামর্শ খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু কাজ করবে নিজের মত। কাজেই আমি রিসার্চ পেপার নিয়ে মাথা ঘামালাম না। আমার কাছে মনে হল অধ্যাপক হওয়াটা এমন জরুরী কিছু না। ছবি তৈরিটা অসম্ভব জরুরী। ছবির সঙ্গে স্বপ্ন মিশে আছে। স্বপ্নের চেয়ে জরুরীতো আর কিছু হতে পারে না।

এক সময় চিত্রনাট্য তৈরি শেষ হল, যেদিন শেষ হল কাকতালীয়ভাবে সেই দিনেই অধ্যাপকের সিলেকশন বোর্ডের মিটিং বসল। অধ্যাপক সিলেকশনে ক্যান্ডিডেটরা উপস্থিত থাকেন না। তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার বিবেচনা করা হয়। দেশের বাইরের নামকরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী একজন অধ্যাপক থাকেন বিদেশী এক্সপার্ট। তাঁর মতামতের উপরই সিলেকশন নির্ভর করে। আমি খুবই বিস্মিত হয়ে জানতে পারলাম সিলেকশন বোর্ড আমাকে অধ্যাপক বানিয়েছে। বিদেশী এক্সপার্ট আমার ব্যাপারে জোর সুপারিশ করেছেন বলেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটি ঘটে গেছে। আনন্দে আমার অভিভূত হয়ে যাবার কথা। অভিভূত হবার বদলে বিষণ্ন বোধ করলাম। বুঝতে পারলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার কাল আমার শেষ হয়েছে। অনেক দিন আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম প্রফেসর হবার পর চাকরি ছেড়ে দেব। পড়াতে আমার ভাল লাগছিল না। আমার সব সময় মনে হত, কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়াবার জন্যে আমি পৃথিবীতে আসিনি। আমার ডেসটিনি ভিন্ন।

ছবি বানানোর ৪০ ভাগ কাজ শেষ। চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে। এখন শুধু কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। এই কাজ এমনই কাজ যে শূন্য পকেটে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা পকেটে নিয়ে ঝাঁপ দিতে হয়। কোথায় পাব ৪০ লক্ষ টাকা ? সম্বল বলতে আমার বইয়ের রয়েলটি থেকে জমানো দু'লক্ষ টাকা।
এই দু'লক্ষ টাকা কিভাবে জমেছে সেও এক রহস্য। টাকা জমলেই আমার তা দ্রুত খরচ করে ফেলতে ইচ্ছা করে। আমার নিজের টাকা ব্যাংকের লকারে থাকবে ভাবতেই অস্বস্তি লাগে। আমার ধারণা, টাকার জন্ম হয়েছে খরচের জন্যে। জমা করে রাখার জন্যে না। যেভাবেই হোক দু'লাখ জমে গেছে, এখন ছবি তৈরিতে কাজে লাগবে। কথা হচ্ছে দু' লাখ টাকায় ছবি হবে না। আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন অভিনেতা বন্ধু আসাদুজ্জামান নূর। তিনি মধুর ভঙ্গিতে বললেন, ৪০ লাখ টাকা জোগাড় করা কোন ব্যাপারই না। অনেক ধনবান ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তারা এতই ধনবান যে টাকা নিয়ে কি করবেন জানেন না। তাদের কাছ থেকে ভাল কাজে ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া কোন ব্যাপারই না। হুমায়ূন সাহেব আপনি দুঃশ্চিন্তা

করবেন না ।

নূর অভয়ের হাসি হাসলেন । সঙ্গে সঙ্গে আমার সব দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল । নূর ঠিক করলেন এক সকালে আমরা মানি ড্রাইভে বের হব । ধনবানদের এক এক করে ধরা হবে ।

এক সকালে সত্যি সত্যি বের হলাম । আমার নিজেকে ভিক্ষুকের মত লাগছিল । মনে হচ্ছিল যাদের কাছে যাব তারা সবাই বলবে, ভিক্ষা নাই, মাফ কর । নূরকে আমার আশংকার কথা বলতেই তিনি খুব বিরক্ত হলেন । ভুরু কুঁচকে বললেন, কি আশ্চর্য আমরা কি ভিক্ষা করতে যাচ্ছি নাকি ? ভাল একটা কাজে যাচ্ছি । মুখ এরকম শুকনা করে রাখবেন না । হাসি মুখে থাকুন । স্মাইল, স্মাইল ।

আমি মুখ হাসি হাসি করে রাখলাম । যাদের সঙ্গে দেখা করলাম তাঁরাও মুখ হাসি হাসি করে রাখলেন । মানি ড্রাইভ হাসাহাসির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল । এরচে বেশি কিছু হল না । তবে তাঁরা সবাই অত্যন্ত উৎসাহ দিলেন । ফিল্মে এই দেশে ভাল কিছু কাজ হওয়া দরকার, কেন যে হচ্ছে না তা নিয়ে তাঁদেরকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হল । সারাদিন ধনবানদের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরলাম । নূরের ভুবন মোহিনী হাসি ততক্ষণে কাষ্ঠ হাসিতে পরিণত হয়েছে ।

সন্ধ্যার পর কয়েকজন প্রকাশক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন । কথা প্রসঙ্গে ছবি বানানোর কথা উঠল । তাদের একজন 'সুবর্ণ' প্রকাশনীর জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন, 'হূমায়ূন ভাই আপনি মূলত একজন লেখক । ছবি বানানোর ঝামেলায় কেন নিজেকে জড়াচ্ছেন ? ছবির চিন্তা বাদ দিয়ে লেখালেখি করুন । মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লেখার কথা অনেক দিন থেকে বলছিলেন সেটা শুরু করুন । ছবি বানানোর জন্যে যে টাকা দরকার সে টাকা যোগাড় করাও আপনার জন্যে কঠিন হবে ।

আমি বললাম, এক কাজ করুন টাকাটা আপনারা যোগাড় করে দিন । সব প্রকাশকরা মিলে আমাকে বেশি না ৩০ লক্ষ টাকা চাঁদা করে তুলে দিন । আপনাদের টাকা আমি এমনি না পারি বই লিখে লিখে ফেরত দেব । কি পারবেন না ?

জাহাঙ্গীর সাহেবও অবিকল আসাদুজ্জামান নূরের মত কাষ্ঠ হাসি হাসতে লাগলেন । সেই হাসি অতি মধুর কিন্তু দেখতে ভাল লাগে না ।

আমার একফোঁটা ঘুম হল না । নিজেকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হতে লাগল । শেষ রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছে । আমি শহীদুল্লাহ হলের বারান্দায় এসেছি বৃষ্টি দেখতে তখন হঠাৎ মনে হল আচ্ছা বাংলাদেশ সরকার কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন না ? সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী'তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে হয়েছিল ।

বাইরে ঝুমঝুম করে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি নিজে নিজের সঙ্গে কথা বলছি ।

'তোমাকে কেন সাহায্য করবে ? তুমিতো সত্যজিৎ রায় নও ।'

'সত্যজিৎতো আর শুরুতে সত্যজিৎ হননি পরে হয়েছেন ।'

'ফালতু লজিক দিয়ে লাভ নেই । তুমি দয়া করে ঘুমুতে যাও । সবচে ভাল হয় যদি চিত্রনাট্যটা ছিঁড়ে ফেল ।'

'এত কষ্ট করে একটা চিত্রনাট্য দাঁড় করিয়েছি ছিঁড়ে ফেলব ?'

'অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলবে । ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত এটা তোমাকে যন্ত্রণা দেবে । শোন এক কাজ কর ছেঁড়ার দরকার নেই । আগুন ধরিয়ে দাও । সেই আগুনে এক কাপ চা বানিয়ে খাও । 'আগুনের পরশমণি'র চা ।'

আমি ঠিক করলাম তাই করব । ছবি নিয়ে অনেক কষ্ট করেছি আর না । আগামীকাল ভোরের প্রথম চা হবে আগুনের পরশমণির চা । মন মোটামুটি শান্ত হল । ভোর পাঁচটায় ঘুমুতে গেলাম । গাঢ় ঘুম হল । ঘুম ভাঙল সকাল দশটায় । আগুনের পরশমণির চা খাওয়ার কথা । সেই চা না খেয়ে আমি চিত্রনাট্য বগলে নিয়ে রওনা হলাম সেক্রেটারিয়েটের দিকে । তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব । তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করব যে বাংলাদেশ সরকারের উচিত মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে ছবিটি তৈরি হতে যাচ্ছে সেই ছবিতে সাহায্য করা ।

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাহেবের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। শুরুতে আমার ধারণা ছিল উনি আমার সঙ্গে দেখাই করবেন না। মন্ত্রীরা লেখকদের মত অভাজনদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করেন না। আমার ধারণা তিনি ভুল প্রমাণ করলেন, আমি কি বলতে চাচ্ছি তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। তারপর বললেন, আপনিতো লেখক মানুষ, ছবি বানানোর আপনি কি জানেন?

আমি বললাম, আমি কিছুই জানি না তবে আমি শিখব।
'শিখে ছবি বানাবেন?'
'জ্বি।'
'নিজের উপর আপনার এত বিশ্বাসের কারণ কি?'
'অন্যের উপর বিশ্বাস করার চেয়ে নিজের উপর বিশ্বাস করাটা কি ভাল না?'

'আপনার আগুনের পরশমণি উপন্যাসটা আমার পড়া নেই। উপন্যাসটা পাঠিয়ে দেবেন। দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

আমি বাসায় ফিরলাম আশাহত হয়ে। মন্ত্রীরা যদি বলেন, দেখি। তাহলে ধরে নিতে হবে তাঁরা দেখবেন না। এত দেখার তাঁদের সময় কোথায়? তারপরেও আমি আগুনের পরশমণির একটা কপি নাজমুল হুদা সাহেবকে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর তরফ থেকে আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।

যখন মোটামুটি নিশ্চিত হলাম ছবি বানানোর প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবে না তখন হঠাৎ একশ' পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলে উঠল। আশার আলো।

আসাদুজ্জামান নূর খবর আনলেন তাঁর এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভদ্রলোক সানোয়ারা কর্পোরেশনের মালিক। নাম- নুরুল ইসলাম বিএসসি, ব্যবসা করেন। লেখালেখির মধ্যে জড়িত আছেন। কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে।

আমি নূরকে বললাম, চলুন চিটাগাং যাই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে সব ফাইনাল করে আসি। নূর বললেন, উনার একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে— আপনি সেই প্রকাশনা উৎসবের সভাপতি। তখন চিটাগাং যাবেন, ছবি নিয়ে কথাবার্তা আমরা তখনই ফাইনাল করব।

প্রকাশনা উৎসব, সভাপতিত্ব এইসব ব্যাপার আমার খুব অপছন্দ। তারপরেও গেলাম। বই-এর প্রকাশনা উৎসব হল। সাড়ে তিন ঘন্টা আমি সভাপতির আসনে হাসি হাসি মুখে বসে রইলাম। গলা শুকিয়ে গেলে টেবিলে রাখা পানির গ্লাসের পানি চুক চুক করে খাই। সাহিত্য সমালোচকরা একের পর এক দীর্ঘ ক্লান্তিকর বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁদের বক্তব্যের সার কথা হচ্ছে— বাঙলা সাহিত্যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। একজন বললেন 'বেকনের পর এমন অর্ন্তভেদী দৃষ্টি নিয়ে নুরুল ইসলাম বি· এস· সি, ছাড়া আর কোন লেখকের আগমন হয়েছে বলে তিনি জানেন না।

যাই হোক প্রকাশনা উৎসব শেষ হল। রাতে হোটেলে ফিরে এসেছি। ছবি নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হবে। অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি। ভদ্রলোক এলেন এবং তাঁর নিজের একটি গল্প নিয়ে আমাকে ছবি করতে বললেন। উপজাতীয় এক তরুণীর প্রেম গাঁথা।

আমি তাঁর কথা শুনলাম এবং সেই রাতেই ঢাকায় চলে এলাম। ট্রেনে করে ফিরছি আর ভাবছি নিজেকে কেন এত ছোট করছি? অন্যের উপর আমাকে কেন নির্ভর করতে হবে? এলিফ্যান্ট রোডে আমি একটা এপার্টমেন্ট কিনেছি। এটা বিক্রি করে ফেলব- তারপর যা হবার হবে। ঘর বাড়ি এত কিছু মানুষের লাগে না। "How much land does a man require?" টলস্টয়ের বিখ্যাত গল্পইতো আছে- মানুষের প্রয়োজন মাত্র সাড়ে তিন ফুট জায়গা।
মন শান্ত হল।

ঠিক করলাম ঢাকায় নেমেই ছবির কাজ শুরু করব। মূল কাজ ধরার আগে পাখি উড়ার দৃশ্যটা নিয়ে নিতে হবে। চিত্রনাট্যে আগুনের পরশমণির শেষ দৃশ্যে আছে— বদি ভোরের আলো স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। জানালা গলে রোদ এসে পড়েছে বদিউল আলমের হাতে। ডিজলভ হয়ে আমরা চলে যাচ্ছি

প্রকৃতিতে। ভোরের আকাশে উড়ছে পাখি। একটা দু'টা পাখি না— ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

শীত শেষ হয়ে আসছে। দেশান্তরী পাখির দল বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে এই দৃশ্য নিতে হলে এখনই নিতে হবে। আনুষ্ঠানিক ছবি তৈরী শুরু করার আগেই দৃশ্যটা নিয়ে রাখতে হবে। দেরী করা খুব বোকামী হবে।

ঢাকায় পৌঁছানোর তিন চার দিনের মধ্যেই পাখির দৃশ্য শুট করার ব্যবস্থা করলাম। অল্প কিছু ফিল্ম (দুই হাজার ফুট) কিনলাম। একটা মিচেল ক্যামেরা ভাড়া করলাম। এফডিসির একটা ক্যামেরাম্যানকে এবং আমার সহকারী তারা চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে রাত তিনটার সময় রওনা হলাম। ডেষ্টিনেশন-চিড়িয়াখানা।

চিড়িয়াখানার ঝিলে তখনো দেশান্তরী পাখি আছে। ভোর বেলা এদের এক সঙ্গে উড়িয়ে দেয়া হবে তখন ছবি তুলে রাখা হবে।

চিড়িয়াখানার অনুমতি আগেই নেয়া ছিল। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত চারটা হয়ে গেল। তখনো চারদিক গাঢ় অন্ধকার। ঝিলের পাশে ক্যামেরা পেতে বসে আছি। চিড়িয়াখানার পশুরা ডাকা ডাকি করছে। সিংহের ডাকে শরীরের রক্ত পানি হয়ে যাবার জোগাড়। একেক বার ডাকে আমি আঁৎকে উঠি।

রাজ্যের মশা আমাদের ছেঁকে ধরল। শব্দ করে মশা মারতে পারছিনা। শব্দ শুনে একটা পাখি আকাশে উঠলে অন্যরাও উঠবে। দেখতে দেখতে সব পাখি আকাশে উড়তে শুরু করবে।
আমাদের সব পরিশ্রম, সব আয়োজন জলে যাবে।

শীতে কাঁপছি- খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। আফসোস করছি বিরাট বোকামী হয়ে গেছে, এমন সময় দেখি রূপবতী দুই তরুণী ফ্লাস্ক হাতে ভয়ে ভয়ে আসছে। জানা গেল তারা চিড়িয়াখানার পরিচালকের দুই কন্যা। আমি গভীর রাতে চিড়িয়াখানার ভেতর বসে আছি শুনে এরা ফ্লাস্কে করে চা এবং অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এসেছে। এদের একজন বলল, স্যার আমরা যদি আপনার সঙ্গে বসে থাকি আপনি কি রাগ করবেন ?

আমি বললাম, বসে না থাকলেই রাগ করব। তোমরা বস। আমার ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে একটা সিংহ খাঁচা ছেড়ে বের হয়ে পড়েছে। তোমরা দু'জন আমার দু পাশে থাকলে ভয় একটু কম লাগবে।

এক সময় ভোর হল। আমরা প্রাণপনে ঝিলের পানিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলাম। পাখিরা আকাশে উড়ল- হাজার হাজার পাখি যখন একসঙ্গে ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তৈরী হয়। পাখির শব্দে, বাতাসের শব্দে, পাখিদের ডাক সব মিলে মিশে তৈরী হয় এক অলৌকিক শব্দের জগত। শরীর ঝিম ঝিম করতে থাকে। বার বার মনে হয় একি দেখছি।

দৃশ্য ধারণ করা হল। ছবির রাশ না দেখে বোঝার উপায় নেই ব্যাপার কি দাঁড়িয়েছে। রাশ না দেখেই আমার মনে হল আমি যা চাচ্ছিলাম তা পাইনি। আকাশ এবং চরাচর ছিল কুয়াশায় ঢাকা। ছবি যা আসবে- কুয়াশার কারণে অস্পষ্ট আসবে।

ক্যামেরাম্যানকে আমি বলে দিয়েছিলাম পাখি যখন উড়তে শুরু করবে আমি আপনাকে কিছুই বলব না। আপনি আপনার মত ছবি নিতে থাকবেন। আমার নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। নির্দেশ দেবার মত সময় পাওয়া যাবে না। যখন পাখি উড়তে শুরু করল তখন ক্যামেরাম্যান কনফিউজড হয়ে গেলেন বলে মনে হল। কি করবেন, কোন দিকে ক্যামেরা ধরবেন তা যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। একবার হুমড়ি খেয়ে ক্যামেরার গায়ে পড়েও গেলেন।
আমার মন বলতে লাগল— অসাধারণ একটা দৃশ্য আমরা ধরতে পারলাম না।

বাসায় ফিরতে ফিরতে সকাল ন'টা বেজে গেল। মশার কামড়ে সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। শারীরিক ক্লান্তির চেয়েও মানসিক ক্লান্তির ব্যাপারটি প্রবল হয়ে দেখা দিল। যা করতে চেয়েছিলাম করতে পারিনি।

বাসায় খবরের কাগজ দিয়েছে। মন খারাপ নিয়ে খবরের কাগজ হাতে নিলাম। প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়েছে- ছবি নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার অনুদান প্রথা আবার চালু করেছেন। এ বছর ২৫ লক্ষ টাকার অনুদান

পেয়েছে তিনটি ছবি।

আগুনের পরশমণি
পোকা মাকড়ের ঘরবসতি
অন্য জীবন

আমি বিকট একটা চিৎকার দিলাম। কাজের মেয়ে আমার জন্যে চা নিয়ে আসছিল সে আমার চিৎকার শুনে হাত থেকে চায়ের কাপ ফেলে দিয়ে— ও আম্মাগো খালুজানের কি জানি হইছে বলে আমার চেয়েও বিকট চিৎকার দিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল।

আমি শুনেছি ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাহেব একক প্রচেষ্টায় এই অনুদান আমাকে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনুদান কমিটিতে যখন আমার নাম উঠল তখন চিত্র জগতের সবাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই কঠিন আপত্তি তুললেন— ছবির জগতের সঙ্গে কোন রকম যোগ নেই, এমন একজনকে কেন অনুদান দেয়া হবে? সরকারী অর্থের এমন অপচয় কেন করা হবে?

নাজমুল হুদা সাহেব বললেন, (আমার শোনা কথা। কতটুকু সত্যি তা নাজমুল হুদা সাহেবই বলতে পারেন)। দেখুন সরকারী অর্থের অনেক অপচয়ইতো হয়। হাজার চেষ্টা করে আমরা অপচয় বন্ধ করতে পারি না। না হয় হল আরেকটু অপচয়। ছবির জগতে আপনারা যারা আছেন তাঁদের তো অনেক অনুদানই দেয়া হয়েছে তেমন কিছু কি আপনারা আমাদের দিতে পেরেছেন? এমনও হয়েছে টাকা দেয়া হয়েছে অথচ ছবি তৈরি হয়নি। হুমায়ূন আহমেদকে দিয়ে আমরা না হয় একটা এক্সপেরিমেন্টই করলাম। দেখা যাক না।
তিনি যদি ফেল করেন আপনারাতো আছেনই।
আপনারা ভাল ভাল সব ছবি বানাবেন।

নাজমুল হুদা সাহেব ছবি তৈরির প্রতিটি পর্যায়ের খোঁজ খবর করেছেন। বার বার এসে ছবির রাশ দেখেছেন। তিনি একা আসেননি তাঁর স্ত্রীকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন, আরে আপনি তো পারেন দেখি। কি আশ্চর্য!

আমার জন্যে অসম্ভব বেদনাদায়ক ব্যাপার হল ছবির প্রিমিয়ার শো'তে আমি নাজমুল হুদা সাহেবকে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি। 'প্রিমিয়ার শো'র উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে ছবি দেখতে আসেন। নাজমুল হুদা সাহেব তখন মন্ত্রী নন। তারপরেও আমার একজন বিশেষ অতিথি হিসেবে তাঁকে নিমন্ত্রণ করার অনুমতি আমি পাইনি। রাজনীতির খেলা বড়ই বিচিত্র।

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাহেবের জন্যে আমি আলাদা করে 'আগুনের পরশমণি'র বিশেষ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি এফডিসির মিলনায়তনে। ১০০ গোলাপের একটা তোড়া আমার হয়ে তাঁর হাতে তুলে দেয় আমার অভিনেত্রী কন্যা শীলা আহমেদ।
যিনি অন্যের স্বপ্নকে গুরুত্ব দেন রক্ত গোলাপতো তাঁর জন্যেই।

কুশীলব প্রসঙ্গ

যাত্রা হল শুরু। পাত্র-পাত্রী ঠিক করে ফেলা হল।
উপন্যাসের রাত্রি চরিত্রটি করবে বিপাশা হায়াত। রাত্রি খুবই রূপবতী তরুণী, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে ইউনিভার্সিটি বন্ধ। দিনের পর দিন ঘরে বন্দী হয়ে মেয়েটি হাঁপিয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে সে মাঝে মাঝে ছাদে যায়। তার মনে নানান স্বপ্ন। নিভৃতচারী এই তরুণী তার স্বপ্নের কথা কাউকে বলে না। অবরুদ্ধ নগরীতে যখন পূর্ণিমার চাঁদের উথাল পাথাল জোছনা উঠে তখন তার খুব ইচ্ছে করে গাইতে—

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে উছলে পড়ে আলো
ও রজনী গন্ধা, তোমার গন্ধ সুধা ঢালো॥

একদিন তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল বদিউল আলম— একজন মুক্তিযোদ্ধা। সে মেয়েটির সাধ ও স্বপ্নের ব্যক্তিগত ভুবন ভেঙ্গে খান খান করে দিল।

রাত্রি চরিত্রে বিপাশাকে নেয়ার ব্যাপারে আমি বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হলাম। আমাকে বলা হল যে ধরনের অভিব্যক্তি প্রধান অভিনয় রাত্রিকে করতে হবে সে ধরনের অভিনয় ক্ষমতা মেয়েটির নেই। সে করে সংলাপ নির্ভর অভিনয়। নাটকের জন্য তা ঠিক আছে। চলচ্চিত্রের জন্যে একেবারেই মানানসই নয়। চলচ্চিত্রে কথা বলতে হবে চোখেমুখে। তাছাড়া মেয়েটির গলার স্বর মিষ্টি না। একটু খসখসে, চোখের মণিও কালো নয়, খানিকটা ব্রাউন। বড় পর্দায় যখন চোখ দেখা যাবে তখন সেই বাদামী চোখ মায়াটা তৈরি করতে পারবে না। তারপরেও আমি তাকে নিলাম কারণ একটিই—

আগুনের পরশমণি তার অতি প্রিয় উপন্যাসের একটি। এই তথ্য আমার জানা।

বিপাশাকে মূল চরিত্রে নিয়ে আমি ভুল করিনি। সে চমৎকার অভিনয় করেছে। রাত্রির হাহাকার অবলীলায় পর্দায় নিয়ে এসেছে। তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার মা নিজের হাতে উলের একটা ব্যাগ বানিয়ে

অবরুদ্ধ নগরীর জোছনা। চাঁদের আলোয় সবাই এসে বসেছে। রাত্রি গুনগুন করে গাইছে— চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে.............।

তাকে উপহার দিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে ১৯৯৪ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। পুরস্কার প্রাপ্তির পর অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুধু আমি কিছু বলিনি। আজ লিখিতভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিপাশা, তুমি আমার রাত্রিকে গভীর মমতায় পর্দায় নিয়ে এসেছ। তোমাকে অভিনন্দন। তোমার অভিনয় জীবন মঙ্গলময় ও অর্থবহ হোক এই শুভ কামনা।

বদিউল আলমের ভূমিকায় অভিনয় করতে আমি আহবান জানালাম আমার অতি প্রিয় অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরকে। বয়সের একটু হেরফের হল। উপন্যাসের বদিউল আলম টগবগে তরুণ আর নূর পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। পেছন দিকে ক্যামেরা ধরলে মাথায় টাকের আভাস দেখা যায়। বয়স তার থাবা ফেলেছে চেহারাতেও, ভালমত তাকালে মুখে সূক্ষ্ম বলিরেখা ধরা পড়ে। চোখের নিচে কালির ছায়া। ৫০ এর কাছাকাছি বয়সের একজন মানুষ তেইশ বছরের যুবকের অভিনয় কিভাবে করবে ?
আমি বললাম, পারবে। নূর হচ্ছে নূর। বাজারে বিকল্প ট্যাক্সি পাওয়া যায়। বিকল্প নূর কোথায় পাব ?
নূর প্রমাণ করলেন এখনো তিনিই শ্রেষ্ঠ। আমার উপন্যাসের বদিউল আলমকে আমি চোখের সামনে দেখতে পেলাম।
রাত্রির বাবা মা'র চরিত্র করতে এলেন দুই শক্তিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী-আবুল হায়াত, ডলি জহুর। খুব বিনয়ের সঙ্গে বলি যে ধরনের অভিনয় এই দু'জনের কাছ থেকে আশা করেছিলাম সে ধরনের অভিনয় পাইনি। সমস্যাটা তাঁদের নয়, আমার। আমি অভিনয় আদায় করতে পারিনি। এই দু'জন এতই শক্তিমান অভিনেতা যে তাদের কাছ থেকে যা চাওয়া হবে তাঁরা তাই দেবেন। আমি চাইতে পারিনি কিংবা নিজে বুঝতে পারিনি ঠিক কি চাইছি।

বদিউল আলমের মা'র ভূমিকায় অভিনয় করতে এলেন আমার প্রিয় অভিনেত্রী দিলারা জামান, অভিনয়ের জন্যে একুশে পদকে সম্মানিত শিল্পী। আগুনের পরশমণিতে তাঁর চরিত্রটি খুব ছোট। এই ছোট জায়গাটি তিনি

অপালা— যার প্রধান কাজ রান্নাঘর থেকে ডিম চুরি করে এনে ডিমের খোসায় ছবি আঁকা।
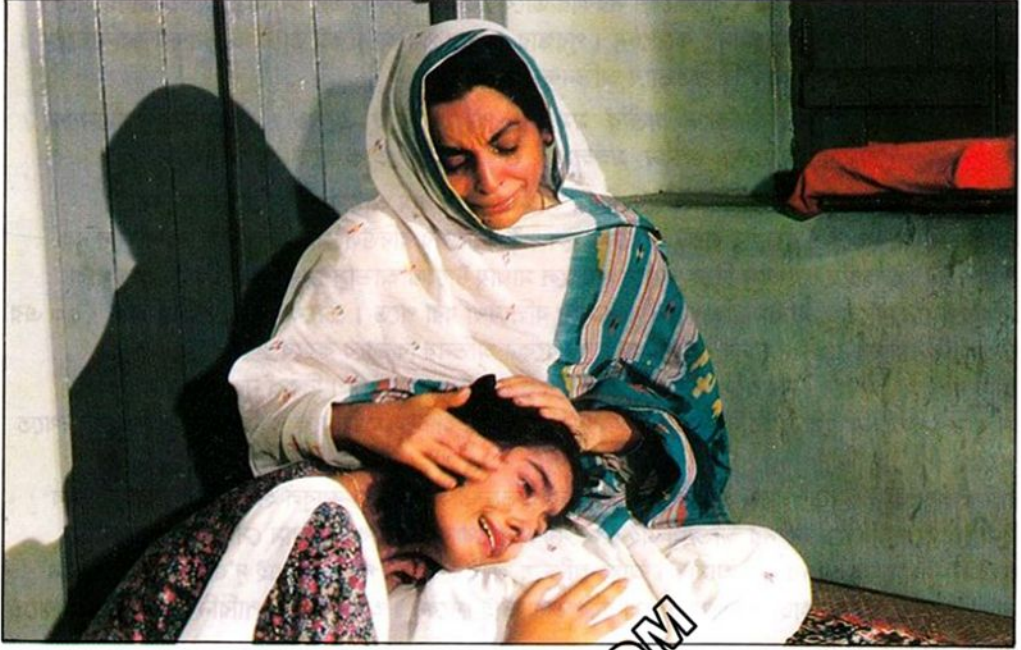
মুক্তিযোদ্ধা ছেলে চলে গিয়েছে। যুদ্ধ শেষে হয়তো ফিরে আসবে। হয়তো ফিরে আসবে না। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে মমতাময়ী বোন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কাঁদছেন মা।

যেন ঝড়ের মত এসে এক রাশ নীল পদ্ম ফুটিয়ে দিয়ে গেলেন।

রাত্রির ছোটবোন পাগলাটে অপালার ভূমিকায় আমি পক্ষপাতমূলক আচরণ করলাম। নিলাম আমার কন্যা শীলাকে। একেই বোধ হয় বলে স্বজন প্রীতি। এই মেয়ে ন্যাচারালিস্টিক অভিনয়ে ওস্তাদ। চোখে মুখে কথা বলে। মনে হয় জন্ম সূত্রে সে এই ক্ষমতা নিয়ে এসেছে। শুধু একটাই ত্রুটি (সব ন্যাচারালিস্টিক অভিনেতা অভিনেত্রীর ভেতর এই ত্রুটি অল্প বিস্তর থাকে। শীলা কথা বলার সময়ও ন্যাচারালিস্টিক ব্যাপারটা নিয়ে আসে। অভিনয়ের মত কথা বলাতেও তখন আঞ্চলিক টান চলে আসে। সে কথাও বলে অতি দ্রুত। যখন কথা বলে মনে হয় পাঞ্জাব মেইল ছুটে যাচ্ছে।

বড় পর্দায় অভিনয় শীলা আগে কখনো করেনি। তা নিয়ে তার কোন ভয় বা সংকোচ লক্ষ্য করলাম না। যখন যা করতে বলছি করছে। খুব স্বাভাবিক ভাবে করছে। দেখে মনে হচ্ছে মায়ের পেট থেকে নেমেই সে সিনেমা করা ধরেছে— এটা তার কাছে কোন ব্যাপারই না। বাংলাদেশ সরকার শীলাকে আগুনের পরশমণি ছবিতে অভিনয়ের জন্যে ১৯৯৪ সনের শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। যেদিন পুরস্কার ঘোষণা করা হল সেদিন তার মা শীলাকে বলল, মা যাও বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে এসো।
শীলা বিস্মিত হয়ে বলল কেন ?
'কেন মানে ? তোমার বাবার জন্যেইতো তুমি অভিনয়ের সুযোগ পেলে। সুযোগ না পেলেতো পুরস্কার পেতে না।'
শীলা বলল, মা তুমি একটা ভুল কথা বলছ। বাবা জানে আমি ভাল অভিনয় করি। সে জেনে শুনে আমাকে নিয়েছে। আমি খারাপ অভিনয় করলে বাবা আমাকে কখনো নিত না। তাকে আমি খুব ভাল করে চিনি এবং তুমিও চেন। তার কাছে তার মেয়ে প্রধান না। যে ভাল অভিনয় করবে সেই প্রধান। তাকেই সে নেবে। আমাকে সে তার মেয়ে হিসেবে সুযোগ দেয়নি, ভাল অভিনয় করি সেই হিসেবে সুযোগ দিয়েছে। এবং আমি ভাল অভিনয় করেছি। তার জন্যে শুধু শুধু বাবাকে ধন্যবাদ দিতে যাব কেন ? বাবার উচিত আমাকে এসে কংগ্রাচুলেট করা।

'এমন অহংকার করা তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ ?'

শীলা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, বাবার কাছ থেকে।

শীলার মা খুব রেগে গেল এবং আমার কাছে মেয়ের ব্যাপারে নালিশ করতে এল। আমি সব শুনে বললাম শীলা ঠিকই বলেছে। আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার তার কোন কারণ নেই। আমারই উচিত তাকে কংগ্রাচুলেট করা। চল কংগ্রাচুলেট করে আসি।

কাজের মেয়ে বিন্তির চরিত্রে অভিনয় করতে এল গাজীপুরের মেয়ে পুতুল। ভীতু ভীতু ধরনের ছোটখাট মেয়ে। অভিনয়ের দারুণ নেশা। সুযোগ পেলেই গাজিপুর থেকে একা একা রামপুরা টেলিভিশন ভবনে চলে আসে। প্রযোজকদের দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে উঁকি দেয় কেউ যদি দয়া করে কোন নাটকে সুযোগ দেয়। বয়স ভাঁড়িয়ে (বেশী বয়স দেখিয়ে) সে এক ফাঁকে অডিশনও দিয়ে দিল এবং যথারীতি ফেল করল। আমি তখন কোথাও কেউ নেই টিভি সিরিয়ালের জন্যে অভিনেতা অভিনেত্রী খুঁজছি। তিনটি মেয়ে দরকার যারা প্রসটিটিউটদের চরিত্র করবে। কেউ রাজি হচ্ছে না। একদিন বরকতউল্লাহ সাহেব আমাকে বললেন, দেখুনতো এই মেয়েটাকে দিয়ে চলবে ? এর নাম পুতুল। গাজীপুরে থাকে।

আমি এক ঝলকে দেখেই বললাম, চলবে।

মেয়েটি কোথাও কেউ নেই ধারাবাহিক নাটকে ঢুকে গেল। তেমন কিছু করতে পারলনা। অবশ্যি তেমন সুযোগও ছিল না। আমি এই তিন কন্যাকে হাই লাইট করতে চাইনি। নাটক শেষ হয়ে গেল। আমি মেয়েটিকে ভুলে গেলাম। তার সঙ্গে আবার দেখা হল গাজীপুরে। সেখানে 'কবি' নামে একটি ডকুমেন্টারী বানাচ্ছি। গ্রামের ভেতর সেট ফেলে কাজ করছি। একদিন এই মেয়ে আমাদের কাজ দেখতে এল। প্রথম দেখায় চিনতে পারলাম না— শাড়ি পরে ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে রাজকন্যা সেজে এসেছে। মাথার সব চুল ছেড়ে দেয়া, চুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। আমি চুল দেখে মুগ্ধ। আমি বললাম, এই মেয়ে তুমি কি তোমার চুলগুলি কেটে কদমছাঁট করতে রাজি আছ ?
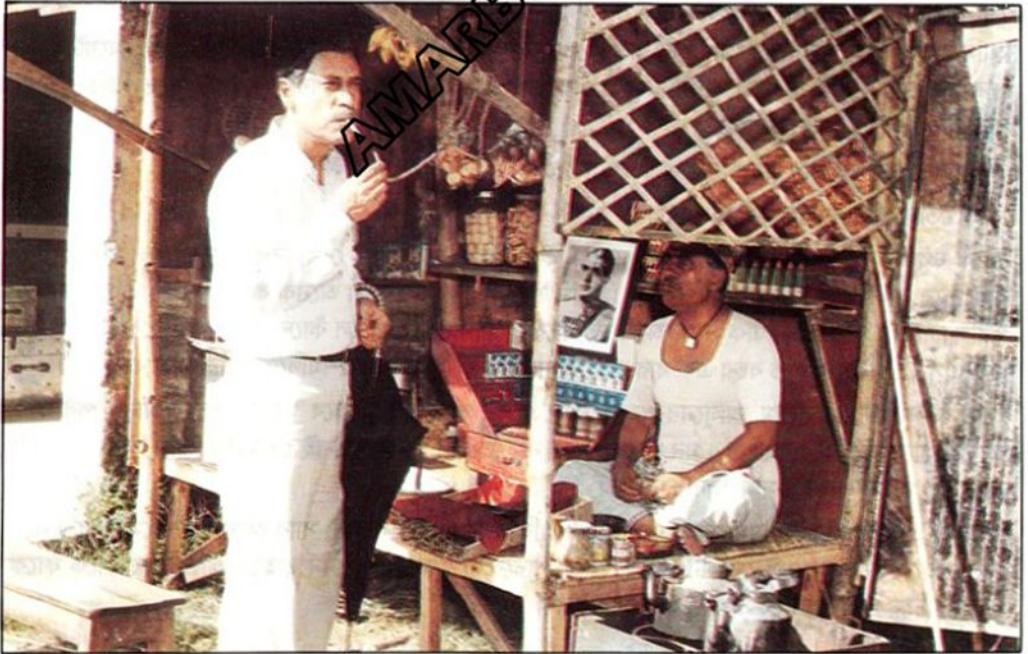
মতিন সাহেব অফিসে যাবার পথে সব সময় এই পান দোকান থেকে একটা সিগারেট কেনেন। দোকানীর সঙ্গে দু' একটা কথা হয়। দোকানে ইয়াহিয়া খানের ছবি।
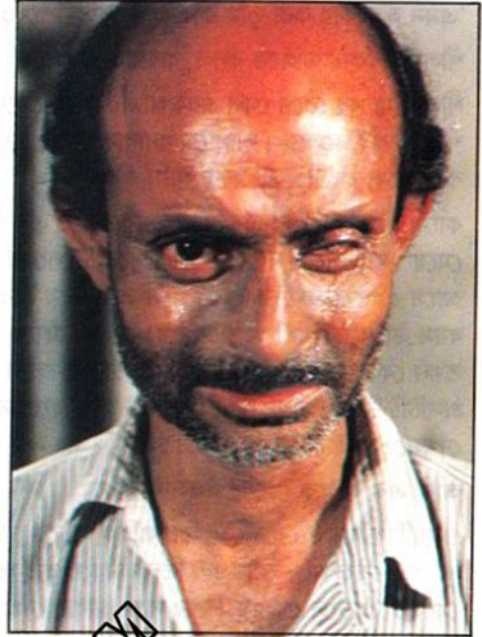
কাজের মেয়ে বিন্তি। বাইরের অশান্ত জগতের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই। সে আছে তাঁর নিজ ভুবনে। যুদ্ধ শেষ হলে তার বিয়ে হবে এই খবরটি তার কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

অভিনেতা শংকর। তাঁর প্রতিটি শট খুব কম করে হলেও একুশবার করে নিতে হয়েছে।

সে অবাক হয়ে বলল, কেন ?

আমি বললাম, আগুনের পরশমণি ছবি করছি, সেখানে কাজের মেয়ের একটা চরিত্র আছে। সে মেয়েটার চুল কদমছাঁট করা। তুমি যদি চুল কদমছাঁট করতে রাজি হও তাহলে তোমাকে বিন্তি চরিত্রটি দিতে পারি। আধা ঘন্টা চিন্তা করে আমাকে বলবে।

সে আধাঘন্টার মত দীর্ঘ সময় নিল না। দশ মিনিটের মাথায় বলল, চুল কাটব।

'বেশ তোমাকে যথা সময়ে খবর দেয়া হবে।'

তাকে যথা সময়ে খবর দিলাম। সে ছুটে এল। কিন্তু একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। দেখা গেল ছবির শুটিং যখন হবে তখন তার এস এস সি পরীক্ষা। আমি তাকে বললাম পরীক্ষা অনেক বড় ব্যাপার। তুমি ভালমত পরীক্ষা দাও। পরে কোন এক সময় আমি তোমাকে সুযোগ দেব। পুতুল কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এস এস সি পরীক্ষা প্রতি বছর এক বার করে আসবে কিন্তু আগুনের পরশমণিতো আর আসবে না।

আমি কঠিন গলায় বললাম, আগুনের পরশমণি না এলেও অন্য কিছু আসবে। আমি শিক্ষক মানুষ, পরীক্ষা আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মন খারাপ করো না, তোমার ভালর জন্যেই তোমাকে আমি নিচ্ছি না। তুমি ভাল মত পরীক্ষা দাও। সাম আদার টাইম।

পুতুলের এক চাচা কিংবা মামা সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, স্যার আপনি যদি মেয়েটাকে না নেন তাহলে মনের দুঃখেই মেয়েটা পরীক্ষা দিতে পারবে না। আর যদি নেন তাহলে অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে ফেলবে বলে আমার ধারণা।

আমি তাকে নিলাম।

পুতুল আনন্দিত গলায় বলল, দোকান থেকে চুল কেটে আসি ? কতটুকু ছোট করব ?

আমি বললাম, থাক চুল কাটতে হবে না।

আমি পুতুলের পরীক্ষার রুটিন দেখে তার শুটিং এর ডেট ফেললাম। এমনও হয়েছে পরীক্ষার হলের গেটে তার জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্র গাড়ি তাকে নিয়ে এসেছে এফডিসি তে।

মেয়েটির কঠিন পরিশ্রম বৃথা যায় নি। আগুনের পরশমণিতে অভিনয়ের জন্যে বাংলাদেশ সরকার তাকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে(শিশু শিল্পীর বিশেষ পুরস্কার) সম্মানিত করেছেন। আগুনের পরশমণি ছবি যখন জাপানে প্রদর্শিত হল তখন জাপানস্থ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির আমন্ত্রণে সে জাপানে গেল। গাজীপুরের দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন বাচ্চা একটি মেয়ের জন্যে এটা কম কি। সে যা করেছে নিজে নিজে করেছে।

পুতুল, তোমাকে অভিনন্দন।
তোমার অভিনয় জীবন মঙ্গলময় ও অর্থবহ হোক এই শুভ কামনা।

বলতে ভুলে গেছি পুতুল প্রথম বিভাগে খুব ভাল রেজাল্ট করে এস এস সি পাশ করেছিল।

খাদক হিসেবে পরিচিত মোজাম্মেল হোসেন (ঐ যে আস্ত গরু খেয়ে ফেলল। অয়োময়ের লাঠিয়াল) করলেন বদিউল আলমের মামা। তাঁর খুব শখ ছিল গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছেন এমন একটা দৃশ্য করেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন, এরকম মৃত্যু দৃশ্য একটা লিখে দেন দেখেন ফাটাফাটি অভিনয় করে দেব। আগুনের পরশমণির শেষের দিকে তিনি গুলি খেয়ে মরার একটা সুযোগ পেলেন। তাঁর নিজের ধারণা খুব ফাটাফাটি কিছু করেছেন, আমার ধারণা মাটিতে লেছড়া মেরে পড়ে আছেন। তিনি অবশ্যি অভিনয় ভাল করেন, তার জিহ্বা কিছু সমস্যা করে— কথা জড়িয়ে যায়। কথা জড়িয়ে না গেলে তাঁর অভিনয় অবশ্যই আরো ভাল হত।

ঢাকাইয়া পান দোকানদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে এলেন সালেহ আহমেদ। আমার অতি প্রিয়জন-সদাচঞ্চল, হাসিখুশী একজন মানুষ। ক্রমাগত রসিকতা করছেন, অন্যের রসিকতায় হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। কে বলবে এই মানুষটির বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। অভিনয় তাঁর নেশা নয়, নেশার চাইতেও বেশী কিছু। আমার ধারাবাহিক নাটক 'কোথাও কেউ নেই'তে দারোয়ানের চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। আগুনের পরশমণিতে তাঁকে নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি জানতাম তাঁর অংশটি তিনি

বদিউল আলমের মামা'। সরকারী কর্মকর্তা। সারাক্ষণ আতংকগ্রস্ত থাকেন। রাস্তায় কোন শব্দ হলেই জানালার খড়খড়ি উচিয়ে বাইনোকুলারে দেখতে চেষ্টা করেন— কি হচ্ছে?

চমৎকার ভাবেই করবেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম তিনি যেন একমাস দাড়ি না কাটেন, শুটিং এর সময় মুখ ভর্তি দাড়ি থাকলে ভাল হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ে মিলিটারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অনেকেই দাড়ি রাখা ধরেছিলেন। শুটিং এর দিন দেখলাম সালেহ ভাই 'ক্লীন সেভ' হয়ে এসেছেন। আমি খুব রাগ করলাম। উনি বলার চেষ্টা করলেন, মেকাপম্যান নকল দাড়ি দিয়ে দিবে।

আমি জানি আমাদের মেকাপ-এর লোকজন দিনকে রাত করতে পারেন না। নকল দাড়ি দেখালে বোঝা যায় যে, নকল দাড়ি। এই জিনিসটি আমি চাচ্ছিলাম না। যাই হোক সালেহ ভাইকে নানান ধরনের দাড়ি দিয়ে গেট আপ দেয়া হল। কোনটিই আমার পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত তিনি অভিনয় করলেন দাড়ি ছাড়া। তাঁর অভিনয় চমৎকার হওয়া সত্বেও গেটআপ-এর ত্রুটি আমি ভুলতে পারিনি। গলায় বিঁধে থাকা কৈ মাছের কাঁটার মত এই ত্রুটি আমাকে ক্রমাগত খুঁচিয়েছে। আগুনের পরশমণির শুটিং এর পুরো সময়টায় সালেহ ভাইয়ের একটি রসিকতাতেও আমি হাসিনি। আমার রসিকতাতেও তিনি যেন হাসবার কোন সুযোগ না পান সেজন্য তিনি যখন আমার আশে পাশে থাকতেন তখন আমি জটিল বিষয় যেমন নন্দনতত্ত্ব, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, গ্রীন হাউস এফেক্ট এই সব নিয়ে কথা বলতাম। এবং এরপরেও তাঁর দিকে তাকাতাম না।

ছোট ছোট চরিত্রগুলিতে অসাধারণ কাজ করেছে, বদির বোনের ভূমিকায় তিথি, মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ করে তুহিন। তার আঙ্গুল কাটার দৃশ্য আমি যতবার দেখি ততবারই শিউরে উঠি। তুহিনের স্ত্রীর ছোট্ট ভূমিকায় সুবর্ণা মেওয়া নামের বাচ্চা একটা মেয়েও চমৎকার করেছে।

ওয়ালিউল ইসলাম ভুঁইয়ার কথা বলে আমি এই পর্ব শেষ করি। তিনি নৌবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। আগুনের পরশমণিতে পাকিস্তানী কর্নেলের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তাঁকে না দেয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে। আমাকে যদি বলা হয় আগুনের পরশমণিতে সবচে ভাল অভিনয় কে করেছেন ? আমি বলব-ওয়ালিউল ইসলাম ভুঁইয়া। আমার কথায় অনেকেই হয়ত রাগ করবেন, কিন্তু কথাটা সত্যি।

পাকিস্তানী কর্ণেলের ভূমিকায় ওয়ালিউল ইসলাম ভুঁইয়া। ব্যক্তিজীবনে নৌ-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উর্দ্ধতন কর্মকর্তা। অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

আমার সৈন্য সামন্ত

সহকারী পরিচালক ঃ মুনির হাসান চৌধুরী তারা

কুরোসাওয়া পৃথিবীর প্রথম সারির একজন পরিচালক। জাপানী ভাষায় অসাধারণ সব ছবি নির্মাণ করেছেন। তাঁর একটি আপ্ত বাক্য হল- "তুমি যদি ভাল ছবি বানাতে চাও তাহলে একজন ভাল সহকারী পরিচালক জোগাড় কর।"
আমি কুরোসাওয়ার উপদেশ মেনে নিয়ে একজন ভাল সহকারী পরিচালকের সন্ধানে বের হলাম। আমার এমন একজনকে দরকার যে শুধু কাজ জানে তাই না, কাজের খুঁটি নাটি আমাকে বুঝাতেও পারে। সে হবে একই সঙ্গে আমার সহকারী এবং আমার শিক্ষক। যাকে খুঁজে পেতে নিলাম তার নাম তারা চৌধুরী। সে তার প্রফেশন্যাল জীবন শুরু করেছিল টেলিভিশনের টেন্ডল হিসেবে। টেলিভিশনের টেন্ডল হচ্ছে এমন এক শ্রেণী যাদের কাজ প্রযোজকদের খাতা পত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা, চায়ের জোগাড় করা, আর্টিষ্টদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা ইত্যাদি। বিনিময়ে নাটক পিছু দুইশ থেকে পাঁচশ টাকা পাওয়া। যাই হোক তারা চৌধুরী এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করল। এবং মূল কাজ- ভিডিও ফিল্মের খুঁটি নাটি শিখতে শুরু করল। ভালই শিখল। প্রযোজকরা তার উপর নির্ভর করতে শুরু করলেন। সে আমার এইসব দিনরাত্রিতে মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। 'কোথাও কেউ নেই' তে বরকত উল্লাহ সাহেবের সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। ছবির লাইনেও দীর্ঘ দিন কাজ করেছে। তাঁর ফিল্ম সেন্স ভাল, আমার স্ক্রীপ্টের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়।
আমি তারাকে নিয়ে মোটামুটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর তখনি আমার পরিচিতজনরা আঁতকে উঠতে শুরু করলেন। তাদের একটাই কথা, আপনি করেছেন কি ? লোকে খাল কেটে কুমীর আনে আপনি খাল কেটে অক্টোপাশ নিয়ে এসেছেন। অক্টোপাশ আপনাকে আট পায়ে জড়িয়ে ধরবে আপনার মুক্তি নেই। এখনো সময় আছে তারার অষ্ট বাহু থেকে বের হয়ে আসুন। তারা চৌধুরী অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন পরিচালকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার কাজ করেনি। কোন পরিচালক দ্বিতীয়বার তাকে নেয় নি। আপনিও নেবেন না।
বোকারা অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে কোন কাজ করে না। বোকারা মনে করে তারা যা করছে তাই ঠিক। কাজেই আমি (বোকা বলেই হয়ত) আমার সিদ্ধান্ত বহাল রাখলাম। মনের মধ্যে একটা কিন্তু রয়েই গেল। এই ছবির সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত মোজাম্মেল হোসেন সাহেবকে (নির্বাহী প্রযোজক) জিজ্ঞেস করলাম, মোজাম্মেল সাহেব আপনিতো সবার কথাই শুনলেন। এখন আপনি বলুন তাকে কি রাখব ?

মোজাম্মেল সাহেব বললেন, হুমায়ূন ভাই আমার জানামতে আপনি কখনো কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেন নি। আপনি মনে করছেন তাকে দরকার কাজেই আপনি তাকে রেখে দিন। তারা চৌধুরী রয়ে গেল। নুহাশ চলচ্চিত্র থেকে তাকে এপয়েন্টমেন্ট লেটার দেয়া হল। তাকে সাহায্য করার জন্যেও কিছু এসিসট্যান্ট দরকার সে তাদের নিয়ে এল, আমি তাদেরও নিয়োগ পত্র দিয়ে দিলাম। তারা চৌধুরীর মাধ্যমে আমার সঙ্গে এসে যুক্ত হল মিনহাজ। মিনহাজ একটু ফিলসফার ধরনের। জগতের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই তার কিছু মন্তব্য আছে। মিনহাজ এখনো আমার সঙ্গে আছে। সৈন্য সামন্তের ভেতর দু'একজন ফিলসফার থাকতে হয়।
ভাল কথা তারা চৌধুরী নানান ভাবে আমাকে যন্ত্রণা দিলেও— তাকে নিয়ে আমি ভুল করিনি। তারাকে সহকারী নিয়ে যে কোন পরিচালকই নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারবেন।

সম্পাদনা ঃ আতিকুর রহমান মল্লিক

ছবির অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল সম্পাদনা। ছবির সম্পাদক প্রসঙ্গে আইজেনষ্টাইন বলেছেন সম্পাদক হচ্ছেন- A composer in audio visual co-ordinations. খুব ভারী কথা। এত ভারী যে আমার নিজের কাছে এর অর্থ পরিষ্কার নয়। ছবি নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি অনেক ভারী ভারী কথায় মাথা জ্যাম করে ফেলেছি। মূল কাজে নামার আগে ঠিক করলাম মাথাটা পরিষ্কার করে নেব। কোন তত্ত্ব কথা না— আমি যা করব তা হচ্ছে ঘটনাগুলিকে অতি সরল ভঙ্গিতে ভিস্যুয়েলী ট্রান্সফরম করব। প্রয়োজনীয় শট দেয়া থাকবে। সম্পাদক সেখান থেকে প্রয়োজনীয় শট বেছে নেবেন। এদের এমন ভাবে জোড়া লাগাবেন যেন ছবি দেখতে

এডিটর আতিকুর রহমান মল্লিক। সঙ্গে সহকারী এডিটর।

গিয়ে দর্শক বুঝতে না পারেন— যে আমার এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে যাচ্ছি। স্মুদ ট্রানজিশন। আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যিনি আমি কি চাচ্ছি তা মন দিয়ে শুনবেন। আমার চাওয়াটা ছবির ভাষায় অযৌক্তিক মনে হলেও তাকে গুরুত্ব দেবেন এবং একই সঙ্গে আমাকে ছবির সম্পাদনা শিখতে সাহায্য করবেন।

টিভি নাটক করতে গিয়ে সম্পাদনার কাজ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সম্পাদনার মত একটি বিরক্তিকর বিষয় আমি দিনের পর দিন সম্পাদকের পাশের টেবিলে বসে গভীর আগ্রহে দেখেছি। আমার লেখা এমন কোন নাটক বাংলাদেশ টেলিভিশনে হয়নি যার সম্পাদনা আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখিনি। ছবি বানানোর সময় এই দেখাটা আমার কাজে লেগেছে। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা এই তথ্য আসলে সত্যি।

সম্পাদক কে হবেন তা নিয়ে এই কারণেই বোধ হয় আমার তেমন দুশ্চিন্তা ছিল না। তবু সঙ্গত কারণেই চাচ্ছিলাম ভাল একজন সম্পাদক। কারণ মাধ্যমটি নতুন। ভিডিও নয় সেলুলয়েড।

একদিন সন্ধ্যায় আমার বাসায় বেড়াতে এলেন বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। ছোটখাট মানুষ, গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মত। হাসিখুশি ও বিনয়ী। ভদ্রলোকের নাম আতিকুর রহমান মল্লিক। আমার বাসায় বেড়াতে আসার উদ্দেশ্য একটি। তিনি শুনতে পেয়েছেন- আমি মুক্তিযুদ্ধের ছবি বানাতে যাচ্ছি। তিনি এই ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান। এই কথাটি আমাকে সরাসরি বলতে তাঁর সংকোচ হচ্ছে বলে তিনি শাহাদত চৌধুরীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।
আমি বললাম, ভাই আপনি সম্পাদনার কাজ কোথায় শিখেছেন?
তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, সম্পাদকের এসিসট্যান্টগিরি করে কাজ শিখেছি।
'ছবির সম্পাদনার বিষয়ে আপনি কি জানেন বলুনতো ভাই।'
তিনি হেসে বললেন, হুমায়ূন ভাই তেমন কিছু জানি না। শুধু একটা জিনিস জানি, আপনি যদি আমাকে

প্রয়োজনীয় শট দিয়ে দেন, তাহলে আপনি যা চাইবেন তাই আমি আপনাকে দিতে পারব। এইটুকু বিশ্বাস আমার আছে।

আমি মল্লিক সাহেবকে দলে নিয়ে নিলাম। পরে জানতে পারলাম বাংলাদেশের চিত্র জগতে এই ভদ্রলোক অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন সম্পাদক। তিনি কাঁচি হাতে নিয়ে রাতকে দিন করে ফেলার ক্ষমতা ধরেন।

চিত্র গ্রাহক ঃ আখতার হোসেন

"সেটে ক্যামেরা হল জনতা।"

আমার কথা না। এরকম ভারী ভারী কথা আমি বলতে পারি না। কথাটা বলেছেন-রোমান পোলানস্কি। এই কথায় তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন ? আমি জানি না। তিনি বলেছেন- ক্যামেরা নামক জনতাকে যিনি পরিচালিত করেন তাকেই বলা হয় ক্যামেরাম্যান। এখনো অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে না। তবে এই টুকু বোঝা যাচ্ছে যে রোমান পোলানস্কি ক্যামেরা এবং ক্যামেরাম্যানকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। সবাই তা করবে।

আমি আমার অল্প বুদ্ধিতে ক্যামেরাকে বলি দর্শকের চোখ। ক্যামেরা একটা বিষয় যে ভাবে দেখবে দর্শকও ঠিক সেই ভাবে দেখবে। দর্শকদের ভাল মত দেখানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করবেন ক্যামেরাম্যান। কোন না কোন ভাবে দর্শক মানসিকতা তাঁর জানা থাকতে হবে। আমাদের দেশে লাইটের কাজটা ক্যামেরাম্যানই করেন, সেই সম্পর্কেও তাঁর ভাল ধারণা থাকতে হবে। আমি এমন একজনকে চাচ্ছি যিনি পুরানো মানুষ কিন্তু নতুন কিছু করার আগ্রহ তাঁর আছে। ঝকঝকে ছবি তোলার কৌশলের ভেতরই তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়।

মোজাম্মেল সাহেব আখতার হোসেনের কথা বললেন। এফডিসির ক্যামেরাম্যান। পুরানো লোক। অনেক কাজ করেছেন। জহির রায়হানের সঙ্গেও ক্যামেরা ধরেছেন। অতি ভদ্র, অতি বিনয়ী।
মোজাম্মেল সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে মর্নিং ওয়াকে। আমি তাঁকে একদিন বাসায় চা খেতে ডাকলাম।
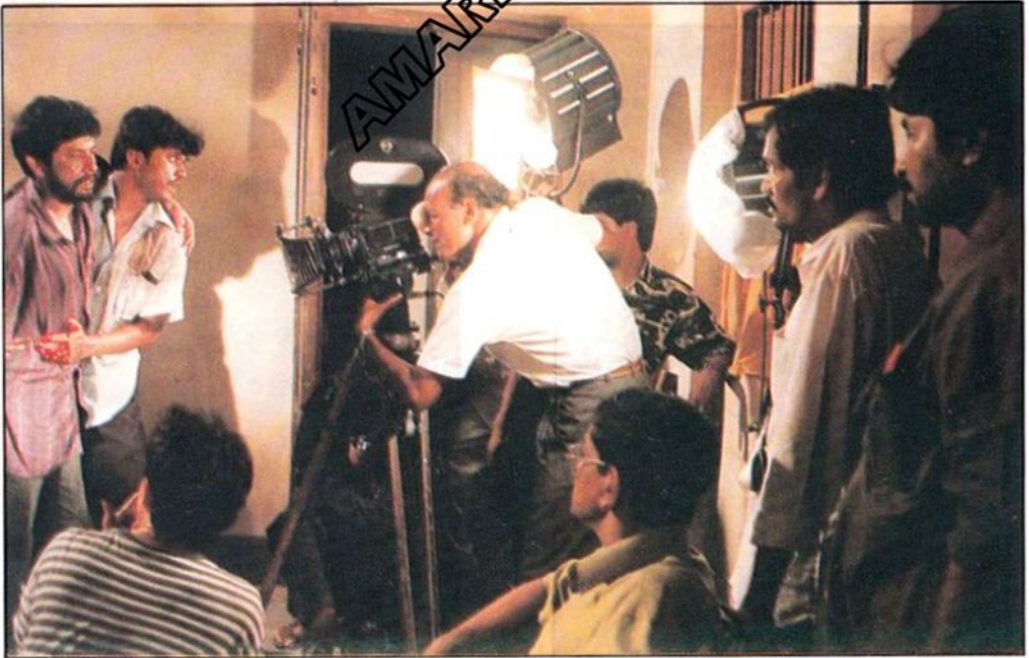
ক্যামেরাম্যান আখতার হোসেন। গুলিবিদ্ধ বদিকে রাত্রিদের বাড়ীতে আনার দৃশ্য শুট করা হচ্ছে।

ভদ্রলোক চা খেতে এলেন। দেখা গেল আসলেই তিনি অতি বিনয়ী, অতি ভদ্র। অমি বললাম, ভাই জোছনা আমার অতি প্রিয় একটি বিষয়। আপনি ক্যামেরায় জোছনা কিভাবে ধরবেন ? দৃশ্যটা আপনাকে বলছি। পূর্ণিমার রাত। রাত্রি ও অপালা বারান্দায় বসে আছে। তাদের গায়ে জোছনার নরম আলো পড়েছে। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরের বাতির হলুদ আলোও আসছে। দু' ধরনের আলো। জোছনার আলো এবং ঘরের আলো এই দু'টিকে আলাদা আলাদা করার বুদ্ধিটা কি ?

উনি চট করে বলতে পারলেন না। উনি বললেন, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করবেন। বিভিন্ন ধরনের লাইটিং করে ছবি নিয়ে নিয়ে দেখব এফেক্টটা আসছে কি না।

আমি বললাম, জোনাকি পোকা দেখাতে পারবেন ? জোনাকি জ্বলছে, নিভছে।

'এখন বলতে পারছি না চিন্তা করে বলব।'

'আমার বেশীর ভাগ কাজই রাতের, কাজেই লাইটিং অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ।

'বেশির ভাগ কাজ রাতের হলে আমরা হাই স্পীড ফিল্ম নিয়ে কাজ করব। হুমায়ূন ভাই আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন।'

'ভরসা করব কেন ?'

'ভরসা করবেন কারণ আমি কাজ জানি।'

ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাস আমার পছন্দ হল। তারচে যেটা পছন্দ হল তা হচ্ছে আমার সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি আগুনের পরশমণি বইটি বাজার থেকে কিনে এনে পড়ে নিয়েছেন। ঘটনাটি ছোট তবে তাতে আগুনের পরশমণির প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পেল।

বাজারে যেই রটে গেল আমি ক্যামেরাম্যান হিসেবে আখতার হোসেন সাহেবকে নিয়েছি ওমনি মোটামুটি একটা রব উঠে গেল। অনেকেই বললেন, করেছেন কি ? আপনি যে ধারার ছবি বানাতে চান আখতার হোসেন সেই ধারার ক্যামেরাম্যান না। এখনো সময় আছে বদলান।

সময় ছিল না। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। কথা দিলে আমি কথা রাখি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে বলেন— কেউ কথা রাখে না তা ঠিক না। কেউ কেউ কথা রাখে।

সিদ্দিকুর রহমান

আবদুর রহমান

সঙ্গীত পরিচালক সত্য সাহা ঘরোয়া মুডে

কড়াইয়ে তরকারী রান্নার সাউন্ড এফেক্ট তৈরি করছেন মিনহাজুর রহমান

সংগীত পরিচালক ঃ সত্য সাহা

আমি মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম সংগীত পরিচালক হিসেবে খোন্দকার নূরুল আলম সাহেবকে নেব। তাঁর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় আছে। শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর যখন ছিলাম তখন হলের গানের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে প্রায়ই তাঁকে খবর দিতাম। তিনি কখনো না বলতেন না। খুব আগ্রহ নিয়ে আসতেন। বিচারক হিসাবে 'শঙ্খনীল কারাগার' ছবিতে তাঁর কাজও আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। আগুনের পরশমণি ছবিতে কাজ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে একটি চিঠি লিখলাম। ফুলের তোড়া এবং চিঠি নিয়ে তার কাছে যাবে আমার সহকারী পরিচালক- খানিকটা নাটক করা হবে। আমাদের রসকষহীন গদ্য জীবনে হঠাৎ আসা নাটকীয়তা মন্দ লাগে না। চিঠি পাঠাতে পারছি না, খোন্দকার নূরুল আলম সাহেবের ঠিকানা লেখা কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি না—তখন এক কান্ড হল।

গভীর রাতে টেলিফোন। আমি বললাম, কে ?

ওপাশ থেকে বিনীত গলা শোনা গেল- দাদা আমার নাম সত্য সাহা।

'আপনি কেমন আছেন ?'

'খুব ভাল আছি।'

'গভীর রাতে টেলিফোন, ব্যাপার কি ?'

'দাদা আপনার আগুনের পরশমণি ছবিতে আমি থাকব না ?'

আমি একটু থমকে গেলাম। কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি না। সরাসরি 'না' আমি কখনো বলতে পারি না। না বলার আগ মুহূর্তে অদৃশ্য এক মানবী দু'হাতে আমার মুখ চেপে ধরে। সত্য সাহার প্রশ্নের জবাব দিতে অমি ইতস্তত করছি। সত্য সাহা বললেন—

'দাদা আমার জীবনে একটা দুঃখময় ব্যাপার আছে আপনাকে বলব ?

'বলুন।'

'সারাটা জীবন আমি গান নিয়ে কাটিয়েছি। অসংখ্য ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছি। এখন পর্যন্ত সংগীত পরিচালক হিসাবে কোন জাতীয় পুরস্কার পাইনি। যারা আমার সহকারী ছিলেন, পরবর্তীতে তারা সংগীত পরিচালক হয়েছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আমি যেই তিমিরে সেই তিমিরে। আমার ধারণা আপনার ছবিতে কাজ করলে আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাব।'

'মানুষের ভালবাসাতো পেয়েছেন। এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?'

'ঠিক বলেছেন। তারপরেও খানিকটা হতাশা থাকে। আমার খুব শখ আপনার ছবিতে কাজ করব। মনের আনন্দে কাজ করব এমন ছবিও পাই না। সব থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

আমি বললাম, বেশতো আসুন।

সত্য সাহা সংগীত পরিচালক হিসেবে যুক্ত হলেন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার যে রাতে ঘোষণা করা হল তার পরদিন খুব ভোরে দরজায় নক হচ্ছে। দরজা খুলে দেখি সত্য সাহা এবং তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। 'সত্যদা'র হাতে গোলাপ ফুলের একটা তোড়া। তাঁর স্ত্রীর হাতে এক বাক্স সন্দেশ।

সত্য সাহা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, গভীর আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমার মনের অনেক দিনের একটা চাপা কষ্ট আপনার জন্যে দূর হয়েছে।'

আমি বললাম, সত্যদা আমার জন্য না। আপনি পেয়েছেন আপনার কাজের পুরস্কার।

'আপনি আমাকে কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমি সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করেছি। কাজ করার স্বাধীনতা এখন নেই। আমরা যারা পুরানো দিনের সংগীত পরিচালক- তাদের সময়টা খুব খারাপ। খুব খারাপ। এখন বেশীর ভাগ পরিচালকই হিন্দী ফিল্মের গানের ক্যাসেট ধরিয়ে দিয়ে বলেন এই জিনিস চাই। আমার পক্ষে কি আর সেই জিনিস দেয়া সম্ভব?

সত্য সাহার সঙ্গে কাজ করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। এরকম নিরহংকারী বিনয়ী মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। কাজের সময় তাঁর ভাবভঙ্গি অবশ্যি পাল্টে যায়। মেজাজ ধীরে ধীরে চড়তে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় দু'হাতে মাথার চুল টানছেন। মুখের সব মাংসপেশী শক্ত। কাজের সময়ে তাঁর ভাবভঙ্গি ও মেজাজের পরিবর্তনের গ্রাফটা এরকম।

১। প্রাথমিক পর্যায় ঃ হাসিখুশি। রসিকতা করছেন। পা নাচাচ্ছেন।

২। ২য় পর্ব ঃ মুখ গম্ভীর। রসিকতা বন্ধ। চেয়ারে পা তুলে রাখছেন মেরুদন্ড সোজা।

৩। ৩য় পর্ব ঃ মাথার চুল টানছেন। একটার পর একটা সিগারেট চলছে। চোখের দৃষ্টি স্থির।

৪। ৪র্থ পর্ব ঃ চেয়ার ছেড়ে চেয়ারের হাতলে উঠে বসেছেন। চেয়ারের হাতল থেকে সামনের টেবিলে।

আমি তাঁর কান্ড কারখানা দেখে খুবই মজা পেয়েছি। আমার মনে আছে আমি মিনহাজকে বলেছিলাম সত্য সাহার জন্যে বিভিন্ন ধাপ বিশিষ্ট একটা কাঠের উঁচু আসন অর্ডার দিয়ে বানাতে। সত্যদার মেজাজ চড়তে থাকবে, তিনি এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে উঠতে থাকবেন। সর্বশেষ ধাপটা থাকবে ছাদের কাছাকাছি। ঐ ধাপে পৌঁছানোর পর সেদিনকার মত প্যাকআপ করা হবে। আগুনের পরশমণি ছবিতে আমি পুরো গান বলতে একটিই ব্যবহার করেছি— হাসন রাজার 'নেশা লাগিলরে।' আমার প্রিয় কিছু রবীন্দ্র সংগীতের অংশ বিশেষ ব্যবহার করা হয়েছে।

এই ছবির জন্যে আমি নিজে একটি গান লিখেছিলাম।

রাত্রি কোন এক সন্ধ্যায় গানটি বাড়ির ছাদের কার্নিশ ধরে গাইবে— এই ছিল পরিকল্পনা। গানটি আবিদা সুলতানার কণ্ঠে রেকর্ড করা হল। নিজের লেখা গান বলেই হয়ত আমার কাছে মনে হল অপূর্ব। এমন সুন্দর গানতো অনেক দিন শুনিনি। গানটি আমি শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করলাম না। মূল ছবির সঙ্গে গানটি যাচ্ছিল না। তাছাড়া গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হাসন রাজার পাশে হুমায়ূন আহমেদ লিখতে যে মনের জোর দরকার তা আমার ছিল না।

পাঠক- পাঠিকাদের জন্যে যে সব গান আমরা আগুনের পরশমণিতে ব্যবহার করেছি তা দিয়ে দিচ্ছি। কেন দিচ্ছি ? গানের কথাগুলি পড়বার সময় আপনারা মনে মনে গুন গুন করে গাইবেন এই আশায়।

সূচনা সংগীত

হাতে তাদের মারণাস্ত্র চোখে অঙ্গীকার
সূর্যকে তারা বন্দি করবে এমন অহংকার।
ওরা কারা
ওরা কারা
ওরা কারা
দৃপ্ত চরণে যায়
মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে তারা জীবনের গান গায়।
হাতে তাদের মারণাস্ত্র চোখে অঙ্গীকার
সব শৃঙ্খল গুড়ো করে দেবে এমন অহংকার ॥

সুর ঃ সত্যসাহা
কণ্ঠ শিল্পী ঃ শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ

হাসন রাজার গান

নিশা লাগিল রে
বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে
হাসন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিল রে
নিশা লাগিল রে
হাসন জানের মুখটি দেখি ফালদি ফালদি উঠে
চিড়া বাড়া হাসন রাজা বুকের মধ্যে কুঠে
নিশা লাগিলরে
বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে।

সুর ঃ হাসন রাজা
কণ্ঠশিল্পী ঃ শাম্মি আখতার।

রবীন্দ্র সংগীত
(অংশ বিশেষ)

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে।।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজলনয়নে, যূথিমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী, অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে দিক বাণী আনি বনমর্মরে।

শিল্পী ঃ মিতা হক

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে উছলে পড়ে আলো
ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো।।
পাগল হাওয়া বুঝতে নাড়ে, ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।।

শিল্পী ঃ মিতা হক

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূণ্য করো দহন দানে।।
আমার এই দেহ খানি তুলে ধরো
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে।।
শিল্পী ঃ মিতা হক

মাসুক হেলাল

শিল্পী মাসুক হেলাল নিজ থেকে এসে দলে যুক্ত হয়ে গেল। একদিন বাসায় এসে অত্যন্ত গম্ভীর এবং অভিমানে আক্রান্ত গলায় বলল,— হুমায়ূন ভাই আপনি ছবি বানাচ্ছেন আর আমি খবর পেলাম না।
আমি বললাম, তাই তো ভূল হয়েছেতো বটেই। কাজে লেগে যাও।
'তাতো লাগবোই। আপনি নিজে খবর দিয়ে আনলেন না, এতে মনে খুব কষ্ট পেয়েছি।'
'তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে দুঃখিত। এখন বল কোন দায়িত্ব নিতে চাও।'
'শিল্প নির্দেশক'।
'শিল্প নির্দেশনার কাজটা করছে মইনউদ্দিন সাহেব। তাঁকে সেট বানাতে বলা হয়েছে। তুমি বরং তার সহকারী হিসেবে কাজ কর।
'সহকারী হিসেবে কাজ করেতো হুমায়ূন ভাই আমি অভ্যস্ত না।'
'অভ্যস্ত না হলেও করতে হবে উপায় কি। ভাল ছবির স্বার্থে।'
'আপনি যুক্তিতে আমাকে আটকে ফেলছেন। তবে আমি পুরোপুরি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে চাই।'
'পোশাক পরিচ্ছদের দায়িত্ব নেবে ? কে কোন পোশাক পরবে।'
'মাসুক খানিকক্ষণ' গম্ভীর থেকে বলল, খুবই কঠিন দায়িত্ব হুমায়ূন ভাই-'৭১ এর সময়কার ফটোগ্রাফ থেকে

মাসুক হেলাল

ধ্রুব এষ
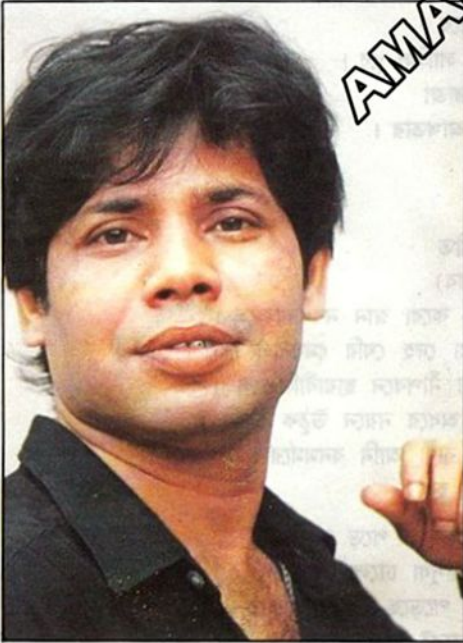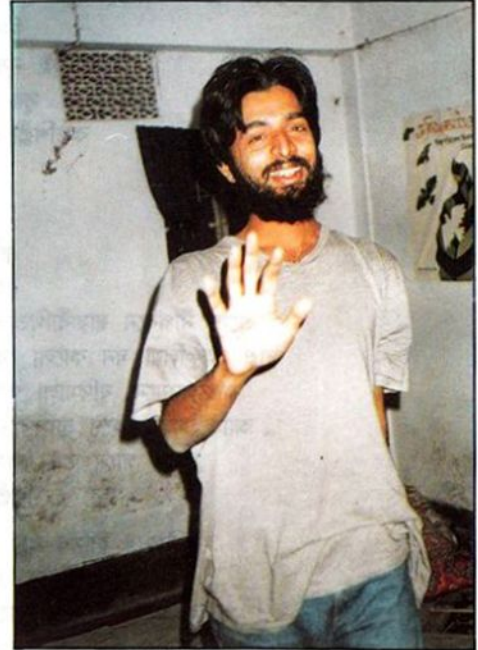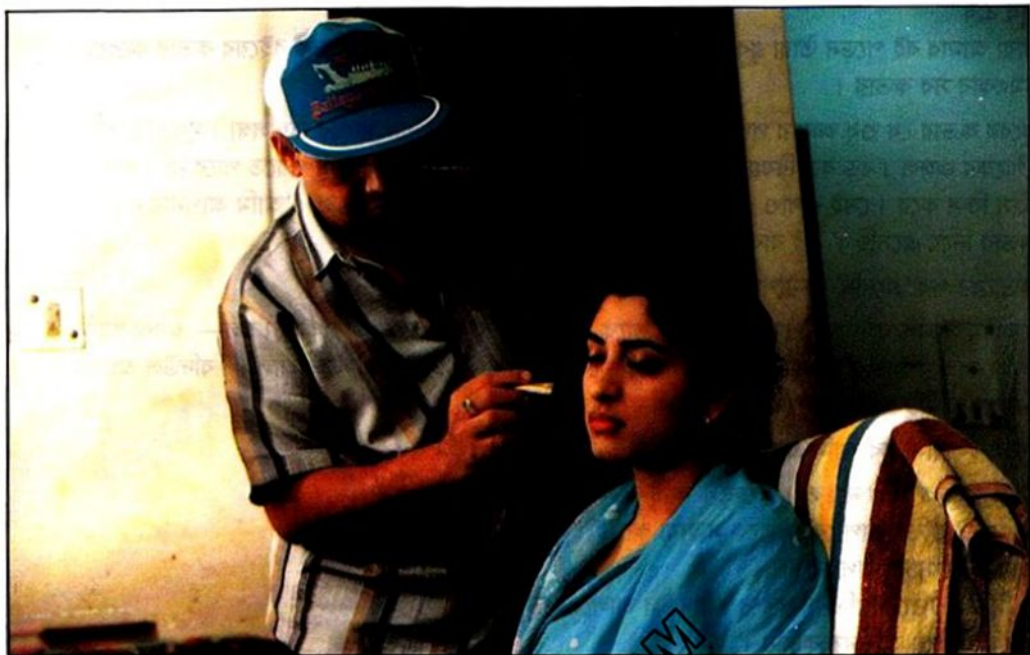
মেকাপম্যান দীপক কুমার শুর। বাংলা ছবির ইংরেজী নামকরণ তাঁর প্রধান হবির একটি। আগুনের পরশমণির তিনি ইংরেজী নামকরণ করেন The fire touching gem.

পোশাক বের করা-'
'কঠিন হলেও কাউকে না কাউকেতো কাজটা করতে হবে। হবে না ?'
'জ্বি হুমায়ূন ভাই।'
'তুমি ছাড়া এই কাজ কে করবে ? লেগে পড়।'
মাসুক লেগে পড়ল।
'৭১ সালের ফটোগ্রাফ জোগাড় করা, দর্জিকে দিয়ে পোশাক বানানো, আর্টিষ্টদের দোকানে নিয়ে গিয়ে শাড়ি কিনে দেয়া। তার উৎসাহের সীমা নেই।

মাসুক হচ্ছে আলুর মত সব তরকারিতেই আছে। শুটিং এর আগে ঘর ঠিক করছে, মেঝে নোংড়া, ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েছে, ডিমের খোসায় ছবি আঁকা দরকার। ছবি আঁকছে, আর্টিষ্টের মাথা ব্যথা—মাথা টিপে দিচ্ছে সব জায়গায় সে আছে। তার কোন দাবি নেই— সময়মত চা পেলেই হল।
ছবি তৈরীর সময় এমন একজন হাতের কাছে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে গল্পও খুব চমৎকার করতে পারে। শো বিজনেসে যারা আছে তাদের হাড়ির খবর (বেশীর ভাগই ভয়ংকর) সে এমন ভাবে বলে যে প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। আমি নিশ্চিত যে আমার সম্পর্কেও সে ভয়ংকর সব গল্প অন্যদের বলছে। বলুক। মাসুক চমৎকার একটি ছেলে— সামান্য মিথ্যা মজা করে বলার অপরাধ এমন কোন বড় অপরাধ না।

ভাল ছবির জন্যে মাসুকদের যে ভালবাসা সে ভালবাসায় কোন খাদ নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে ছবি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও মিলিয়ে গেল। ছবি বানানোর সময় তার প্রয়োজন ছিল সে এসেছে। ছবি বানানো শেষ হয়েছে। তার প্রয়োজন নেই সে সরে গেছে। আবারও যদি পত্রিকায় সে কখনো দেখে আমি ছবি বানাচ্ছি সে কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝুলিয়ে ছুটে আসবে। আহত, অভিমানী গলায় বলবে-হুমায়ূন ভাই, আপনি ছবি বানাচ্ছেন আমি খবর পেলাম না- এর মানে কি ?

ধ্রুব এষ

যারা আমার বই পড়েন তাঁরা ধ্রুব এষ নামটির সঙ্গে পরিচিত। ধ্রুব আমার অনেক বইয়ের কভার করেছে। চমৎকার সব কভার।

ধ্রুবের কভার যে শুধু আমার পছন্দ তা না— মানুষটিকেও পছন্দ। তালগাছের মত লম্বা। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। বড় বড় বিষণ্ণ চোখ। স্পঞ্জের সেন্ডেল ছাড়া পায়ে আর কিছু পরতে পারে না। কথা বলে ফিস ফিস করে। সেই কথাও সে এত কম বলে যেন টেলিগ্রাফিক ল্যাংগুয়েজ। 'আমি আপনার নতুন বইয়ের কভার নিয়ে এসেছি।' এই বাক্যটি সে একটা শব্দে বলবে— 'কভার'।

কভারের পর 'এনেছি' ক্রিয়াপদটা ব্যবহারের ঝামেলাতেও সে যাবে না।

একদিন সকালবেলা সে এসেছে— আমি তাকে ভালমত লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ মনে হল— আচ্ছা আমি আগুনের পরশমণির জন্যে বদিউল আলমকে খুঁজে বেড়াচ্ছি— এইতো বদিউল আলম। বদিউল আলমের নির্লিপ্ত ভঙ্গিটি ধ্রুবের শুধু যে আছে তা না— পুরোপুরি আছে।

আমি বললাম, ধ্রুব আমি একটি ছবি বানাচ্ছি শুনেছ নিশ্চয়ই।

সে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। অহেতুক কথা বলে জিহ্বাকে ক্লান্ত করল না।
'তুমি এই ছবির ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।'
আবার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়া।
'তুমি মূল চরিত্রে অভিনয় করবে। বদিউল আলমের ভূমিকায়।'
'আমি জীবনে অভিনয় করিনি।'
'আমিও জীবনে ছবি বানাইনি। আমি যদি ছবি বানাতে পারি তুমিও অভিনয় পারবে।' ধ্রুব গেল পুরোপুরি হকচকিয়ে। এই প্রথম সে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করতে শুরু করল— 'আগুনের পরশমণির ব্যাপারে আপনি যা করতে বলবেন করব। শুধু অভিনয় পারব না।'
ধ্রুবকে অনেক বলেও রাজি করাতে পারলাম না— ব্যাপারেও সে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই আগুনের পরশমণির সঙ্গে যুক্ত রইল।

সেট সাজানো।
৭১ সনের ক্যালেন্ডার তৈরী করে দেয়া।
ঘরের কোণে মাকড়শার ঝুল বানানো।

(এই কাজটা শেষ পর্যন্ত পারে নি। মাকড়শার দক্ষতা মানুষের পক্ষে অর্জন করা একটু মুশকিলতো বটেই)
ধ্রুব আগুনের পরশমণির প্রচারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রইল। পোস্টার বানানো, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের কপি তৈরী, সাব টাইটেলের লেখা সবই তার।

আমি ভাগ্যবান— আমাকে সাহায্য করার জন্যে একদল নিবেদিত মানুষ আমি পেয়েছিলাম।

চড়াই-উৎরাই

চল আজমীর

চিত্রনাট্যটি কয়েকবার পাঠ করা হল।

একবার আমার এলিফ্যান্ট রোডের বাসায়। একবার সুবর্ণা মুস্তাফার বাসায়। যাদের পড়ে শুনানো হল তাঁরা সবাই আমার অতি প্রিয়জন। কাজেই তাঁরা বললেন-চিত্রনাট্য চমৎকার হয়েছে। প্রিয়জনদের মুখের উপর আমরা কখনো খারাপ কিছু বলতে পারি না। শুধু আমার দুই কন্যা নোভা ও শীলা বলল— ভাল হয় নি। মূল উপন্যাস অনেক সুন্দর। চিত্রনাট্য মূল উপন্যাস থেকে সরে গেছে। আমি নানান যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম, উপন্যাস এবং ছবি দু'টি ভিন্ন মাধ্যম। এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে আসতে হলে কিছু সমস্যা হয়। উপন্যাসে নায়িকার মন খারাপের ব্যাপারটা এ ভাবে লিখতে পারি।

"রাত্রি চুপচাপ বসে আছে। তার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। তার ইচ্ছে করছে ভয়ংকর কিছু করতে। সেই ইচ্ছাটাও খুব প্রবল না। সুন্দর একটা প্রেমের গল্প পড়লে কেমন হয়?......"

রাত্রির মনের এই ভাব পর্দায় আনতে হলে অনেক ঝামেলা করতে হয়- তারপরেও ঠিকমত আসে না। আমার যুক্তি তর্কে কন্যারা কাবু হল না। তারপরেও আমি ধরে নিলাম চিত্রনাট্য ভাল হয়েছে।

চিত্রনাট্যে সিনেমার ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্রনাট্যতো তৈরি এখন কি করা যায়?

মোজাম্মেল সাহেব বললেন, এখন আজমীর।

'আজমীর মানে?'

'চিত্রনাট্য নিয়ে যেতে হবে আজমীর শরীফ। খাজা বাবার দোয়া নিয়ে আসতে হবে।'

আমি ভাবলাম মোজাম্মেল সাহেব ঠাট্টা করছেন। দেখা গেল তিনি মোটেই ঠাট্টা করছেন না। দারুণ সিরিয়াস।

হুমায়ূন ভাই, আমি মনস্থির করে ফেলেছি খাজা বাবার দোয়া না নিয়ে ছবি শুরু করব না। আপনি বিশ্বাস করেন আর না করেন— এরা মহাপুরুষ। এদের উছিলায় অনেক কিছু হয়। আপনি যা বলেন সবই আমি শুনি। আমার একটা কথা শুনুন। প্লীজ।

আমি বললাম, বেশতো চলুন আজমীর ঘুরে আসি। রাজস্থান আমার দেখার শখ ছিল। রাজস্থান দেখা হবে। মরুভূমিতে উটে চড়ে ঘুরব। গাধা, ঘোড়া, মহিষ এবং হাতীর পিঠে চড়া হয়েছে— শুধু উটের পিঠে চড়া হয়নি। উটের পিঠে চড়া হবে।

মোজাম্মেল সাহেব বললেন, খাজা বাবার কাছে যাচ্ছি— এরমধ্যে উট-ফুট আনবেন না।

অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হতে পারে— আমি এক সন্ধ্যায় সত্যি সত্যি খাজা বাবার দোয়া নেবার জন্যে প্লেনে চড়ে বসলাম। আমার সঙ্গী মোজাম্মেল সাহেব। আমার কন্যারা আমার কাণ্ড দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগল।

গুলতেকিন করল রাগ। সে বলল, তুমি ছবি বানাতে যাচ্ছ— বানাও তার জন্যে তোমার খাজা বাবার দোয়া লাগবে? তুমি তোমার জীবনে অসংখ্য সমস্যায় পড়েছ কখনোতো খাজা বাবার কাছে যাবার কথা তোমার মনে হয় নি। আজ কেন মনে হচ্ছে?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, আমি নিজের জন্যে যাচ্ছি না। মোজাম্মেল সাহেবের জন্যে যাচ্ছি, উনার খুব শখ।

'প্লীজ শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে না। তুমি ইচ্ছা না করলে মোজাম্মেল সাহেব আজমীর কখনো যেতেন না। তোমার গোপন প্রশ্রয়ে এটা হচ্ছে। ঠিক কিনা বল।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, ঠিক।

ভেবেছিলাম আজমীর পৌঁছে কোন একটা ভাল হোটেলে উঠব। সেটা সম্ভব হল না। বেশ কিছু খাদেম

আমাদের ছেঁকে ধরল। আজমীরে যা কিছু করতে হয় খাদেমের মাধ্যমে করতে হয়। থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থাও খাদেম করে দেন। সব ফ্রী। কাজ শেষ হলে যা মন চায় খাদেমকে দিতে হবে। একজন খাদেম আমাদের স্যুটকেস হাতে তুলে গম্ভীর মুখে রওনা দিয়ে দিলেন। আমরা চললাম তাঁর পিছ পিছু। ভদ্রলোকের চেহারা সুন্দর, চলা ফেরায় স্মার্ট ভঙ্গি আছে। উনার সঙ্গে কথাবার্তা যা বলার মোজাম্মেল সাহেবই বললেন। কারণ আমার হিন্দী জ্ঞান সর্ব নিম্ন পর্যায়ের। একটা শব্দ শুধু জানি 'শালগিরা'- জন্মদিন।

যাই হোক খাদেম তাঁর বাড়ির অন্ধকার একটা ঘর আমাদের ছেড়ে দিলেন। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। কার্পেটময় বিশাল সাইজের বালিশ। হাতীদের বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর সিস্টেম থাকলে তারা এ ধরনের বালিশ ব্যবহার করতো। আমাদের বলা হল গোসল সেরে লম্বা ঘুম দিতে। যথাসময়ে খানা চলে আসবে। কথা বার্তা যা হবার সন্ধ্যাবেলা বাদ মাগরেব হবে।

কমন টয়লেটে গোসল। সেই গণ টয়লেটের অবস্থা ভয়াবহ। দরজা বন্ধ করলে কবরের অন্ধকার। বাতির কোন ব্যবস্থা নেই।

আমরা সব মিলিয়ে দু'দিন, দু'রাত ছিলাম। এই দু'দিন খাবারের মেনু নিম্নরূপ

সকালের নাস্তা : বিরিয়ানী (ঘিয়ের পরিমাণ কম)
দুপুর : বিরিয়ানী (ঘিয়ের পরিমাণ, মাঝারি)
বিকালের নাস্তা : বিরিয়ানী (ঘিয়ের পরিমাণ স্বাভাবিক)
রাত : বিরিয়ানী (ঘিয়ের পরিমাণ, অতিরিক্ত)

সন্ধ্যাবেলা খাদেম এলেন। তাঁর সঙ্গে মোজাম্মেল সাহেবের নিম্নলিখিত কথোপকথন হল।
মোজাম্মেল সাহেব : ছবি বানাতে যাচ্ছি। চিত্রনাট্য নিয়ে এসেছি খাজা বাবার দোয়ার জন্য, ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
খাদেম : ব্যবস্থা হবে। তবে কয়েকটা ব্যাপার জানতে হবে। আজেবাজে কিছু ছবিতে থাকলে খাজা বাবার কাছে পেশ করা হয় না।
মোজাম্মেল : হুজুর আজে বাজে কিছুই ছবিতে নাই। এটা আর্ট ফিল্ম।
খাদেম : বিছানার কোন দৃশ্য আছে, বেড সীন?
মোজাম্মেল : জ্বি না।
খাদেম : নায়িকার বৃষ্টিতে ভিজা আছে?
মোজাম্মেল : তা আছে তবে খুব শিল্পসম্মত।
খাদেম : শাড়ির ভেতর দিয়ে শরীর দেখা যায় ?
মোজাম্মেল : ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ। কি যে বলেন হুজুর।
খাদেম : ড্যান্স আছে ?
মোজাম্মেল : জ্বি না।
খাদেম : ঠিক মত বলুন।
মোজাম্মেল : হুজুর এটা খুবই সিরিয়াস বই। ড্যান্সের কোন সুযোগই নাই।
খাদেম : দেখি চিত্রনাট্যটা দিন। আপনাদের সকালে খাজা বাবার কাছে নিয়ে যাব।
মোজাম্মেল : আলহামদুলিল্লাহ।
খাদেম : কিছু খরচপাতি আছে।
মোজাম্মেল : খরচ নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।
খাদেম একটা স্ক্রীপ্ট নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন।

রাতে ঘিয়ে জবজবা বিরিয়ানী খেয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছি। সারা শরীর থেকে ঘিয়ের গন্ধ আসছে। এমন সময় খাদেম ফিরে এলেন। হাতে স্ক্রীপ্ট। ভুরু খানিকটা কুঁচকানো। ঘরে ঢুকেই বললেন, স্ক্রীপ্টেতো বিরাট গণ্ডগোল।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ভদ্রলোক বলেন কি ? স্ক্রীপ্টে গণ্ডগোল মানে ? গণ্ডগোল যদি থাকেও উনি ধরবেন কি ভাবে ? পুরো চিত্রনাট্য বাংলায় লেখা। শুধু সিকোয়েন্স নাম্বারগুলি ইংরেজীতে দিয়েছি।

আমি বললাম ঃ কি গণ্ডগোল ?

খাদেম বিরক্ত গলায় বলল, ফুপু কা কারেক্টর মিসিং। দ্যাট ওয়াজ এ ভাইটাল কারেক্টর।

সত্যি সত্যি যদি চোখের কপালে উঠার কোন সিস্টেম থাকতো তাহলে আমার চোখ কপালে উঠে যেত। সিস্টেম নেই বলে কপালে উঠল না তবে চোখ ছানাবড়া হলতো বটেই। আসলেই চিত্রনাট্যে রাত্রির ফুপুর চরিত্রটি নেই। মূল উপন্যাসে আছে। এই ফুপু স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতরই রাত্রির বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। রাত্রি তাতে রাজিও হয়ে যায়।

উর্দু ভাষাভাষী এই খাদেমের সেই তথ্য জানার কোন সম্ভাবনা নেই। জানলে একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলেই জানতে পারেন। আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। আজ পর্যন্ত আমি এমন কাউকে পাইনি যার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে।

আমি বললাম, আপনি কি করে জানলেন চিত্রনাট্যে ফুপু নেই ? আপনারতো জানার কোন কারণ নেই।

'আমার স্ত্রী চিত্রনাট্য পড়েছে। সে বলেছে।'

'আপনার স্ত্রী বাংলা পড়তে পারেন ?

'হ্যাঁ পারে। সে ঢাকার মেয়ে। আপনার অনেক বই তার পড়া। আপনি তাকে চেনেন।'

'তাঁর নাম কি ?'

'তার নাম সাজিয়া।'

আমি সাজিয়া নামের কোন মেয়েকে চিনি না। কিন্তু মোজাম্মেল সাহেবকে দেখলাম নাম শোনা মাত্র লাফিয়ে উঠলেন— 'ও সকাল সন্ধ্যার সাজিয়া। কি অদ্ভুত ব্যাপার।'

মোজাম্মেল সাহেবের কাছেই শুনলাম সাজিয়া আফরিন নামে 'সকাল সন্ধ্যায়' একজন রূপবতী তরুণী অভিনয় করেছিলেন। পরে তাঁর বিয়ে হয় আজমীর শরীফের এক খাদেমের সঙ্গে। যেহেতু 'সকাল সন্ধ্যা' সিরিয়াল চলাকালীন সময়ে আমি ছিলাম দেশের বাইরে তাই আমি মেয়েটিকে চিনি না। তবে তাতেও আমার বিস্ময়ের কোন কমতি হয়নি। সুদূর বাংলাদেশের একটি মেয়ে আজমীর শরীফের দরগার জীবনে আটকা পড়ে আছে। ভাবা যায় না।

মেয়েটির সঙ্গে আমাদের দেখা হল। সে খুব কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখল। আমার কৌতূহলও কম ছিল না। মেয়েটি খুব স্পষ্ট করে মিষ্টি গলায় বলল, আগুনের পরশমণি বইটি আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন পড়ি। আমার প্রিয় বই। ফুপুর সঙ্গে রাত্রির কথাবার্তা আমার খুব পছন্দ ছিল। আপনি চিত্রনাট্যে সেই অংশ বাদ দিয়েছেন। আমার অনুরোধ সেই অংশ আপনি ঢুকিয়ে দেবেন।

'আচ্ছা দেব। আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। এখানকার জীবন আপনার ভাল লাগছে ?

মেয়েটি দৃঢ় গলায় বলল, হ্যাঁ।

'আপনার দু'টি ছেলে আছে ওরাও কি বড় হয়ে দরগা শরীফের খাদেম হবে ?'

'হ্যাঁ হবে। বংশ পরম্পরায় এদের তা হতে হবে। আমি তাতে অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না। আপনি আমার ছেলে দু'টির জন্যে দোয়া করবেন। আপনাকে আমার বাড়িতে বসে থাকতে দেখব আমি কখনো ভাবিনি।'

'দেশের একটি মেয়ের সঙ্গে এভাবে দেখা হবে আমি নিজেও কখনো ভাবিনি। পৃথিবী বড়ই বিচিত্র।'

'জ্বি স্যার। পৃথিবী বিচিত্র। আপনি আমার জন্যেও একটু দোয়া করবেন।'

আমি বললাম, কি দোয়া ?

মেয়েটি আমার প্রশ্নের জবাব দিল না, অদ্ভুত এবং শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কেউ দোয়া চাইলে আমরা মুখে বলি অবশ্যই দোয়া করব— আসলে করা হয় না। আমি করলাম। তৎক্ষণাৎ পরম করুণাময়কে বললাম, 'এই মেয়েটির জীবন যেন অর্থবহ ও মঙ্গলময় হয়। হে পরম করুণাময় তোমার

কাছে আমার এই প্রার্থনা'।

খাজা বাবার দরবারে চিত্রনাট্য জমা দেয়ার হাস্যকর ব্যাপারটি বলতে না পারলে আমি সবচে সুখী হতাম। বলতে যখন বসেছি সবই বলব—

সকাল বেলা আমরা তিনজন প্রসেশন করে রওনা হলাম। সবার আগে খাদেম। তাঁর হাতে চিত্রনাট্য। তাঁর পেছনে আমি। আমার মাথায় কুলা। কুলা ভর্তি ফুল। আমার পেছনে মোজাম্মেল সাহেব, তাঁর মাথায়ও কুলা। কুলা ভর্তি ফুল। গায়ে হলুদে মেয়েরা যে ভাবে মাথায় বরণ ডালা নিয়ে যায় আমরা সেই ভাবেই যাচ্ছি। আমি ক্রমাগত মনে মনে বলছি— হে আল্লাহপাক আমি এমন কি পাপ করেছি যে এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে ? তুমি আমার প্রতি এইটুকু দয়া কর যেন কেউ আমাকে দেখে না ফেলে।

আমাদের প্রসেশন খাজা বাবার মাজারে গিয়ে থামল। মাজারটা সুন্দর। চারদিক সোনার তৈরী রেলিং। মূল কবর দামী গিলাফ দিয়ে ঢাকা। খাদেম আমাদের মাথার কুলার ফুল মাজারে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর হাতের 'চিত্রনাট্য' গিলাফের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। আমাদের বললেন, ছবির শুটিং যেদিন শেষ হবে সেদিন এই 'চিত্রনাট্য' গিলাফের ভেতর থেকে বের করা হবে। এতটা কখনো করা হয় না, আপনাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা।

আমি ফিস ফিস করে বললাম, চিত্রনাট্যটা গিলাফের ভেতর ঢুকানো হল কেন ? খাজা বাবার পড়ার জন্যে ? খাদেম সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

মোজাম্মেল সাহেব বললেন, হুজুর উনার কথায় কিছু মনে করবেন না, উনি উল্টা পাল্টা কথা বললেও মনটা খুব পরিষ্কার।

খাদেম সাহেব আমাদের বলে দিলেন ছবির শুটিং যেদিন শেষ হবে সেদিন তাকে যেন টেলিফোনে খবর দেয়া হয়। তখন চিত্রনাট্য গিলাফের নিচ থেকে রিলিজ করা হবে।

আমরা খবর দেই নি। কে জানে আগুনের পরশমণির চিত্রনাট্য এখনো হয়তো খাজা বাবার গিলাফের নিচে পড়ে আছে।

অথ-পরীক্ষা সমাচার

সবতো হয়ে গেল এখন কাজে নেমে পড়া যায়। পঞ্জিকা দেখে শুভদিন বের করে মহরত করে ফেলা যেতে পারে। সহকারী পরিচালক তারা চৌধুরীকে বললাম হুইসেল বাজিয়ে দিতে। সে দেখি কেমন আমতা আমতা করে। কিছু কি বাদ পড়ে গেল ? সমস্যাটা কি ? আমি তারাকে বললাম, আর কোন সমস্যা আছে ?

সে বলল, স্যার আছে।

'থাকলে বলে ফেল। সমস্যা পেটের ভেতর লুকিয়ে রাখলে আমি বুঝব কি করে ?'

'স্যার আপনার একটা পরীক্ষা দিতে হবে।'

'আমার পরীক্ষা দিতে হবে মানে ? কিসের পরীক্ষা ?'

'পরিচালক সমিতি আপনার একটা পরীক্ষা নেবে। আপনি পরিচালক হবার যোগ্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখবে। ওরা যদি যোগ্য মনে করে তাহলে আপনি পরিচালক সমিতির সদস্য হবেন, তখন ছবি পরিচালনা করতে পারবেন।'

'কি ধরনের পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ?'

'জ্বি না ভাইবা'।

'বল কি তুমি। এই যন্ত্রণার কথাতো আগে শুনি নি। পরীক্ষায়তো আমি ডাহা ফেল করব।

তারা চৌধুরী হাসি মুখে বলল, আপনি ফেল করলে আর কেউ পাশ করতে পারবে না।

আমার প্রতি তারা চৌধুরীর বিশ্বাস দেখে আমার আনন্দিত হবার কথা। তেমন আনন্দ পেলাম না বরং কলজে শুকিয়ে গেল। ছবি পরিচালনায় আমার বিদ্যা বুদ্ধি শূন্য। এই বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে ধরা খেলে লজ্জার ব্যাপার

হবে।

একটা ভরসা অবশ্যি আছে, আমার মত শূন্য বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে আমার আগে আরো অনেকেই ছবি করতে এসেছেন। এসে কাজ শিখেছেন। অসাধারণ সব ছবি বানিয়েছেন। আবার অনেকেই কিছুই শিখতে পারেন নি। তাঁরাও শূন্য বিদ্যা বুদ্ধি নিয়েই করে খাচ্ছেন।

এক সকালে দুরু দুরু বক্ষে পরীক্ষা দেবার জন্যে পরিচালক সমিতির অফিসে প্রবেশ করলাম। তিনবার "ইয়া মুকাদ্দেমু" বলে ডান পা প্রথমে ফেললাম। পরীক্ষার হলে ঢুকে সত্যিকার অর্থেই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। কুড়ি জনের মত পরীক্ষক (সবাই পরিচালক) গম্ভীর মুখে বসে আছেন। পরীক্ষা কমিটির সভাপতি চাষী নজরুল ইসলাম। সবার হাতেই কাগজ কলম। আমাকে নাম্বার দেয়া হবে। আমি মনে মনে খাস নেত্রকোনার ভাষায় বললাম, "আমারে খাইছেরে !"

এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নিজের অজ্ঞতা শুরুতেই স্বীকার করে নেয়া ভাল এই মনে করে আমি শুরুতেই দীর্ঘ এক ভাষণ দিয়ে ফেললাম। ভাষণের সারমর্ম হচ্ছে— ছবি পরিচালনার আমি কিছুই জানি না। আমি শিখতে এসেছি। আমি খুব দ্রুত শিখতে পারি। আমি যখন কোন সমস্যায় পড়ব— আপনাদের কাছে যাব। আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন এবং শেখাবেন। এই ভরসাতেই ছবি পরিচালনার দূরূহ কাজে এসেছি।

আমার বক্তৃতায় তেমন কাজ হল বলে মনে হল না। চাষী নজরুল ইসলাম সাহেব বোর্ড মেম্বারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন আপনাদের যা প্রশ্ন আছে একে একে করুন।

পরীক্ষকরা নড়েচড়ে বসলেন। প্রথম প্রশ্ন করা হল।

"হুমায়ূন কবীর সাহেব ছবির পরিচালনা বলতে আপনি কি বুঝেন ?"

আমি বিনীত ভাবে বললাম, কিছু মনে করবেন না। আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ।

"সরি আহমেদ সাহেব— আমার প্রশ্ন হচ্ছে ছবির পরিচালকের কাজটা আসলে কি ?"

আমি বললাম, ছবি পরিচালকের মূল কাজ হচ্ছে ক্রিকেট খেলার আম্পায়ারের মত একটা শাদা টুপি পরে হাসি মুখে চেয়ারে বসে নায়িকাদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করা।

আমার কথায় পরীক্ষকদের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। আমি বললাম, ভাই রসিকতা করছি। এটাতো নিশ্চয়ই ফরমাল কোন পরীক্ষা না। রসিকতার উপর বিধি নিষেধ নিশ্চয়ই নেই।

চাষী নজরুল ইসলাম বললেন, হুমায়ূন সাহেব প্রশ্নের জবাবটা দিন। পরিচালকের সংজ্ঞা দিন।

আমি যথাযথ গম্ভীর গলায় বললাম, আইজেনস্টাইনের মতে ছবি যদি ষ্টীম ইনজিন হয় তাহলে পরিচালক হচ্ছেন সেই ষ্টিম ইনজিনের ষ্টিম।

(আইজেনস্টাইন এই জাতীয় কথা কখনো বলেননি। আমি দেখলাম আমার অবস্থা শোচনীয়। ভারী কিছু কথা না বললে পার পাওয়া যাবে না। অন্যের নাম দিয়ে নিজের কথা বললাম। পরীক্ষায় রচনা লেখার সময় যে কাজটা অনেকে করে— রচনার মাঝখানে নিজের কথা বিখ্যাত কারো নামে চালিয়ে দেন- "এই জন্যে জনৈক বিখ্যাত কবি বলেছেন বলে নিজের দুর্বল দু' লাইন কবিতা)

আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করা হতে লাগল।

'লেন্স কি ?'

'টপ শট কখন নেয়া হয় ?'

'কত ধরনের ক্যামেরা আছে ?'

'হাই স্পীড ফিল্ম কি ?'

'সেকেণ্ডে ক'টা করে ফ্রেম পার হয় ?'

যা শুরু হল তাকে হাস্যকর কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছু বলার কোনই কারণ নেই। যারা প্রশ্ন করছিলেন তাঁরা তাদের অজ্ঞতার কথাই আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। একজন প্রশ্ন করলেন আউট অব ফোকাস কখন হয়। তিনি হয়তো জানেন না যে পদার্থ বিদ্যার একটি শাখা আছে যার নাম 'অপটিকস'। লেন্স, তার ফোকাল লেংথ এইসব বিষয় অপটিকস এর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ যা আমাকে পড়ে আসতে হয়েছে।

আমি আমার জীবনে অনেক হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। এরকম হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নি।

পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। জানা গেল আমি কোনক্রমে পাশ করেছি। পরিচালকদের কেউ কেউ আমাকে ১০০ র ভেতর শূন্য দিয়েছেন। আবার দু' একজন ১০০ তে ৯০ দিয়েছেন। নম্বরের এরকম হেরফের কি করে হল সেও এক রহস্য।

আমার রেজাল্ট খুব খারাপ হওয়াতে আমাকে সরাসরি পরিচালক সমিতির সদস্যপদ দেয়া হল না। সহযোগী সদস্যপদ দেয়া হল।

যাই হোক এখন আমাকে পুরোপুরি সদস্য পদ দেয়া হয়েছে। পরিচালক সমিতির সদস্য হিসেবে আমি সমিতির কাছে একটি অনুরোধ রাখছি— পরিচালকদের পরীক্ষা নেয়ার এই হাস্যকর ব্যাপারটি উঠিয়ে দেয়া হোক। পরিচালনা একটি ক্রিয়েটিভ কাজ, সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড। সৃষ্টিশীল কাজের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না। লেন্স কত প্রকার ও কি কি, ক্যামেরা কত প্রকার? এইসব কোন পরিচালককে করার প্রশ্ন নয়। পরিচালকের কাজ সেলুলয়েডে জীবনের ফুল ফুটানো। এই সহজ সত্য অবশ্যই সমিতির সম্মানিত সদস্যদের বুঝতে হবে। ছেলেমানুষি করা তাঁদের সাজে না।

এক পোয়া বাঘের দুধ

ছবির জগতের ব্যবস্থাপকদের কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় যন্ত্র করে দেয়া। বাংলাদেশের ছবির ব্যবস্থাপকদের খুব সুনাম। তাঁরা নাকি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। যদি তাঁদের বলা হয় আমার এক পোয়া বাঘের দুধ লাগবে, তাঁরা যথাসময়ে এক পোয়া বাঘের দুধ হাজির করবেন। দুধের সঙ্গে সামান্য পানি হয়ত মেশানো থাকবে তবে দুধটা আসলেই বাঘের। পরিচালক বলবেন, আমার এই জিনিস দরকার আর ব্যবস্থাপক হাত কচলে বলবেন, পারব না স্যার— তা হবে না। ব্যবস্থাপকের ডিকশনারীতে 'না' শব্দটা থাকতে পারবে না।

ঘটনা সত্যি কি-না জানার সুযোগ হল। আমার ছবিতে একজন মানুষ দরকার যার হাতের দু'টি কিংবা তিনটি আঙ্গুল কাটা পড়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা মিলিটারীদের হাতে ধরা পড়ে। শাস্তি হিসেবে 'পেপার কাটার' যন্ত্রে তার আঙ্গুল কাটা হয়। আমার ইচ্ছা ক্লোজ শটে সত্যিকার আঙ্গুল নেই এমন একটা হাত ধরব। আমার ছবির প্রধান ব্যবস্থাপক মিনহাজকে বললাম, মিনহাজ হাতের দু'টি বা তিনটি আঙ্গুল নেই এমন একজনকে জোগাড় করতে পারবে ?

মিনহাজ হাত কচলাতে লাগল। আমি বুঝলাম 'যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়' থিওরী সত্যি নয়।

আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে না পাওয়া গেলে নেই।

মিনহাজ বলল, পাওয়া যাবে স্যার। সপ্তাহখানিক সময় দিতে হবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, দিলাম এক সপ্তাহ সময়।

এক সপ্তাহ পর মিনহাজ সত্যি সত্যি হাতের তিনটি আঙ্গুল লেদ মেশিনে কাটা পড়েছে এমন একজনকে উপস্থিত করল। আমি হতভম্ব হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই গল্প ছবিপাড়ার এক পরিচালকের সঙ্গে করছি— তিনি আমার মত বিস্মিত হলেন না, চোখ মুখ কুঁচকে বললেন— প্রোডাকশনের লোকজন খুব ডেনজারাস প্রকৃতির হয়। কাউকে না পেলে একটা ভাল মানুষকে টাকা পয়সা খাইয়ে তিনটা আঙ্গুল লেদ মেশিনে কাটিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত করত। এদের সম্পর্কে সাবধান।

মিনহাজের কর্মক্ষমতায় আমি মুগ্ধ হলাম। একের পর এক তাকে আমার ফরমায়েশ দিলাম।

১। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বড় ছবি।
২। ইয়াহিয়া খানের ছবি।
৩। পাকিস্তানী টাকা ও মুদ্রা।
৪। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্র, গ্রেনেড..........

মিনহাজ ব্যবস্থা করল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্র, গ্রেনেড, গোলাবারুদ দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রংচটা টিনের স্টেইনগান, কাঠের গ্রেনেড.......

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, এসব কি ?

মিনহাজ বলল, আসল জিনিসতো স্যার পাব না। লং শটে ধরলে বোঝা যাবে না।

'টিনের স্টেইনগান আমি কোন শটেই ধরব না। আমার আসল জিনিস চাই। পারবে আনতে ?

'জ্বি না স্যার।'

আমি বললাম, বাজারে যে একটা কথা প্রচলিত ব্যবস্থাপকদের কাছে যা চাওয়া হয় তাই তারা এনে দেয়, এটা ঠিক না।

'জ্বি না স্যার ঠিক না।'

চিত্রজগতের একটা মীথ মিথ্যা প্রমাণ করে আমার ভালই লাগল। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা আমার কাছে কোন সমস্যা বলে মনে হল না। পুলিশের কাছে সেই সময়কার সব অস্ত্রই আছে। তাদের কাছে চাইলে তারা নিশ্চয়ই দেবে।

আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গুছিয়ে একটি আবেদন করলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুলিশের মহান ভূমিকার কথা বললাম। সরকারী সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে আমার কিছু আসল অস্ত্রশস্ত্র দরকার সেটা বিনয়ের সঙ্গে

জানালাম।
দরখাস্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিজেই দিয়ে এলাম। আমি আবার আরেকটু বুদ্ধি খাটালাম দরখাস্তের উপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ নিয়ে নিলাম।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বললেন, তারা ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে যথাশীঘ্র আমাকে জানাবেন। কিছুদিন পর পর আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাই— আমাকে বলা হয় ফাইল এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে।
'ফাইলের হাঁটাচলা কবে বন্ধ হবে ?'
'সেনসেটিভ বিষয়তো— একটু সময় লাগবে। আপনি সপ্তাহ খানেক পরে আসুন।'
আমার ধৈর্য অসীম আমি গেলাম এক সপ্তাহ পরে। আমাকে বলা হল— ফাইল সেক্রেটারী সাহেবের টেবিলে আছে।
'তাহলে কি ধরে নেব সমস্যার সমাধান হয়েছে ?'
'একটু সময় লাগবে। সেনসেটিভ বিষয়তো।'
'কত দিন পরে আসব বলুন।'
'আপনাকে আসতে হবে না। আমরা উত্তর পাঠিয়ে দেব।'
'আমার অসুবিধা নেই আমি আসব। আপনারা ডেট বলুন।'
'তাহলে এক মাস পরে আসুন।'
আমি কি করব বুঝতে পারলাম না। সেনাবাহিনীর কাছে কি যাব ? পুলিশ বাহিনীরই যখন এই অবস্থা সেনাবাহিনীর না জানি কি অবস্থা। তবু একদিন এপয়েন্টমেন্ট করে গেলাম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরউদ্দিন খান সাহেবের কাছে। তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে বসালেন। আমার আবেদন পত্রটি পড়লেন। তারপর বললেন, আপনি বলুন আপনার কি কি চাই।
আমি বললাম, গোটা দশেক স্টেইনগান।
'দেয়া হল। আর কি ?'
'কিছু গ্রেনেড।'
'দেয়া হল। আর কি ?'
'মিলিটারী কনভয়। মেশিন গান বসানো থাকবে।'
'ঠিক আছে। আর কিছু ?'
'শ দুই সেনাবাহিনীর জোয়ান।'
'আচ্ছা।'
'তাঁবু।'
'ঠিক আছে।'
'একটা ট্যাংক কি দেয়া সম্ভব ?'
'হ্যাঁ সম্ভব তবে ট্যাংক শহরে নিতে পারবেন না। ট্যাংক থাকবে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর।'
'কবে নাগাদ দিতে পারবেন ?'
'আপনি যখন চাইবেন তখনি দেব। কিছু ফর্মালিটিজ আছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুমোদন লাগবে। সেই ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি তা নিয়ে চিন্তা করবেন না।'
আমি তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এত সহজে সব ব্যবস্থা হবে। জেনারেল ভূঁইয়াকে (এম.এস.এ. ভূঁইয়া) দায়িত্ব দেয়া হল আমার সাহায্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে। তিনি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। বেগম খালেদা জিয়ার লিখিত অনুমতি তাঁরাই জোগাড় করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ব্রিগেডিয়ার ইমামুজ্জামান বীর বিক্রম সেনাবাহিনীর সব রকম সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের খন্ডযুদ্ধের বিষয়গুলি কি ভাবে নেয়া হবে তাও তিনি ঠিক করলেন। তাঁর উপস্থিতি এবং পরামর্শ মত সেই দৃশ্যগুলি ধারণ করা হল। ৪৬ সশস্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন।

সেনাবাহিনী নিয়ে প্রথম দিন কাজ করার অভিজ্ঞতাটা বলি। সকাল এগারোটায় এফডিসির গেটে হেভী মেশিনগানে সজ্জিত বিরাট এক কনভয় উপস্থিত। সৈনিকরা সব যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। এফডিসি'র সব গেট

তড়িঘড়ি করে বন্ধ করে দেয়া হল। সামরিক বহরকে ঢুকতে দেয়া হল না। এফডিসি কর্তৃপক্ষ আমাকে বিরাট এক চিঠি পাঠালেন। অস্ত্রসহ এফডিসিতে ঢোকার অনুমোদন নেই। সেই অনুমোদন আসবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে (চিঠির অনুলিপি দেয়া হল)।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন
Bangladesh Film Development Corporation
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮, ফোন : পি,এ,বি,এক্স-৩২৫১৬১-৬৫

সূত্র : এফডিসি/উৎ-২০০৭/৯৪/ ২২৫২ তারিখ : ৭-৬-৯৪ ইং।

মেসার্স নুহাশ চলচ্চিত্র,
১৬/১, মোহনপুর (হলিলেন),
শ্যামলী, ঢাকা।

বিষয়ঃ- "আগুনের পরশমনি" এর সুটিংয়ে সসস্ত্র সেনাবাহিনী কর্মী ও অস্ত্র ব্যবহার প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ে আপনাদের গত ৫-৬-৯৪ ইং তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড় গ্রহণ ব্যতীত অস্ত্রসহ সেনা সদস্যদের এফডিসি'র অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার সম্ভব নয়।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য।

(মোঃ আমিনুল হক)
অতিরিক্ত পরিচালক (উৎপাদন)।

আমার মাথা ঘুরে গেল। আবার সেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চক্কর! আমি এফডিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদের বুঝালাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনে সেনাবাহিনী এসেছে। কেন শুধু শুধু জটিলতা করছেন? তাছাড়া সেনাবাহিনী মাথা গরম টাইপ জিনিস। এদের গেটের বাইরে আটকে রেখেছেন কে জানে ওরা রেগেই যাচ্ছে কি-না।

এফডিসি'র গেট খোলা হল। বিশাল বহর ভেতরে প্রবেশ করল। সে এক দর্শনীয় দৃশ্য। যিনি দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি পদাধিকার বলে একজন মেজর। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

তিনি বললেন, আমার যতক্ষণ ইচ্ছা দলটিকে রাখতে পারি। কাজ শেষ হলে তাঁকে বললেই হবে, তিনি দল নিয়ে চলে যাবেন। সৈনিকদের খাওয়া দাওয়া নিয়েও চিন্তা করতে হবে না। খাওয়া দাওয়া আসবে সেনানিবাস থেকে।

আমি গলার স্বর নিচু করে বললাম, ভাই আপনিতো বেশ সাইজেবল একটা দল নিয়ে এসেছেন। শুটিং এর শেষে চলুন রামপুরা টিভি ভবন দখল করে ফেলি। 'আগুনের পরশমণি' নতুন সরকার গঠন করেছে এমন একটা ঘোষণা দিয়ে ফেলি।

ভদ্রলোক চোখ সরু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের পলক আর পড়ে না। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, রসিকতা করছি। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে রসিকতাতো করা যায়, না-কি তাও করা যায় না?

তিনি শুকনো গলায় বললেন, স্যার এই জাতীয় রসিকতায় আমরা অভ্যস্ত নই।
'আমার সঙ্গে যখন কাজ করছেন ইনশাআল্লাহ অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।'
রসিকতার গল্প যখন উঠল তখন সেনাবাহিনী প্রধান লে· জে· নূরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে যে রসিকতা করেছিলাম সেটাও বলে ফেলি।

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হল। চা খাওয়া হল। বিদায় নিয়ে চলে আসছি হঠাৎ বললাম, আপনাদের কোন পুরানো বা রিকন্ডিশন ট্যাংক আছে?
উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন বলুনতো?
'আমার একটা কেনার ইচ্ছা। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিতে হয়। ট্যাংকে করে গেলে অনেক সুবিধা।'
জেনারেল সাহেব হো হো করে হেসেছিলেন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা রসিকতা বুঝতে পারেন না— এটা বোধ হয় ঠিক না।
আমার ছবিতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয়ও করলেন। তাঁরা কেউই পেশাদার অভিনেতা নন, কিন্তু অভিনয় করলেন পেশাদারদের মতই। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহায়তা না পেলে আগুনের পরশমণি নিয়ে আমি এগুতে পারতাম না। ছবি শেষ হবার পর সেনাবাহিনীর আরো কিছু দৃশ্য নতুন করে নেয়ার প্রয়োজন বাড়ল। আমি আবারো গেলাম সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরউদ্দিন তখন নেই— তাঁর জায়গায় এসেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম। তিনি আরো উৎসাহী। হাসিমুখে বললেন— মুক্তিযুদ্ধের ছবি হচ্ছে এটা আমার জন্যে অত্যন্ত আনন্দের। ছবি শেষ হলে আমাকে দেখাবেন।

'অবশ্যই দেখাব।'

'প্রিমিয়ার শো'তে জেনারেল নাসিম সস্ত্রীক এসেছিলেন। ছবির শেষে বললেন— আবারো যদি আপনি মুক্তিযুদ্ধের ছবি বানান আবারো সেনাবাহিনী আপনার সঙ্গে থাকবে।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের মত ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জানাচ্ছি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

ভাল কথা আমাদের ছবি রিলিজ হয়েছে প্রায় দেড় বছর হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠির জবাব আমি এখনো পাইনি। মনে হয় ফাইল চালাচালি এখনো চলছে। আগুনের পরশমণি মুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি আরেকবার খোঁজ নিয়ে দেখব ফাইল চালাচালি শেষ হয়েছে কি-না। এত তাড়াতাড়ি হবার কথা না— আরো সময় লাগবে, তবু খোঁজ নেব। মানুষ তো আশার উপরই বাঁচে।

লাইট ক্যামেরা একশান এবং...

তারিখটা হল ২৪ এপ্রিল ১৯৯৪।

দিন তারিখ আমার কখনো মনে থাকে না। এই তারিখটা মনে আছে। ২৪ এপ্রিল আমাদের ছবির কাজ শুরু হল। আমি এফডিসির ৪ নং সেটে উপস্থিত হয়েছি। টেনশন জনিত কারণে গত রাতে ঘুম হয়নি। সব প্রস্তুত, তারপরেও টেনশন কমছে না।

ভোরবেলা গুলতেকিনের সঙ্গে ঝগড়া হল। ঝগড়া শুরু হলে বুদ্ধিমান স্বামীরা চুপ করে থাকেন। স্ত্রীর অটোমেটিক সাব মেশিনগান বা রিকয়েললেস রাইফেলের গুলি চুপ চাপ থেকে সামাল দেন। আমি তা করি না। প্রবল উৎসাহে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জয়লাভ করি।

আজ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসেছিলাম। গুলতেকিনের রাগ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কাউন্টার যুক্তি আমি হয়ত বের করতে পারতাম। সেই সব যুক্তি তেমন জোড়ালো হত না, তবে আমি জোড়ালো যুক্তিও সুন্দর করে দিতে পারি। আজ মন খারাপ করে গুলতেকিনের যুক্তি হজম করলাম।

গুলতেকিন বলল, তুমি যখন পিএইচডি করছিলে তখন আমি কি করেছি ? নিজের পড়াশোনা বাদ দিয়ে তোমার পড়াশোনা যাতে ঠিকমত হয় সেদিকে লক্ষ্য করেছি। তখন তুমি কথা দিয়েছিলে— আমি যখন পড়াশোনা শুরু করব তখন তুমি আমার পড়াশোনায় সাহায্য করবে। আমি পড়াশোনা শুরু করেছি। আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। বাচ্চাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি। এর মধ্যে বাজার করতে হয়, মেহমানদারী করতে হয়, পরীক্ষার পড়া করতে হয়। কোথায় গেল তোমার প্রতিজ্ঞা ? তুমি শুরু করলে তোমার ছবি। এই ছবি বানানোর কাজটা কি আর কিছুদিন পড়ে করলে হত না ? অবশ্যই হত। তুমি করবে না। কারণ তোমার কাছে, আমি বা আমার সংসার কিছু না। তোমার জগত, তোমার কাজকর্ম ঘিরে। এর বাইরে কোনদিন কিছু ছিল না, হবেও না। আজ তোমার ছবির মহরত। খুব আনন্দের কথা। তুমি তোমার এক জীবনে যা করতে চেয়েছ করতে পেরেছ। আমি জানি ছবিটাও তুমি ভাল বানাবে। সেই ছবি অনেকগুলি জাতীয় পুরস্কার পাবে। তুমি জেনে রাখ সেই পুরস্কারের সঙ্গে আমার কোন যোগ নাই। আজ তোমার মহরত অনুষ্ঠানে আমি যাব না। দয়া করে আমাকে সেটে নেবার চেষ্টা করবে না।

আমি ক্ষীণ গলায় কয়েকবার অনুরোধ করলাম। সে মুখ কঠিন করে বসে রইল। আমি বললাম, অবশ্যই আমার উচিত তোমার পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে ছবি বানানোর কাজটি পিছিয়ে দেয়া। সেটা পারছি না কারণ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে— ছ'মাসের মধ্যে ছবি বানিয়ে দিতে হবে। আমার পক্ষে চুক্তি ভঙ্গ সম্ভব না। (আসলে খুবই সম্ভব। জোড়ালো কারণ দেখিয়ে চিঠি দিলেই ছবি শেষ করার সময়সীমা সরকার বাড়িয়ে দেবেন। আসলে আমার পক্ষেই ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব হচ্ছিল না)

মহরত অনুষ্ঠানে যেহেতু গুলতেকিন এল না সেহেতু আমার কন্যারাও এল না। এরা অসম্ভব মাতৃভক্ত। সব সময় মা'র পক্ষে। শুধু আমার মেজো কন্যা শীলা এসেছে। তার না এসে উপায় নেই। সে এই ছবিতে অভিনয় করছে।

আমার মন খুব খারাপ-ছবি বানানোর এই বিপুল কর্মকান্ডে আমার স্ত্রী পাশে থাকবে না এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। আমি হাসি খুশী থাকার অভিনয় করছি। সেই অভিনয় খুব ভাল হচ্ছে। সবাই ভাবছে আমি প্রাণশক্তিতে ঝলমল করছি।

প্রথম শট হিসেবে খুব সহজ একটা শট নেয়া হয়েছে। মতিন সাহেব বারান্দায় বসে ট্রানজিস্টারে বিবিসি শুনছেন। তাঁর মাথার উপরে পাখির খাঁচা ঝুলছে। খাঁচার তিনটা টিয়া পাখি। তিনি বিবিসি ধরতে পেরেছেন— তবে স্ট্যাটিকের কারণে স্পষ্ট শুনতে পারছেন না। মাথার উপরে ঝুলন্ত খাঁচায় টিয়া পাখিগুলি খুব বিরক্ত করছে। তিনি বিরক্ত ভঙ্গিতে পাখির খাঁচার দিকে তাকিয়ে 'আহ্' বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

মিড লং শটে মতিন সাহেবকে ধরা হবে। ফ্রন্টাল শট না, প্রফাইল শট। শটের শুরুতে পাখির খাঁচা দেখা

মতিনউদ্দিন সাহেবের একমাত্র কাজ রেডিওতে খবর শোনা। স্বাধীন বাংলা বেতার, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিও পিকিং। তাঁকে সারাক্ষণই দেখা যায় রেডিওর নব ঘোরাচ্ছেন। এই কাজটাও তিনি শান্তিমত করতে পারেন না। ছোট মেয়ে অপালা তাকে খুব বিরক্ত করে।

যাবে না তবে তাঁর মুখে খাঁচার ছায়া পড়বে। পাখিগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি যখন 'আহ্' বলবেন তখন ক্যামেরা খানিকটা উপরে উঠে তাঁকে সহ ধরবে।

আমরা ব্যবহার করছি জার্মানীর বিখ্যাত এরিফ্লেক্স ক্যামেরা মডেল থ্রি সি। এফডিসিতে দু'টা মডেল আছে টু সি এবং থ্রি সি। দু'টোতেই ভেরিয়েবল মোটর অর্থাৎ ইচ্ছে করলে ক্যামেরায় সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেমের জায়গায় বেশী ফ্রেম বা কম ফ্রেম শুট করা যায়। থ্রি সির আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইচ্ছে করলে সাধারণ ক্যামেরার মত সিঙ্গেল ফ্রেমও শুট করা যায়। এই ক্যামেরায় মোটরের স্পীডও অনেক বেশী তোলা যায়।

আমি ক্যামেরাম্যান আখতার সাহেবের দিকে তাকালাম তাঁকে কেমন জানি নার্ভাস লাগছিল। তিনি খুব ঘামছেন। এই ঘাম গরমের কারণেও হতে পারে। আবার টেনশন জনিত কারণেও হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে টেনশন জনিত ঘাম। সেট ভর্তি মানুষ। প্রচুর সাংবাদিক আছেন। সাংবাদিক ছাড়াও আমার বন্ধু-বান্ধবরা সবাই এসেছেন। প্রকাশকরা এসেছেন। ছবি পাড়ার অনেকেই এসেছেন মজা দেখতে। আনাড়ি এক পরিচালক ছবি করতে গিয়ে হাস্যকর কান্ড কি করে তা দেখার ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক।

ক্যামেরাম্যান আখতার সাহেব তার ক্যামেরায় কদমবুসি করলেন। ক্যামেরা যে স্ট্যান্ডের উপরে দাঁড়ানো সেই স্ট্যান্ডটা যেন পা। আখতার সাহেব পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। আখতার সাহেবের পর তাঁর দুই সহকারী সালাম করলেন। আখতার সাহেব আমাকে আহ্বান করলেন 'লুক থ্রু' করতে।

লুক থ্রু মানে তিনি সব প্রস্তুত করেছেন। ক্যামেরা শট নেবার জন্যে প্রস্তুত। তখন আমি লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে শট যেটা নেয়া হবে সেটা দেখব।

সেট করেছেন শিল্পী এস. এ. কিউ. মাইনউদ্দিন। নিখুঁত সেট। মাইনউদ্দিন সাহেব আমার বন্ধু মানুষ। তিনি এর আগে রাজেন তরফদারের পালঙ্ক ছবির সেটও করেছিলেন। টানা বারান্দাটা সুন্দর এসেছে।

লাইটিং এমনভাবে করা হয়েছে যে চাঁদের আলোর খানিকটা এসে পড়েছে মতিন সাহেবের গায়ে। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে আসছে ইলেকট্রিক বাল্বের আলো। চাঁদের আলো বানানো হয়েছে শক্তিশালী হ্যালোজেন

বাল্ব (ডে লাইট) দিয়ে।

আমি বিসমিল্লাহ বলে ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালাম। প্রথম কয়েক সেকেন্ড কিছুই দেখতে পেলাম না। ব্যাপারটা মনে হয় প্রাথমিক উত্তেজনার কারণে হল। হ্যাঁ দেখা গেল— ঐতো মতিন সাহেব বসে আছেন। তাঁর মুখে খাঁচার ছায়া পড়েছে। আমার কাছে মনে হল সব ঠিক আছে। শটের শেষ অংশটি দেখার ইচ্ছা ছিল যেখানে পাখি সহ মতিন সাহেব এবং পাখির খাঁচা এক সঙ্গে ধরা হবে। শেষ অংশ দেখার ইচ্ছার কথাটা প্রকাশ করলাম না। লজ্জা লাগল।

আখতার সাহেব বললেন, হুমায়ূন ভাই সব ঠিক আছে ?
আমি বললাম, হ্যাঁ।
'এখন শুরু করব ?'
আমি লজ্জা ভেঙ্গে বললাম, শটের শেষ অংশের কম্পোজিশন একটু দেখব।
আখতার সাহেব তাও দেখালেন। পাখির খাঁচা যে ভাবে হুট করে বের হয়ে আসছে সেটা আমার পছন্দ হল না। মনে হল যেন জোড় করে দর্শকদের পাখির খাঁচা দেখাচ্ছি। আর কিভাবে কম্পোজিশন সাজানো যায় তা আমার মাথায় এল না। তাছাড়া দেরী হয়ে যাচ্ছে। সবাই প্রথম শট নেয়া দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে এখন কতগুলি কমান্ডের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আমি পর্যায়ক্রমে বলব,

(১) লাইট (বলার সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সব আলো জ্বেলে দেয়া হবে। সেটের আলো সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা যায় না।
(২) ক্যামেরা (ক্যামেরা মোটর চালু হবে। স্পীড উঠবে সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেম পার হবে)
(৩) একশান (অভিনয় পর্ব শুরু হবে)
(৪) কাট (ক্যামেরা বন্ধ হবে। দরবারের বাতি যাবে নিভে)

আমি লাইট-ক্যামেরা-একশান বললাম দৃশ্য ধারণ শুরু হল এবং শেষ হল। সমস্যা একটা দেখা দিল আমি কাট বলতে ভুলে গেলাম। ক্যামেরা চলতেই থাকল। এক সময়ে আখতার সাহেব খুবই ইতস্ততঃ করে
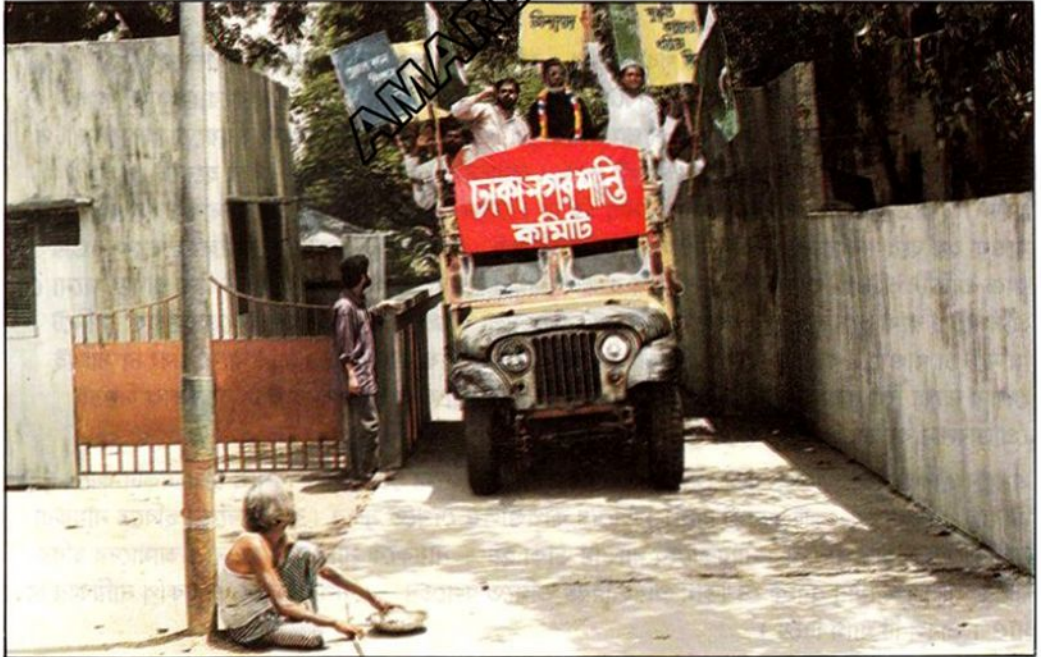
ঢাকা নগর শান্তি কমিটির ট্রাক মিছিল। ট্রাক মিছিলের নেতৃত্ব যিনি দিচ্ছেন তাঁকে কি আমাদের দেশের পরিচিত বিতর্কিত কারো মত দেখাচ্ছে ?

বললেন, হুমায়ূন ভাই ক্যামেরা বন্ধ করব না ? ক্যামেরা কিন্তু চলছে।
আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, চলছে কেন ? দৃশ্যটা নেয়া হয়ে গেছে।
'আপনি না বলা পর্যন্ত তো আমি ক্যামেরা বন্ধ করব না।'
'বললামতো'।

এভাবে বললে হবে না— বলুন 'কাট'।
আমার দামী নেগেটিভ হুড় হুড় করে এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে। মিনিটে নব্বুই ফিট। এর মধ্যে নিশ্চয়ই ১৮০ ফুট এক্সপোজড হয়ে গেল।
আমি চিৎকার করে বললাম 'কাট'।
পরদিন দৈনিক বাংলা শেষের পাতায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। সাংবাদিক হাসান হাফিজ সাহেব লিখলেন-নবীন পরিচালক কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ, 'কাট' বলতে ভুলে গেছেন।

আমি আমার আনাড়িপনা কাটিয়ে উঠার জন্যে কিছু ব্যবস্থা নিলাম তার মধ্যে একটা হল আবারো 'কাট' বলতে ভুলে গেলে পিঠে খোঁচা দেবার ব্যবস্থা। এই সঙ্গে আরেকটা নতুন ব্যাপারও করলাম— নতুন ব্যবস্থাটা নিয়ে শুরুতে সবাই হাসাহাসি করলেও শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন— ব্যবস্থাটা অতি চমৎকার।
ব্যবস্থাটা হল প্রতিটি শট ভিডিওতে তুলে রাখা। আমাদের ভিডিও ক্যামেরা আছে। শটগুলি ভিডিওতে ধরে রাখা কোন ব্যাপার নয়। ভিডিও চালিয়ে যে কোন সময় আমরা শটগুলি দেখতে পারি। ভুল কি করা হল তা টের করতে পারি। তেমন ভুল ধরা পড়লে রিশুট করে ভুল শুধরাতে পারি। বড় বড় কিছু ভুল এইভাবে ভিডিও দেখে আমি ঠিকও করলাম— একটা উদাহরণ দেই।

মতিন সাহেবের উঠোনে ফুলের টবে বেশ কিছু গাছ। ভিডিও শটে দেখা গেল টবের সবগুলি গাছের পাতা স্থির। শুধু একটির পাতা বাতাসে কাঁপছে। ভালভাবেই কাঁপছে। এরকম হল কেন ? কারণ খুব সহজ, সেটে অনেক ওয়ার্কিং ফ্যান থাকে। একশানের আরো আগে সব ফ্যান বন্ধ করে দেয়া হয়। ভুলে একটি ফ্যান বন্ধ হয়নি— তার হাওয়া এসে পড়েছে একটা ফুল গাছে— সেটি কাঁপছে। অন্যগুলি কাঁপছে না।

দৃশ্যটি আমরা আবার রিশুট করলাম।
কন্টিনিউটি ব্রেক ধরার জন্যে ভিডিও খুব কাজের। কন্টিনিউটি ব্রেক বলতে বুঝাচ্ছি পোশাকের হের-ফের। নায়িকা বারান্দায় কথা বলছে তার কপালে টিপ, মাথার চুলে বেণী করা। কথা শেষ করে সে ঘরে গেল সেখানে কপালে টিপ ঠিকই আছে শুধু মাথায় সমস্ত চুল পিঠে ঢেউ খেলছে। আবার হয়তো কপালের টিপ, মাথার চুল সবই ঠিক আছে শুধু শাড়ি পাল্টে গেছে। বারান্দায় ছিল নীল শাড়ি— ঘরে হয়েছে গোলাপী শাড়ি। ছবিতে সব দৃশ্য একের পর এক নেয়া হয় না। জোন হিসেবে কাজ হয়। বারান্দায় সব দৃশ্য শেষ করে যাওয়া হয় ঘরে। কাজেই কন্টিনিউটি সমস্যা থেকেই যায়। কন্টিনিউটি দেখার জন্যে লোক থাকে। তার কাজ প্রতিটি খুঁটিনাটি জবেদা খাতায় লিখে রাখা। আমার ভিডিও ব্যবহারে কন্টিনিউটি ঠিক রাখার জন্যে যে এসিসটেন্ট রাখা হয়েছিল তার কাজ কমে গেল। তার মূল্য কাজ হয়ে গেল সিগারেট ফোকা এবং মিনিটে মিনিটে চা খাওয়া। বলতে ভুলে গেছি 'চা' ছবির প্রধান কিছু বিষয়ের একটি। চা বানানো এবং চা সাপ্লাই দেয়ার জন্যে কিছু লোক থাকে। বিরাট কেতলীতে ক্রমাগত চা জ্বাল হতে থাকে। চা বলে হাঁক দিতেই প্রোডাকশন বয় চায়ের কাপ হাতে ছুটে আসে।

এখানেও কিছু মজা আছে— ডিরেক্টর সাহেব এবং নায়িকার জন্যে তৈরী হয় স্পেশাল চা। একটা কাপে দু'টা টি ব্যাগ। (অন্যদের একটি করে টি ব্যাগ)। তাঁদের কাপগুলিও দেখতে সুন্দর। বাংলাদেশের ছবিতে নায়করা নায়িকাদের সম্মান পান না। নায়িকাদের ম্যাডাম ডাকা হয়— নায়ককে স্যার বলা হয় না। আমাদের ছবির নায়ক আসাদুজ্জামান নূরকে দেখতাম প্রায়ই বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বলতেন— দেখি আমাকে এক কাপ নায়িকার চা দাও। ডাবল টি ব্যাগ দিয়ে।

খাবার বেলাতেও একই অবস্থা— সবার জন্যে সাধারণ চালের ব্যবস্থা— শুধু ডিরেক্টর সাহেব এবং নায়িকার

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার দীর্ঘ রজনী। পরিবারের সদস্যরা সবাই এক খাটে আড়াআড়ি হয়ে শোয়। সামান্য শব্দেই চমকে চমকে উঠে। আতংকে চোখে ঘুম আসেনা।

জন্যে পোলাওর চালের ভাত। বিশাল ডেকচিতে [illegible] ভাত আসছে আর ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ারে নায়িকা এবং ডিরেক্টর সাহেবের জন্যে সুগন্ধি পোলাওর চালের ভাত আসছে। পুরো ব্যাপারটি হাস্যকর।

এরচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হল ডিরেক্টর সাহেবের জন্যে আছে স্পেশাল চেয়ার। এই চেয়ারে ডিরেক্টর সাহেব ছাড়া কেউ বসতে পারবে না। চেয়ারের পাশে একজন এসিসটেন্ট দাঁড়িয়ে থাকে যার প্রধান কাজ ডিরেক্টর সাহেব যেখানে যাবেন তাঁর পেছনে পেছনে চেয়ার নিয়ে যাওয়া।

এফডিসিতে কিছু পরিচালক আছেন যারা তাদের চেয়ারে বড় বড় করে লিখে রেখেছেন 'ডিরেক্টর'। যাতে চেয়ার দেখেই যে কেউ বুঝতে পারে— এই চেয়ারে বসা দূরের কথা হাত পর্যন্ত দেয়া যাবে না।

আমার স্বভাব হচ্ছে যে কোন সুবিধাজনক জায়গায় পা গুটিয়ে বসে পড়া— মেঝে হলে ভাল হয়। মেঝেতেই পা গুটিয়ে আরাম করে বসা যায়। কাজেই ডিরেক্টর সাহেবের চেয়ারের কনসেপ্ট বাতিল হয়ে গেল।

অন্যরা সাধারণ চালের ভাত খাবে আমি পোলাওয়ের চাল খাব এই হাস্যকর ব্যাপারও বন্ধ করে দিলাম— সবার জন্যে এক ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র। একই চাল, শুধু চায়ের ব্যাপারটা বহাল রাখলাম। সুন্দর একটা কাপে ডাবল টি ব্যাগে চা' এই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা গেল না।

প্রসঙ্গক্রমে এফডিসির খাওয়ার কথাটা বলি। ছবি পাড়ায় যে খাওয়া দেয়া হয় সে খাওয়া বাংলাদেশের সবচে সস্তা এবং সম্ভবত সবচে স্বাদু। মাত্র তিরিশ টাকা প্লেটে যে মেনুতে খাবার দেয়া হয় তা নিম্নরূপ ঃ

ভাত (চিকন চাল)
সব্জি (তিন রকমের)
ভর্তা (চার পদের, মাছের ভর্তা দিয়ে শুরু)
শুটকি
ছোট মাছ

বড় মাছ
চিংড়ি ভুনা (শুধুমাত্র ডিরেক্টর সাহেব এবং তার পেয়ারের লোকজনের জন্যে যেমন নায়িকা, নায়িকার বান্ধবী…)
মুরগী
গরুর গোশত
খাসি ভুনা (শুধুমাত্র ডিরেক্টর সাহেব এবং তার পেয়ারের লোকজনের জন্যে)
ডাল (শুকনা)
ডাল (তরল)

মাত্র তিরিশ টাকায় এই খাবার কি করে দেয়া হয় আমি জানি না। যেই শুনে সেই আঁৎকে উঠে বলে অসম্ভব। শুধু ছবি পাড়ার লোকজন জানে আমি কোন গল্প বানাচ্ছি না। সত্যি কথা বলছি।

খাবারগুলি সুস্বাদু। সবাই গপ গপ করে খায়। বাংলাদেশের ছবির নায়িকারা যে এত মোটা তার কারণ বোধ হয় এফডিসির খাওয়া। কোন চিকন নায়িকা একটা ছবি করতে করতে (ইনশাল্লাহ) ফুলে ফেঁপে গোলআলু হয়ে যান শুধুমাত্র দ্রব্যগুণে।

আমি নিজে এফডিসির খাবার খুব পছন্দ করে খেতাম— একদিন গোশত দিয়ে ভাত মাখছি। হঠাৎ দেখি ছোট ছোট পা দেখা যাচ্ছে। গোশত-চিংড়ি মাছ না। গোশতের পা গজাবার কোন কারণ নেই। আমি কৌতূহলী হয়ে গোশতের টুকরা উল্টালাম— দেখা গেল গোশতের টুকরার নিচে একটা মৃত তেলাপোকা। আমি হতভম্ব হয়ে আমার পাশে বসা আসাদুজ্জামান নূরকে তেলাপোকাটা দেখালাম। তিনি তখন মহানন্দে মাংসের হাড় চিবুচ্ছেন। নূর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তেলাপোকা ফেলে দিয়ে ভাত খান। গণ-রান্নায় পোকা মাকড় থাকে— এতে রান্নার স্বাদ ভাল হয়।

সেদিন ছিল আমার ছবি পাড়ার খাওয়া খাবার শেষ দিন। আমি দিনের পর দিন কলা—বিসকিট এবং চা

শুটিং-এর আসরে চলে ম্যারাথন আড্ডা। সেটে সময় কাটানোর নানান ব্যবস্থা। 'নুহাশ চলচ্চিত্রে'র পোষা হস্তরেখা বিশারদ হাত দেখে দেন। পোষা গায়ক গায়িকারা গান করেন। পোষা ম্যাজিশিয়ান এসে ম্যাজিক দেখিয়ে যান। হায়াত সাহেবের হাত দেখা হচ্ছে— হাত দেখছেন হস্তরেখা বিশারদ মানিক।

মা সেলাই মেশিন চালাচ্ছে— জীবন বয়ে চলছে। জানালার শিকের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে মা ও কন্যাকে। জানালার শিকগুলো যেন জেলের লৌহ গরাদ।

খেয়ে ছবির কাজ করেছি। আলসার হবার কথা ছিল। জানি, আমার মন দুর্বল হলেও শরীরের যন্ত্রপাতি অতি মজবুত।

আমার খুব আশা ছিল শুটিং যতই অগ্রসর হবে আমার ভেতর আস্থা ভাব ততই বাড়বে। দেখলাম তা হচ্ছে না শুটিং যত এগুচ্ছে আমার আস্থাভাব ততই কমছে। পুরো ব্যাপারটা নিজের দখলে আমি আনতে পারছি না।
ক্যামেরায় 'লুক থ্রু করে যা দেখি বড় পর্দায় তা কেমন আসবে বুঝতে পারি না। আমি যখন বলি— আলো এত বেশী কেন?
ক্যামেরাম্যান বলেন, বিগ স্ক্রীনে ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে ক্যামেরাম্যানের কথাই বিশ্বাস করতে হয়। অনভিজ্ঞতা আমাকে পদে পদে ধাক্কা দেয়।
প্রথম দু'দিনের শুটিং রাশ দেখলাম। দেখে মনে হল ঠিকইতো আছে।
একদিন পর আবার সেই রাশ দেখলাম— মনে হল কিছু কিছু গন্ডগোল আছে।
দু'দিন পর আবার দেখলাম তখন মনে হল কিছুই ঠিক নেই। আমার সমস্যা হল আমি বুঝাতে পারছিলাম না— কেন আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছু ঠিক নেই। বুঝাতে পারলে সেই ত্রুটি ঠিক করা যায়। বুঝাতে না পারলে ত্রুটি ঠিক করব কিভাবে?
আমার সিক্সথ সেন্স বলছে— 'ঠিক হচ্ছে না।' কেন সিক্সথ সেন্সের কাছে ঠিক বলে মনে হচ্ছে না তা সে আমাকেও জানাচ্ছে না— আমি করি কি?
আমি কিছু কিছু পরীক্ষা—নিরীক্ষাও করতে চাচ্ছি— যেমন Wide angle lense এ close শট নিলে কি হয়? পরীক্ষা-নিরীক্ষার তেমন সুযোগও পাচ্ছি না।
ক্যামেরা পজিশন ঠিক রেখে একই দৃশ্যে নানান ধরনের লেন্স ব্যবহার করে যদি ধারণ করি এফেক্টটা কেমন হবে?

এই পরীক্ষাটা করলাম— একটা 'শট খুব কম করে হলেও একুশবার নেয়া হল। শটটা এ রকম— ছোট্ট অপালা তার কড়ে আঙুলে কনে বউ এর ছবি এঁকেছে। লাল রুমালের সেই কনেকে ঢেকেছে। মনে হচ্ছে ছোট্ট বউ ঘোমটা দিয়েছে। আঙুল নাড়ালেই মনে হয় **লাল শাড়ি পরা বউটি বুঝি মাথা নাড়াচ্ছে।**

দৃশ্যটি সব রকম লেন্সে নেয়া হল। রাশ দেখলাম— রাশ দেখে মাথা ঘুরে যাবার মত অবস্থা, একি কান্ড। লেন্স বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটিও বদলে যাচ্ছে। আমার মনে হল— ছবি বানানোর প্রথম শর্ত হল— লেন্স সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। যা আমার নেই। আমার ভেতর এক ধরনের হতাশা তৈরী হল। যে হতাশা ছবি বানানো শেষ হবার পরেও কাটেনি। মনে হয় না, কোনদিন কাটবে।

ছবির আরেকটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকল না, "ইন-আউট" সমস্যা। আমাদের সহজ বুদ্ধি বলে আমরা যে দিক দিয়ে ঢুকব, সেদিক দিয়েই বেরুব। ছবির ভাষা ভিন্ন। ডানে ঢুকলে বামে বেরুতে হবে। আবার খেয়াল রাখতে হবে এক্সিস ক্রস করল কিনা। এক্সিস ক্রস করলে অন্য ব্যবস্থা। আমি কাগজ কলম নিয়ে— এক্সপার্টদের সঙ্গে বসে এই সমস্যাটা ধরার চেষ্টা করলাম— পারলাম না। হাল ছেড়ে দিয়ে বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে বললাম— তারা চৌধুরীকে, সে দেখবে ইন-আউট গঠিত জটিলতা যেন না দেখা দেয়।

সামান্য ইন-আউট বুঝতে পারছিনা, অথচ পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি বানাতে বসে গেছি এই নিয়ে আমার মধ্যে হীনমন্যতা কাজ করছিল। নিজের বুদ্ধি এবং কর্ম ক্ষমতার উপর যার প্রচুর আস্থা সে যদি হঠাৎ টের পায় তার বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা সে যতটা ভাবছে ততটা না তখন সে মুষড়ে পড়ে এবং শামুকের মত গুটিয়ে যায়। আমার তাই হল আমি গুটিয়ে গেলাম।

ইন-আউট বুঝতে না পারা জনিত হীনমন্যতা এখন আমার নেই। তার মানে এই না যে বর্তমানে আমি ইন-আউট কি তা বুঝি। আগে যেমন বুঝতাম না, এখনো বুঝি না। তারপরে হীনমন্যতা কেটেছে সত্যজিৎ রায়ের লেখা— পথের পাঁচালি গল্প পড়ে। তিনি লিখেছেন—

> "প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য তখনও মাঝে মধ্যে একটা-দু'টো ভুল হচ্ছিল আমার। (কোনও শটে যদি কাউকে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়, তো পরের শটে তাকে ঢুকতে হবে বাঁ দিক দিয়ে, এই ধরনের সব ব্যাপার আর কী) তবে [illegible] রায় চটপট সেগুলো ধরিয়ে দিচ্ছিল।"
>
> **সত্যজিৎ রায়** (অপুর পাঁচালি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)

সত্যজিৎ রায়ের মত মানুষের যদি এই সমস্যা হতে পারে আমার মত অভাজনেরও হতে পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আগুনের পরশমণির সেট একটা আড্ডাখানা হয়ে দাঁড়াল। কবি, গল্পকার, সাংবাদিকরা সব সময় আসছেন। মতিন উদ্দিন সাহেবের বাড়ির উঠোনে গোল করে চেয়ার টেবিল পেতে আড্ডা চলছে। চা আসছে, সিগারেট পুড়ছে। হো হো, হা হা হাসি। রীতিমত উৎসব। ছবি পাড়ার লোকজনও আসছেন। তারা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে কাজের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছেন। একটা বিষয় আমার খুব মনে ধরল— ছবি পাড়ার সবাই বললেন— আপনার যখন যে সাহায্য দরকার আপনি বলবেন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি।
আমার বলতে ভাল লাগছে যে তাঁদের সব রকম সাহায্য সহযোগিতা আমি পেয়েছি।
ছবির শুটিং এর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে প্রবল উত্তেজনার কারণে মোজাম্মেল সাহেব (ছবির প্রধান ব্যবস্থাপক ছবি বানানোর পুরো সময়টায় তাঁর উত্তেজনা ছিল দেখার মত) ফ্লোরে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে ধরাধরি করে তোলা হল। দেখা গেল তাঁর চশমার ডানদিকের কাঁচ ভেঙ্গে গুড়াগুড়া হয়ে গেছে। চারদিকে আনন্দের বান ডেকে গেল। ছবির সঙ্গে সম্পর্কিত সবাই চেঁচাতে লাগল— চশমা ভেঙ্গেছে, চশমা ভেঙ্গেছে।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। চশমা ভাঙ্গা দুঃখজনক ব্যাপার। সবাই আনন্দে লাফাচ্ছে কেন ? সবচে বেশী আনন্দ আমাদের ক্যামেরাম্যানের। তিনি ক্যামেরা ফেলে ছুটে এসে মোজাম্মেল সাহেবের হাত থেকে ভাঙ্গা চশমা কেড়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলে সে চশমার উপর লাফাতে লাগলেন। প্রোডাকশন ম্যানেজার ছুটে গেল মিষ্টি আনতে।

ব্যাপারটা হচ্ছে ছবি পাড়ায় প্রচলিত বিশ্বাস শুটিং চলাকালীন সময়ে চশমা ভাঙ্গা মানে ছবি সুপার-ডুপার হিট।

মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছে। তাকে মিলিটারীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমিতে।

সবাই নাকি তীর্থের কাকের মত বসে থাকে যদি চশমা ভাঙে। অনেকে চশমা চোখে না পরে বুক পকেটে রেখে দেয় যেন হঠাৎ নিচু হলে চশমা পকেট থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। তারপরেও চশমা ভাঙ্গে না। আমাদের উপর আল্লাহ পাকের অসীম করুণার কারণেই চশমা ভেঙ্গেছে।

মিষ্টি চলে এল, মিষ্টি খাওয়া হল। ছবি হিটের বিষয় নিয়ে নানান আলোচনা চলতে লাগল। আমি আরেকটি তথ্য জানলাম— ছবিতে সাপ থাকলেই ছবি সুপার-ডুপার হিট। আমার এক প্রোডাকশন ম্যানেজার নীচু গলায় আমাকে বলল— স্যার, কোন একটা সীনে একটা সাপ দেখিয়ে দেন।

আমি বললাম, কি ভাবে দেখাব ?

'বদি যে ঘরে ঘুমায় সেই ঘরের খাটের নিচে এক সাপ। সাপটাকে ধরা হবে। সাপ ফ্রেম আউট হবে। এই কাজটা স্যার ছবির স্বার্থে করেন।'

আমি তাকে বললাম, সাপ দিয়ে আমি ছবি হিট করাতে চাই না। সাপের চিন্তা বাদ দাও। চশমা ভাঙ্গা নিয়েই আমরা বরং সন্তুষ্ট থাকি।

সাপের চিন্তা আমি বাদ দিলেও সাপ আমাকে ছাড়ল না। একদিনের কথা বিকেলের শিফটে শুটিং। দেরী করে ঘুম থেকে উঠেছি। নাস্তা খেতে বসতে বসতে এগারোটা। শুনলাম সকাল সাতটা থেকে এক সাপুড়ে আমার জন্যে বসে আছে। তার নাকি খুবই জরুরী দরকার।

নাস্তা না খেয়েই সাপুড়ে বিদায় করতে গেলাম। আমার সঙ্গে সাপুড়ের কি দরকার তখনো বুঝতে পারছি না। মধ্য বয়স্ক হাসি খুশি টাইপের এক লোক। ভদ্র পোশাক আষাক। সাপুড়ে বলে মনে হয় না-মনে হয় স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক।

'আমার সঙ্গে কি ব্যাপার ?'

'স্যার আপনি ছবি বানাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ তা বানাচ্ছি।'

'ছবির জন্যে সাপ লাগবে না স্যার। আমি সাপ সাপ্লাই দেই। সব রকমের সাপ আপনি আমার কাছে পাবেন। স্যাম্পল নিয়ে এসেছি স্যার দেখেন।'
'এই ছবিতে সাপ লাগবে না। দেখি পরের ছবিতে যদি লাগে।'
'ছবি হিট করার জন্যে একটা দু'টা সাপ রাখবেন না ?'
'জ্বি না। আপনি কষ্ট করে এসেছেন ধন্যবাদ। পরে যদি আরো ছবি বানাই আপনাকে খবর দেব। আজ চলে যান।'
সাপুড়ে তারপরেও যায় না। কেমন যেন উসখুস করে। আমি বললাম, আপনি কি আর কিছু বলবেন ?
সাপুড়ে কয়েক দফা বিচিত্র ভঙ্গিতে কেশে বলল, স্যার আমার কাছে অল্পবয়েসী খুবই সুন্দর 'বাইদ্যানি'ও আছে। যদি দরকার হয়।
আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, অল্প বয়স্ক খুবই সুন্দর 'বাইদ্যানি', দিয়ে আমি কি করব ?
আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বলল, একদিন স্যার নিয়ে আসি আপনি নিজের চোখে দেখেন। দেখলে আপনার পছন্দ হবে। গ্যারান্টি।
'নারে ভাই আমার বাইদ্যানি লাগবে না। লাগলে বলব।'
সাপুড়ে বিমর্ষ মুখে চলে গেল। পুরোপুরি চলেও গেল না। সাপ খোপ নিয়ে প্রায়ই সে আসে। আমার বাচ্চাদের সাপের খেলা দেখায়। আমি আতংকগ্রস্ত থাকি কোনদিন না জানি সে 'বাইদ্যানি' নিয়ে উপস্থিত হয়।

ছবির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। চশমা ভাঙ্গা এপিসোডের পর আমরা যখন বিপুল উৎসাহে কাজ করছি তখন হঠাৎ একদিন বিকট শব্দে আমাদের সেটের এক অংশ ভেঙ্গে পড়ে গেল। ভয়াবহ অবস্থা। যে অংশটা ভেঙ্গে পড়েছে সেই অংশে কেউ থাকলে অবশ্যই মারা পড়ত। ভাগ্যিস কেউ ছিল না। সেট ভেঙ্গে পড়েছে এই নিয়েও উৎসাহ ও উত্তেজনা তৈরি হল— জানা গেল সেট ভাঙ্গাও খুব সুলক্ষণ— ছবি বাম্পার ব্যবসা করবে।
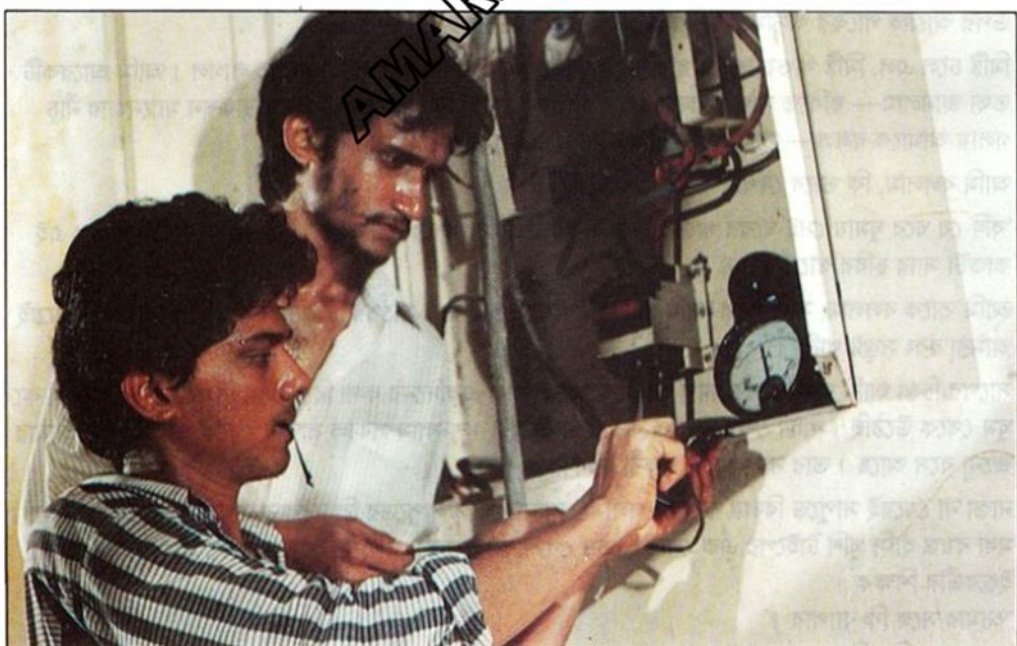
দুই মুক্তিযোদ্ধা ইলেকট্রিক সাপ্লাই সাব-স্টেশনে টাইমবোমা সেট করছে।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই সাব-স্টেশনের মডেল। এই মডেলটি উড়িয়ে দেয়া হয়।

প্রোডাকশন ম্যানেজার আবার ছুটে গেল মিষ্টি কিনতে।

আমি বিমর্ষ মুখে বসে রইলাম। সেট ঠিক করতে হবে। লাইট ভেঙ্গেছে তার ক্ষতিপূরণ লাগবে। খরচের চক্করে পড়ে গেছি। ছবি পাড়ার সবচে বড় চক্কর হচ্ছে খরচের চক্কর। এই চক্কর থেকে মুক্তির উপায় নেই। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে খরচের চক্করের ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মনে করা যাক আমার একটা সুঁচ দরকার। প্রোডাকশনের লোককে ডেকে বললাম একটা সুঁচ নিয়ে আসো, সে কিছুক্ষণের মধ্যে সুঁচ নিয়ে এসে বিল করবে। বিলের নমুনা।

বিল

তারিখ ২৪·৪·৯৪

একটি সুঁচ	১ টাকা
যাওয়া বাবদ বেবী টেক্সি ভাড়া	২৫ "
ফেরা বাবদ বেবী টেক্সি ভাড়া	৩০ "

সর্বমোট : ৬৬ টাকা

বিল যে দোকান থেকে সুঁচ কেনা হয়েছে সেই দোকানের ক্যাশমেমো থাকবে। দোকানদারের দস্তখত থাকবে। যে দুই বেবীটেক্সিওয়ালা তাকে নিয়ে গেল এবং ফিরিয়ে নিয়ে এল তাদের দস্তখতও থাকবে। খুবই পাকা কাজ।

এই জাতীয় চক্করে পড়ে আমি প্রায় দিশেহারা হয়ে গেলাম। এফডিসি সরকারী সংস্থা হলেও এমন এক সংস্থা যেখানে টাকা ছাড়া কোন কাজ হয় না। সবার জন্যে রেট বাঁধা আছে। অপটিক্যালের কাজ হবে— পাঁচ হাজার টাকা। ছবি প্রিন্ট— ষোল হাজার টাকা। নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হবে না। এফডিসি'র লোকজনদের অখুশী করা যাবে না। যদি তারা নাখোশ হয়— ছবি নষ্ট হয়ে যাবে। কে নেবে এই ঝুঁকি ?

টাকা পয়সার ব্যাপারটা মোজাম্মেল সাহেব দেখছিলেন, আমি টাকা পয়সা নিয়ে ভাবতে চাচ্ছিলাম না,

তারপরও ভাবতে হচ্ছিল। আমার মনে হতে লাগলো টাকা পয়সা শুধু না কোন কিছুই যেন আমার হাতের মুঠোয় নেই। সবাই যেন নিজের মত করে কাজ করছে। ক্যামেরাম্যান এসে বললেন, হুমায়ূন ভাই লাইট হয়েছে। লাইট দেখুন। আর্টিস্ট বসানো হয়েছে। আর্টিস্ট ডলি জহুর, তিনি চিন্তিত মুখে সেলাই মেশিনে সেলাই করছেন। আমি দেখলাম ঝকঝকে আলো কোথাও ডলি জহুরের ছায়া পড়ছে না।

আমি বললাম, ভাই ছায়া কোথায়? আর্টিস্ট সেলাই মেশিনে সেলাই করবেন পেছনে থাকবে তার বিশাল ছায়া সেই রকমইতো বলা হয়েছিল। রাতের সব দৃশ্যে মানুষের চেয়ে ছায়া বড় দেখাবে। ছায়াটা এখানে তার মনের ভয়ের প্রতীক। ছায়া কোথায় গেল?

ছায়া বানাতে হলে আবার নতুন করে লাইট করতে হবে।

'করুন নতুন করে লাইট করুন।'

আবার লাইট করা হল। আমি বললাম, রাতের দৃশ্য হিসেবে আমার কাছেতো আলো অনেক বেশী লাগছে। মনে হচ্ছে দিনের মত ঝকঝক করছে।

'আমাদের দেশের হল খারাপ। প্রজেকশন ঘরে কার্বন ঠিকমত পোড়ায় না। আমরা যদি লাইট বেশী না করি সেই সব হলে রাতের দৃশ্যগুলি কিছুই দেখা যাবে না। আপনি বললে লাইট কমিয়ে দেব। আপনি ডিসিশান দিন।'

কি ডিসিশান দেব বুঝতে পারি না। হতাশা বোধ করি। নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ লাগে। সেই রাগের ছায়া পড়ে অন্যদের উপর।

একদিন সেই কারণেই শীলাকে প্রচণ্ড ধমক দিলাম। সামান্য অভিনয় ঠিকমত পারছে না। মন লাগিয়ে কাজ করছে না। বারবার কাট হচ্ছে। কাট হওয়া মানে ফিল্ম নষ্ট। অর্থ নষ্ট। যে স্রোতে টাকা বের হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে অর্ধেক পথে ছবি বন্ধ করে দিতে হবে। মেয়েকে ধমকে সেই হতাশা কিছুটা কমানোর চেষ্টা করলাম। শীলা আমার উপর রাগ করল। রাত দুটার বাসায় ফিরে খেতে বসেছি, সে খাবে না। তার অভিযোগ কেন তাকে এত মানুষের সামনে ধমকানো হল। আমি ভাত খাচ্ছি— বাচ্চা মেয়ে ভাত খাচ্ছে না।

মুক্তি বাহিনীর একশানের দৃশ্য।
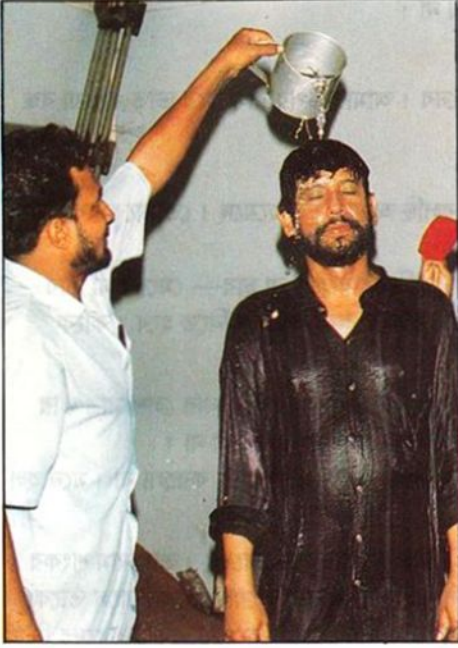
শুটিং-এর প্রয়োজনে বদিউল আলমকে পানি ঢেলে পুরো ভিজিয়ে দেয়া হচ্ছে
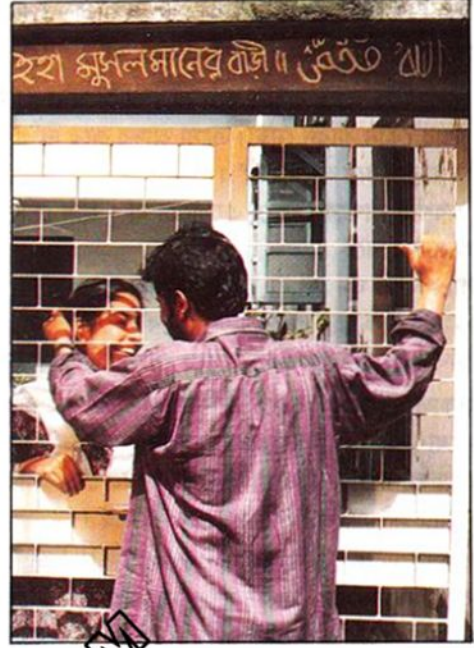
মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম হুট করে একদিন মা-বোনকে দেখতে তাঁদের বাড়ীতে চলে এল। সবকিছু তার কাছে কেমন অচেনা লাগছে। বাড়ির গেটের উপর লেখা 'ইহা মুসলমানের বাড়ী'। এর মানে কি ?

রাগ করে আছে। চোখের পানি অঝোড়ে ঝরছে। শীলার মা এসে মেয়ের পাশে দাঁড়াল। তার রণরঙ্গিনী মূর্তি (মনে হয় সেও তার ব্যক্তিগত হতাশা আমার উপর ঝেড়ে ফেলছে)। মেয়ের মা'র বক্তব্য কেন তার মেয়েকে এত মানুষের সামনে অপমান করা হল। গুলতেকিন বলল, আমার বাবা কখনো আমাকে মানুষের সামনে লজ্জা দেন নি। অপমান করেননি।

তোমার বাবা কি করেছেন ? তোমার বাবা কি কখনো অচেনা মানুষের সামনে তোমাকে অপদস্ত করেছেন ?

আমি বললাম, না।

'তাহলে তুমি কেন তোমার মেয়েকে সবার সামনে ধমকালে ?'

আমি বললাম, তোমার বাবাও সিনেমা বানান নি, আমার বাবাও সিনেমা বানান নি। তাঁরা যদি বানাতেন এবং আমি সেই ছবিতে অভিনয় করতাম তাহলে হয়তো আমিও বকা খেতাম।

'রসিকতা করবেনা।'

'আচ্ছা যাও করব না।'

'শীলা তোমার এই ছবিতে অভিনয় করবে না। সে করতে চাচ্ছে না এবং আমি তাকে বলে দিয়েছি করতে হবে না।'

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। নিজের ঘরে একি সমস্যা। সত্যি সত্যি যদি মা-মেয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আমার পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত পাল্টানো কঠিন হবে। হাতে সময়ও নেই। কাল সকালের শিফটেই শীলার কাজ।

আমি খাওয়া ফেলে হাত ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। আমার রীতিমত কান্না পেতে লাগল। শীলাকে ডেকে এনে বললাম, মা তুমি নাকি আর অভিনয় করবে না ?

'তোমার ছবিতে অভিনয় করব না'।

'আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে বকা দেবার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। একজন ছবির পরিচালক শিক্ষকের

মত । শিক্ষক তার ছাত্রকে বকা দিতে পারেন । এতে দোষ হয় না ।'

'আমি তোমার ছবিতে অভিনয় করব না' ।

আচ্ছা ঠিক আছে করতে হবে না । আমি অন্য কাউকে খুঁজে নেব । আমার উপর রাগ করে ভাত খাওয়া বন্ধ করার কোন কারণ নেই । এসো আদর করে দি' ।

'আমার আদর লাগবে না' ।

'অবশ্যই লাগবে । কাছে এসোতো মা । আর শোন, আবারও বলছি আমার ভুল হয়েছে । তোমাকে বকা দেয়া অন্যায় হয়েছে ।'

রাতে ভাল ঘুম হল না । এই সমস্যার সমাধান কি ? মেয়ে যদি অভিনয় করতে না চায়— মেয়ের মা তার মেয়ের দিকটাই দেখবে আমার দিকটা দেখবে না । আমাকে এই চরিত্রে অন্য কাউকে নিতে হবে । কাকে নেব ? যে সব অংশ হয়ে গেছে সে সব রিশুট করতে হবে ।

সকাল ন'টায় ঘুম ভেঙে দেখি শীলা শুটিং-এর ব্যাগ হাতে অপেক্ষা করছে । রাতের ঘটনার লেশ মাত্র তার মধ্যে নেই । আমি প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনো লোকজনের সামনে মেয়েকে ধমকাবো না ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারিনি । সেদিনই সে আবার প্রচণ্ড ধমক খেল । তবে মন খারাপ করলো না । মনে হল বাবার এই ত্রুটি সে স্বীকার করে নিয়েছে ।

আমার সবচে বেশী বকা যার খাওয়ার কথা ছিল তিনি খাননি । নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেছেন । তার নাম শংকর । বাড়ি ময়মনসিংহ । অভিনয়ের 'অ' জানেন না, তবে উৎসাহ সীমাহীন । আমার 'অয়োময়' সিরিয়ালে তাঁকে নিয়েছিলাম । তাঁর ভূমিকা ছিল দেশে যখন মড়ক লাগল তখন তিনি লাশ পোড়াবার জন্য একটি শবদেহ নিয়ে যাবেন । এই দৃশ্যেই তিনি মহা খুশী ।

আগুনের পরশমণি ছবি হচ্ছে শুনে তিনি ময়মনসিংহ থেকে ছুটে এলেন । এসেই আভূমি নত হয়ে সবার সামনে আমার পায়ে পড়ে গেলেন— দাদা আপনি ছবি বানাবেন সেই ছবিতে আমি থাকব না ? একটা রোল

ছবির বিশাল কর্মযজ্ঞ আসলে কি বোঝানোর জন্য এই ছবি । আমরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের খণ্ডযুদ্ধের চিত্রায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছি ।

পেপার কাটারে মুক্তিযোদ্ধার আঙ্গুল কেটে দেয়া হচ্ছে।

আমাকে দিতেই হবে। ডায়ালগ না থাকলেও অসুবিধা নাই।

ভদ্রলোককে রোল দিলাম। রাত্রিদের বাড়ীতে দুধ দিতে গোয়ালা। সে এসে কাঁদতে কাঁদতে রাত্রির মাকে খবর দেবে এবং বলবে, মা আমার দুইটা পুলারে মিলিটারী মাইরা ফেলছে।

দৃশ্য বুঝিয়ে দেয়া হল। তিনি ডলি জহুরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবেন। তারপর কাঁদতে শুরু করবেন। প্রথম শট এটুকুই।

ক্যামেরা চালু করে একশান বলতেই ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে এলেন। প্রণাম করার পরিবর্তে বললেন— সালামু আলাইকুম। আপা কেমন আছেন ?

আমরা সবাই হতভম্ব। আমি 'কাট' বলতে ভুলে গেলাম। একি কাণ্ড !

আমি নিজের বিস্ময় সামলে নিয়ে বললাম— ছালামালিকুম আপা কেমন আছেন। এসব বলছেন কেন ? 'মিসটেক হয়ে গেছে দাদা। মাথা আউলা হয়ে গেছে। আর হবে না।' আবার ক্যামেরা চালু করা হল। আমি বুঝিয়ে দিলাম-দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই ডলি জহুরকে প্রণাম করবেন। উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করবেন। এর বাইরে কিচ্ছু করবেন না।'

ক্যামেরা চালু হল। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। হঠাৎ চোখ মুছে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—

'মিসটেক হয়েছে। প্রণাম করতে ভুলে গেছি। দাদা আরেকটা চান্স দেন। কেটে বের হয়ে যাব।'

দিলাম চান্স। ভদ্রলোক কেটে বেরুতে পারলেন না। আমি কাটা পড়লাম। আমার রোখ চেপে গেল।'

একে দিয়েই অভিনয় করাব। কাটের পর কাট হতে লাগল। রবার্ট ব্রুসের রেকর্ড ভঙ্গ করে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন। আমার মাথায় তখন রক্ত উঠে গেছে।

দৃশ্য আবার শুরু হচ্ছে। শংকর আমার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন। অভয় দানের মত বললেন, দাদা আর ভুল হবে না। এক চান্সে বের হয়ে যাব। মাথার মধ্যে সব নিয়ে নিয়েছি।

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম ভেরী গুড্ ।
ক্যামেরা চালু হল । দরজা খুলে শংকর এলেন । ডলি জহুরের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'মা-আম্মা । আপনের দুইটা পুলারে মিলিটারী মাইরা ফেলেছে ।'

আমার কাট বলতে হল না । ক্যামেরাম্যান নিজ থেকেই ক্যামেরা বন্ধ করে বললেন, এক লাথি দিয়ে একে আমি এফডিসির বাইরে ফেলে দিব ।

শংকর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অল্পতে রাগেন ক্যান ? অভিনয়তো সহজ ব্যাপার না । জটিল ব্যাপার । ভাব যখন আসে তখন কথা 'আউলাইয়া' যায় ।'

আমি বললাম, তাতো ঠিকই আসুন আবার ।
শংকর প্রবল উৎসাহে আবার শট দেবার জন্যে এগিয়ে গেলেন । মোজাম্মেল সাহেব আমাকে বললেন, হুমায়ূন ভাই আপনার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে । কি পরিমাণ ফিল্ম যে নষ্ট করছে বুঝতে পারছেন না ? আজ সারাদিনতো আর কোন শটই হবেনা । গাধাটার পেছনে এত সময় নষ্ট করছেন কেন ? আমি মোজাম্মেল সাহেবের কথায় কোন জবাব দিলাম না । গাধাটার পেছনে এত সময় কেন নষ্ট করছি সেই কারণ আমি জানি । কারণটা মোজাম্মেল সাহেবকে তখন বলতে ইচ্ছা করেনি । এখন বলি— বেচারা ময়মনসিংহ থেকে গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে অভিনয় করতে এসেছে । মনের আনন্দে পরিশ্রম করে যাচ্ছে । এখন যদি তাকে বাদ দি তার দীর্ঘশ্বাস আমার আগুনের পরশমণিতে লেগে থাকবে । আমি মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে খুব ভয় পাই । সর্বমোট তেইশটা শটের পর শংকরের অভিনয় 'ওকে' হল । শংকর মাথার ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করলেন । মুখ ভর্তি হাসি দিয়ে বললেন, দাদার সঙ্গে কাজ করার আনন্দ অন্য রকম । দাদা আপনার সঙ্গে কাজ করে বড় তৃপ্তি পেয়েছি ।
আমি বললাম, আপনার সঙ্গে কাজ করে আমরাও তৃপ্তি পেয়েছি ।

নেক্সট ছবি যখন করবেন, খবর দিবেন এসে শট দিয়ে যাব । টাকা-পয়সা কোন ব্যাপার না-অভিনয় করাটাই ব্যাপার । দাদা কি বলেন ?'

নকল চাঁদ

বিপাশার পাশে আমাদের আরেক শক্তিমান অভিনেতা— বিড়াল। খুব ভালো অভিনয় করেছে। পশু-পাখিদের ক্ষেত্রেও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলে এই বিড়ালটার সুযোগ ছিল।

তাতো বটেই।

শংকরের প্রসঙ্গ যখন এল তখন আরো দু'জন অভিনেতার কথা বলি। এই দুইজন (সঙ্গত কারণে নাম উল্লেখ করছি না) এফডিসি'তে ঘুরাঘুরি করেন। এদের পারিভাষিক নাম 'এক্সট্রা' যে কোন রোল দু'শ টাকার বিনিময়ে করে দেন। আমার দু'জন এক্সট্রা দরকার হলো। এক্সট্রা পাওয়া কোন সমস্যা না— এফডিসি'তে এক্সট্রা কিলবিল করছে। সমস্যা হচ্ছে যে ধরনের অভিনয় এদেরকে দিয়ে করানো হবে সে ধরনের অভিনয় এরা করতে রাজি হবেন কি না ?

দৃশ্যটা এ রকম— পাকিস্তানী মিলিশিয়া বাহিনী সদস্যরা দু'জন বাঙালীকে উলঙ্গ করে উঠবোস করাচ্ছে। ১৯৭১ সনের এই দৃশ্য স্বাভাবিক একটা দৃশ্য। আমি নগ্ন দৃশ্যটি ছবিতে রেখেছি সেই সময়ে আমাদের ভয়াবহ অবস্থা বোঝানোর জন্য। দৃশ্যটি এক অর্থে প্রতীকীও বটে। বাঙালী জাতিকে এরা উলঙ্গ করে দিচ্ছে। কে রাজি হবে নগ্ন হয়ে অভিনয় করতে ?

আমি মিনহাজকে বললাম, মিনহাজ বলল, স্যার আমি ট্রিকস খাটিয়ে ব্যবস্থা করছি।

'কি রকম ট্রিকস ?'

ছবি পাড়ায় অনেক ট্রিকস আছে। সব আপনার জানার দরকার নাই।'

মিনহাজ গম্ভীর মুখে দুজন অভিনেতাকে নিয়ে এল। কঠিন গলায় বলল, আপনারা দু'জন স্যারের ছবিতে অভিনয় করতে চান ?

'জ্বি।'

'যে কোন চরিত্রে করতে রাজি আছেন ?'

'অবশ্যই। স্যারের ছবিতে থাকতে পারছি এটাই বড় কথা।'

'তাহলে নেন এই কাগজে লেখেন যে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি আছি।'

'কাগজে লেখার দরকার কি ?'

'স্যারের কাজকর্ম খুব পরিষ্কার। আপনাকে রোল দেয়া হবে তারপর আপনি বলবেন রোল পছন্দ হয় নাই। চলে যাবেন তা হবে না। আমরা কোর্টে মামলা করে দেব। কমছে কম দুই বছর জেলের ভাত খেতে হবে।'
তারা দু'জন কাগজে সই করে দিল। মিনহাজ কাগজ দু'টা পকেটে ভরতে ভরতে বলল, এখন কাপড় খুলে নেংটা হয়ে যান। নেংটা হয়ে শট দিতে হবে।'
'তামাশা করেন কেন ?'
'নুহাশ চলচ্চিত্র তামাশা করে না। সময় নষ্ট করবেন না-ক্যামেরা রেডি-নেংটা হয়ে শট দিয়ে পেমেন্ট নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি চলে যান।'
গভীর বিস্ময় ও বেদনা নিয়ে এই দু'জন আমার দিকে তাকাল। তাদের দৃষ্টিতে লেখা- আপনাকেতো ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। আইনের প্যাঁচে ফেলে আপনি আমাদের একি বিপদে ফেলছেন। ঘরে স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে-তারাওতো এই ছবি দেখবে।

আমি এই দু'জনের অসহায় দৃষ্টি উপেক্ষা করে গম্ভীর মুখে সিগারেট টেনে যেতে লাগলাম।

দৃশ্যটা চমৎকার ছিল। কিন্তু আমি ঠিকমত নিতে পারি নি। এই আফসোস আমার কোন দিন যাবে না। ছবিঘরে যতবার এই দৃশ্য দেখি ততবার মনে হয় আমি এটা কি করলাম ?

দৃশ্যটা এরকম-পাকিস্তানী মিলিশিয়া তিনজন পথচারীকে ধরেছে। দু'জনকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে কানে ধরে উঠবোস করাচ্ছে এবং মজা পেয়ে খুব হাসছে। অন্য একজন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে কারণ তাকে নিয়েও এই কান্ড করা হবে।

বদিউল আলম এই দৃশ্য দেখে ছুটে চলে যায় এবং মরিস মাইনর গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়। গাড়ির ভেতর থেকে স্টেইনগানের গুলিতে সে মিলিশিয়া দু'জনকে মেরে দ্রুত গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়।

দৃশ্যটি যে ভাবে লেখা হয়েছে ঠিক সে ভাবেই নেয়া হয়েছে। তারপরেও আমার কাছে দৃশ্যটি অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। মানবিক আবেগ নিয়ে যে খেলাটি খেলতে পারতাম তা আমি খেলতে পারিনি। বদির গাড়ি চলে

মতিনউদ্দিন সাহেব দেয়ালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছবি টানিয়েছেন। ছবিতে ফুলের মালা দিয়েছেন। এই কর্মকাণ্ডে খুবই বিব্রতবোধ করছেন। এমন সময় রাত্রি জানতে চাইল— বাবা তোমার লজ্জা করছে না।

গেল দৃশ্যটি শেষ হয়ে গেল। উচিত ছিল মুহূর্তের জন্যে হলেও বদি চলে যাবার পর উলঙ্গ মানুষ দু'টির প্রতিক্রিয়া দেখানো। তাঁদের আনন্দ, উল্লাস ও বিজয়ের ছবি পর্দায় ধরে রাখা। এই শটটি নিয়ে রাখলে বদির গাড়ি চলে যাবার পরপরই আমরা দৃশ্যটি ভুলে যেতাম না। দৃশ্যটা অনেকক্ষণ মাথার ভেতর গানের সুরের রেশের মত গুন গুন করতো। শেষ হয়েও শেষ হত না।

অনভিজ্ঞতার কারণে এ ধরনের ভুল আমি একের পর এক করেছি। কিছু কিছু ভুল শুধরেছি। কিছু কিছু ভুল শুধরাতে পারিনি।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখানোর জন্যে আমি আসল চাঁদ ব্যবহার না করে নকল চাঁদ ব্যবহার করেছি। পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এফডিসি'তে চাঁদ তৈরীর একটা যন্ত্র আছে। যন্ত্রটা দেখতে মীর জুমলার কামানের মত। এই যন্ত্রে নানান ধরনের চাঁদ তৈরী করে পর্দায় ফেলা হয়। ভাড়া এক শিফটের জন্যে এক হাজার টাকা।

আমি এক হাজার টাকায় নকল চাঁদ তৈরী করে সেই দৃশ্য ধারণ করলাম। কুৎসিত একটা মেকি চাঁদ। অথচ পূর্ণিমার জন্যে অপেক্ষা করলেই আমরা পারতাম। তাড়াহুড়ার জন্যে এই কাজটা করা হল না। পবিত্র কোরান শরীফে এই কারণেই হয়ত বলা হয়েছে,

"হে মানব সম্প্রদায় তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।"

ঈদের বাজারে কি হয় একটু বলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করি। বাবা-মা তার চার বছরের শিশু কন্যাকে নিয়ে সকাল দশটায় ঈদের বাজার করতে বের হলেন। মেয়ের জন্যে ফ্রক কেনা হবে। যে ফ্রকই দেখেন পছন্দ হয় না। ডিজাইন খারাপ, কাপড় খারাপ, দাম বেশী। তারা ক্লান্তিহীন। শুধু দেখেই বেড়াচ্ছেন। এক বাজার থেকে আরেক বাজারে যাচ্ছেন। মেয়ে এখন পরিশ্রান্ত বাবার কোলে ঘুমুচ্ছে। এক সময় সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাবা-মা দু'জনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে। এখন কি হবে? এখন যা হবে তা হল তাঁরা একটা দোকানে ঢুকবেন। মেয়েকে দেখিয়ে বলবেন এর মাপে একটা ফ্রক দিন। একটা ফ্রক দেয়া হল মাপে হল কি হল না তা

দুই কন্যা— রাত্রি, অপালা বিস্মিত হয়ে বাবার কান্ড দেখছে। বাবা এটা কি করছেন— ঘরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছবি টানাচ্ছেন। এর মানে কি?
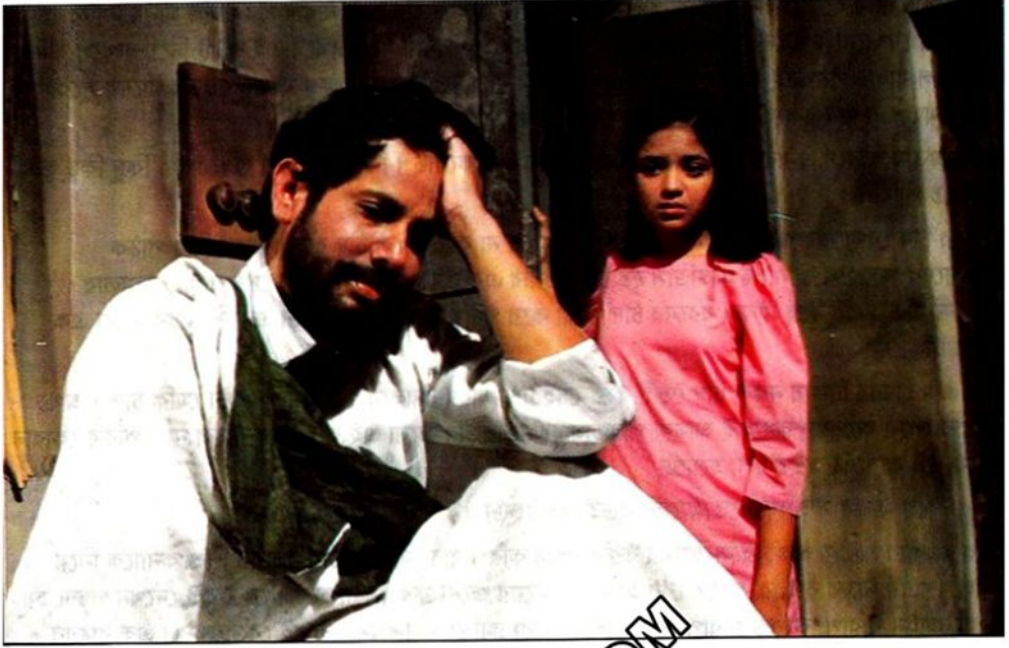
অপরিচিত একজন থাকছে তাঁদের বাড়ীতে। মানুষটা কে ? অপালা জানতে চাইল— গরমের দিনে আপনি কাঁথা গায়ে দিয়ে আছেন কেন ?

তাঁরা দেখলেন না, রঙ দেখলেন না, কাপড় দেখলেন না। আর কথা বলার শক্তি নেই, বাছাবাছির ধৈর্য নেই।
মা বললেন, দাম কত ?
দোকানদার দাম বলল।
দরদাম করা যাচ্ছে না, মেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। বাবা পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকা গুনে দিয়ে ফ্রক নিয়ে চলে গেলেন।
ছবি বানানোর সময় এই ব্যাপারই হয়। প্রতিটি খুটিনাটি গভীর মনোযোগে দেখা হতে থাকে। সময় বয়ে যায় সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শট নেবার সময়, সবারই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তখন একটা কিছু হলেই হল।
আমি সব সময় চেষ্টা করেছি আমার ক্ষেত্রে যেন এ রকম না হয়, আমি যেন ধৈর্য হারা না হই।
তারপরেও মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়েছি-পূর্ণিমার চাঁদকে সেই কারণেই পর্দায় ধরতে পারিনি। এই দুঃখ কোন দিন যাবে না।

অভিনেতাদের কাছে থেকে অভিনয় আদায়ের ব্যাপারটা দুরূহ। বিশেষ করে আমার পক্ষে— আমি অভিনেতা নই। অভিনয় জানি না। অভিনয় করে কাউকে কিছু শেখানোর ক্ষমতা আমার নেই।
আমি সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করি। অভিনেতাকে বলি এই সিচুয়েশনে আপনি কি করবেন ?
অভিনেতা অভিনয় করে দেখান। যখন পছন্দ হয় না তখন অন্য ভাবে করতে বলি। 'ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড।' কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনয়ের পুরো ব্যাপারই অভিনেতার উপর ছেড়ে দিয়ে বলি- "আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন।" এর ফল শুভ হয় না।
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অভিনেতারা এই বক্তব্যের পর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন। আসাদুজ্জামান নূর হচ্ছেন তার উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি সবসময়ই বলেন- "আমি ডিরেক্টরের অভিনেতা। আমি কি করব না করব তা ডিরেক্টরকে বলে দিতে হবে।" তার অভিনয় দেখে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে-মহান কোন ডিরেক্টরের হাতে পড়লে কি চমৎকার ব্যাপারই না হত। একজন পোলানস্কি, একজন গদার, একজন তারোকাভস্কি কিংবা একজন সত্যজিৎ কি জিনিসই না বের করে আনতে পারতেন।

আমার কাছে সুবর্ণাকে শাবানা আজমীর চেয়ে অনেক বড় অভিনেত্রী মনে হয়। শাবানা আজমীকে বলছি কেন শক্তিমান পরিচালকের হাতে পড়লে তিনি অড্রে হেপবার্ণকে ছাড়িয়ে যেতেন। নূরকে আমার সব সময় মনে হয় ডাসটিন হফম্যানের চেয়েও বড় মাপের অভিনেতা। আলেক গিনিস কি আবুল হায়াতের চেয়েও বড় অভিনেতা ? আমার মনে হয় না। হুমায়ুন ফরিদী, আরেকজন গ্রাণ্ড মাষ্টার। অভিনয় কলা তাঁর হাতের পোষা পাখি। তাঁকে যখন দেখি হাল আমলের বাংলা ছবিতে ভিলেন সেজে লাফালাফি করছেন তখন খুব কষ্ট হয়। ক্ষমতাধর অভিনেতা অভিনেত্রী আমাদের আছে। জাতি হিসেবে আমাদের দূর্ভাগ্য আমরা তাঁদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছি না।

আমি বিনীত ভাবে স্বীকার করছি— অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে তেমন অভিনয় আমি আদায় করতে পারিনি তবে পশুপাখিদের কাছ থেকে ভাল অভিনয় আদায় করেছি।

'আগুনের পরশমণি'র কবুতর, টিয়া বেড়াল এবং কুকুর খুব ভাল অভিনয় করেছে। শুধু তেলাপোকাদের কাছ থেকে ভাল অভিনয় পাই নি। পোকারা সম্ভবত আমাকে পছন্দ করে না। তেলাপোকার একটাই দৃশ্য ছিল। বদির রাতের খাবার দেয়া হয়েছে। সে অসুস্থ কিছু না খেয়েই ঘুমুতে গেছে। তার ভাতের থালার উপর তেলাপোকা হাঁটাহাঁটি করছে। আমরা এক বস্তা তেলাপোকা নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ক্যামেরা চালু করলেই তেলাপোকা স্থির হয়ে যায়। হেঁটে বেড়ায় না। মহা যন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটা হল ঈদের বাজারের মত। ক্যামেরা অন করে বলা হল— যা হবার হোক।
তেলাপোকা হাঁটলে হাটুক— না হাঁটলে নেই।
তেলাপোকা হাঁটে নি।

ছবির কোন দৃশ্য কি ভাবে নেব সেই বিষয়ে আমার কোন অস্পষ্টতা ছিল না। আমি প্রতিটি দৃশ্য অনেকবার ভেবে শট ডিভিশন করেছি, দৃশ্য ধারণের সময় শট ডিভিশন হুবহু অনুসরণ করতে পারলাম না। এসিস্ট্যান্ট

রাত্রির ভাবভঙ্গি তাঁর মার ভালো লাগছে না। তাঁর মনে হচ্ছে এই মেয়েটি বদিউল আলম নামের পরিচয়হীন ছেলেটির প্রেমে পড়ে গেছে। মা মেয়ের চুল বাঁধতে বাঁধতে কোমল গলায় বললেন— 'ভুল মানুষকে ভালোবাসতে নেই মা।'
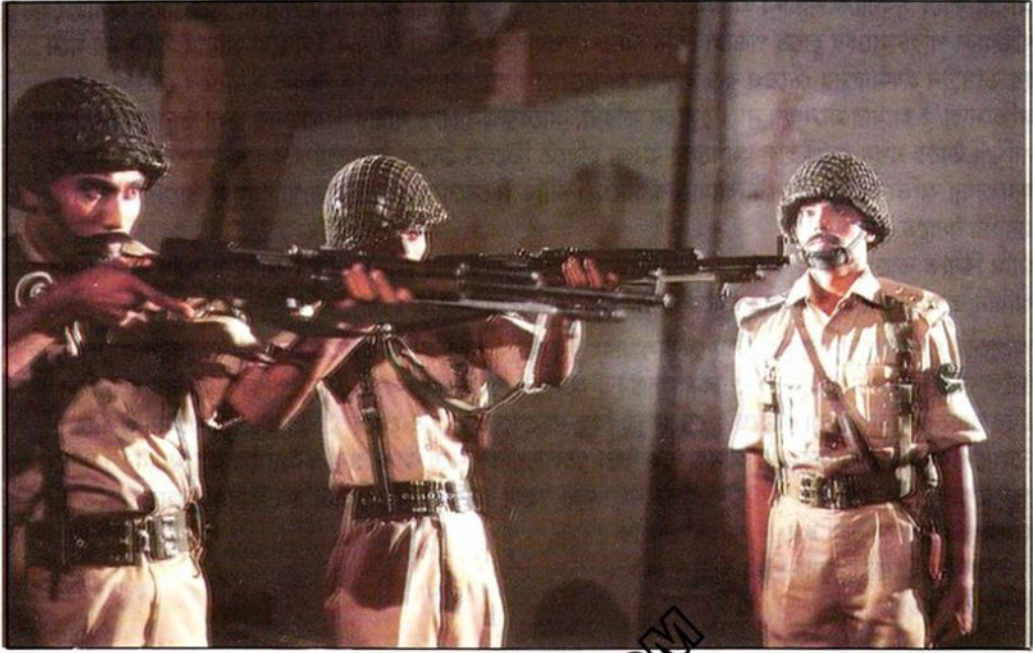
পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ফায়ারিং স্কোয়াড।

তারা চৌধুরী এবং ক্যামেরাম্যান আখতার সাহেবের একটা প্রবণতা দেখা গেল তাৎক্ষণিকভাবে নতুন শট ডিভিশন করা। তাদের যুক্তি— খাতা পত্রে শট ডিভিশন ও স্পটে শট ডিভিশন দুই ব্যাপার। এরা দু'জন এক্সপার্ট, আমি আনাড়ি এই ভেবে ওদের যুক্তি মেনে নিয়েছি— যদিও কাজটা ঠিক হয়নি। খাতাপত্রের শট ডিভিশন থেকে এরা বের হয়ে আসতে চেয়েছে মূলত ঝামেলা এড়ানোর জন্যে। তারার ভেতর আরেকটি ব্যাপার কাজ করেছে— 'আমার মত ভাল কেউ জানে না। ছবির লাইনে আমিই এক্সপার্ট"— এটি প্রমাণ করা। প্রায়ই দেখা যেত এক্সিস ক্রসিং নিয়ে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে তার লেগে গেছে। সে বলছে এক্সিস ক্রস হয়েছে, ক্যামেরাম্যান বলছে হয়নি। এইসব ক্ষেত্রে বিবাদের ফয়সালা পরিচালক করেন। আমি করতে পারছি না। এক্সিস ক্রসিং ব্যাপারটাই আমি বুঝি না। পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, এখন আমি জানি এক্সিস ক্রসিং কি ব্যাপার। অবস্থা এই পর্যায়ে যখন গেল তখন এক সন্ধ্যায় তারাকে বরখাস্ত করা হল। প্রধান সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হল মিনহাজুর রহমানকে। তারা হতভম্ব, তাকে এক কথায় ছবি থেকে আমি বের করে দেব তা সে কল্পনাও করেনি। শেক্সপীয়ারের একটি বাক্য আমার খুব পছন্দের, "I have to be cruel only to be kind."

তারা বিহীন আগুনের পরশমণি ভালই এগুতে লাগল।

ক্যামেরাম্যান আখতার হোসেন আমাকে এসে ধরলেন— তারার অবস্থা দেখে তাঁর খুব মায়া লাগছে। তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করছেন, তাকে যেন আমি আবার দলে নেই।

আখতার সাহেবের সঙ্গে যুক্ত হল আমার মেজো কন্যা শীলা। তার যুক্তি হচ্ছে, তারা চাচাকে তুমি বাদ দিচ্ছ, সেই বাদটা ছবির শুরুতে দিলে না কেন ? মাঝখানে কেন ? তাকে আরেকবার সুযোগ দাও।

আমার মনে হয় তিনি আর কোন ঝামেলা করবেন না। তারাকে আবার ডেকে নিলাম। লাভ হল না। দ্বিতীয় দিনের মাথাতেই এক্সিস ক্রসিং নিয়ে আবারো লেগে গেল। আখতার সাহেব রাগ করে ক্যামেরা বন্ধ করে বসে রইলেন।

আমি তাঁকে বললাম, রাগ করার আপনার সুযোগ নেই, আপনার অনুরোধেই তাকে আবার নেয়া হয়েছে।

ক্যামেরা চালু করুন । ক্যামেরা চালু হল ।

আমার অনভিজ্ঞতা আমাকে যতটা না সমস্যায় ফেলেছে তারচে বেশী হয়েছে আমার অনভিজ্ঞতার সুযোগ অন্যরা গ্রহণ করেছেন । উদাহরণ দিয়ে বলি— রাশ প্রিন্ট দেখার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ছবির কিছু কিছু অংশ কাঁপছে । আমি জানতে চাইলাম ছবি কাঁপছে কেন ? আমাকে বলা হল প্রজেকশন মেশিনের জন্যে কাঁপছে । এফডিসি'র প্রজেকশন মেশিন ভাল না । আমি বললাম প্রজেকশন মেশিনের কারণে ছবি কাঁপলে সব ছবি কাঁপতো কিন্তু আমি দেখছি কিছু কিছু অংশ কাঁপছে । আমাকে বুঝানো হল— দু'রকম কাঁপুনি আছে হরাইজনটাল এবং ভারটিক্যাল । ভারটিক্যাল কাঁপলে সমস্যা প্রজেকশন মেশিনের । আমার অনভিজ্ঞতার কারণে আমি তাই মেনে নিলাম, পরবর্তী সময়ে দেখা গেল এই কাঁপুনি এসেছে চিত্রগ্রহণের ত্রুটির জন্যে । যখন আমি বার বার সবার কাছে জানতে চাচ্ছি কাঁপুনিটা কি ক্যামেরার কারণে হচ্ছে, তখন যদি কেউ বলত হ্যাঁ— আমি অবশ্যই প্রতিটি দৃশ্য রিশুট করতাম । কেউ বলেনি । আমার এক্সপার্ট (!) সহকারী পরিচালক তারা, এক্সপার্ট এডিটর (!) আতিকুর রহমান মল্লিক, এক্সপার্ট (!) ক্যামেরাম্যান আখতার হোসেন— কেউ না ।

সেন্সার প্রিন্ট তৈরী হয়ে যাবার পর আমার মনটা খুবই খারাপ হল । কি আশ্চর্য কিছু কিছু জায়গায় ছবি কাঁপছে । আমাকে প্রবোধ দেয়া হল এই বলে যে— "বাংলাদেশের সব ছবিই কোন না কোন পর্যায়ে কাঁপে । আপনার ছবির কাঁপুনি সেই তুলনায় কিছুই না । সিন্ধুতে বিন্দু ।"

তাঁদের প্রবোধ বাক্যে মন মানল না । পুরো ছবি দেখার পর সারারাত ঘুম হল না । বারান্দায় বসে কাটিয়ে দিলাম । পরদিন ভোরে এফডিসি'তে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলাম, যেসব অংশ কাঁপছে সেসব অংশ আমি আবার রিশুট করব ।

সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে গেল । আবার সব কিছু জোগাড় করা, আবার শুটিং, এডিটিং, ডাবিং, মিউজিক, আর-আর, প্রিন্টিং শতেক ঝামেলা ।
আমি বললাম, হোক ঝামেলা ।

গুলিবিদ্ধ বদিউল আলম
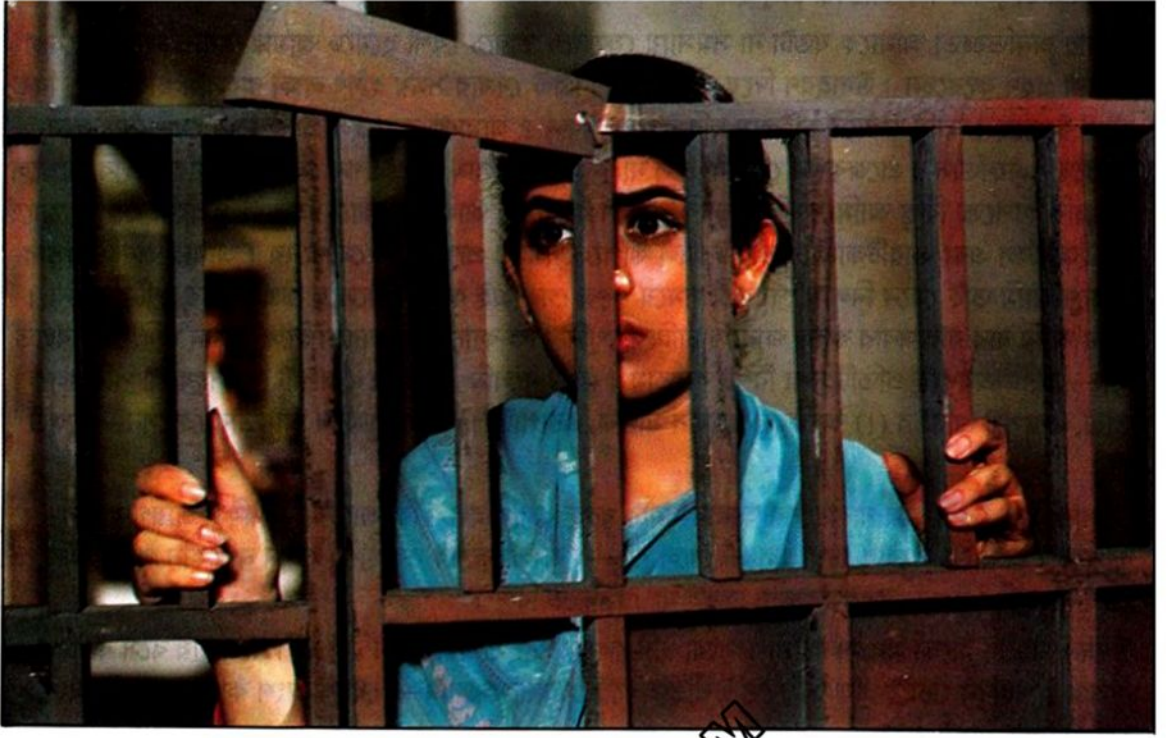
গুলিবিদ্ধ বদিউল আলম যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মতিন সাহেব ছুটে গেছেন ডাক্তারের জন্যে। রাত্রি বাড়ির গেট ধরে অপেক্ষা করছে। বাবা কখন ফিরবে। তিনি কি কোন ডাক্তার খুঁজে পাবেন?

"আমাদের টার্গেট হচ্ছে মহান বিজয় দিবসে ছবি মুক্তি— এই কাজগুলি করতে গেলে সেটা সম্ভব হবে না।"
'সম্ভব না হলে না হবে।'
'অনেক খরচ পড়বে।'
'অনেক মানে কত?'
'প্রায় দু'লক্ষ টাকা।'
আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। আমার সব সঞ্চয় শেষ। আসাদুজ্জামান নূরের কাছ থেকে টাকা ধার করে শেষের দিকের শুটিং করছিলাম। ছবি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘ দিন বই লিখি নি। বই এর রয়েলটি থেকেও কিছু পাচ্ছি না। একটা কাজ করতে পারি, মাইক্রোবাসটা বিক্রি করে দিতে পারি। কিন্তু মাইক্রোবাসটা আমার বাচ্চাদের খুব শখের। মাঝে মধ্যেই আমরা দল বেধে এই মাইক্রোবাসে উঠে ঢাকার বাইরে চলে যাই। মাইক্রোবাস বিক্রি করে দিলে বাচ্চারা মনে খুব কষ্ট পাবে।

ছবির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হল না। আমি আমার এই ছবি ছবিঘরে অনেকবার দেখতে গিয়েছি। ছবিটা এত অসংখ্যবার আমার দেখা যে গভীর বিষাদের জায়গাগুলিতে এখন আর চোখে পানি আসে না, শুধু যখন কাঁপুনি অংশগুলি আসে তখন চোখ জলে ভরে যায়। এই চোখের জল নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যর্থতার জল— একান্তই আমার গোপন অশ্রু।

ছবি বানানোর গল্প লিখছি। প্রকাশক জনাব আহমেদ মাহফুজুল হক লেখা স্লীপ নিয়ে যাচ্ছেন, প্রুফ দিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রতিবারই বলছেন— হুমায়ূন ভাই মজার ঘটনাতো এখনো কিছু লিখছেন না। মজার ঘটনা বলতে তিনি আলাদা করে কি বুঝাতে চাচ্ছেন জানি না। আমার ধারণা যা লিখছি— বেশ মজা করেইতো লিখছি। এর বাইরেও কোন বাড়তি মজা কি আছে? একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম মজার ঘটনা বলতে কি

বুঝাচ্ছেন ?
'ঐ যে এফডিসি'তে যখন যেতাম আপনি শুটিং নিয়ে মজার মজার গল্প করতেন'—
'কোন গল্পগুলি বলুনতো ?'
'যে সব গল্প শুনে আমরা হো হো করে হাসতাম ।'
'অনেকেইতো আমার প্রতিটি কথাতেই হো হো করে হাসেন— আমাকে মনে করিয়ে দিন ।'
'ঐ যে নূর ভাইয়ের ডীপ ফ্রীজে মরা কুকুর.....'
আমি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম । আসাদুজ্জামান নূরের ডীপ ফ্রীজে মরা কুকুর গল্পটির অংশ বিশেষ বানানো । বানানো অংশ বাতিল করলে গল্পটি দাঁড়ায় না ।'
'হুমায়ূন ভাই ডীপ ফ্রীজে মরা কুকুর গল্পটা বলতেই হবে । আমার কোন অনুরোধইতো আপনি রাখছেন না । এইটা রাখতে হবে ।'
'আচ্ছা বেশ রাখব । আর কোনটা ?'
'ঐ যে জ্যান্ত কবর দেয়া হল ।'
আমি আবারো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম । এই গল্পটিও বানানো । আসলে আমি যা করি তা হচ্ছে মজাদার গল্প তৈরী করে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বলি । গল্প বলা শেষ হলে সামনে যে থাকে তাকে জিজ্ঞেস করি ঘটনা এ রকম না ? আপনিওতো ছিলেন । যাকে প্রশ্ন করা হয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন— হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই ।
বাকি সবার কাছে গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায় । মানুষের স্বভাব হচ্ছে সে সত্যের চেয়ে মিথ্যাকে সহজে গ্রহণ করে ।
যাই হোক আমি ডীপ ফ্রীজে কুকুর গল্পটি বলছি । প্রথমতঃ প্রকাশকের মন রক্ষার জন্য । দ্বিতীয়তঃ এই গল্পটি নানান পত্র-পত্রিকায় (দৈনিক বাংলা, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার পত্রিকা) সত্য ঘটনা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে । আমি বিব্রত হয়েছি । আসাদুজ্জামান নূর সাহেবের প্রতি বিব্রত হয়েছেন । মূল ঘটনা কি এবং প্রচলিত গল্প কি বলে দেয়ার সময় এখন হয়েছে ।

গভীর রাত । রাত্রি বারান্দায় তার প্রিয় জায়গাটায় বসে আছে । প্রতীক্ষা করছে ভোরের । একসময় ভোর হবে— সে প্রথম আলোর সংবাদ পৌঁছাবে মৃত্যুপথযাত্রী বদিউল আলমের কাছে ।

পাকিস্তানী আর্মির হেড কোয়ার্টার।
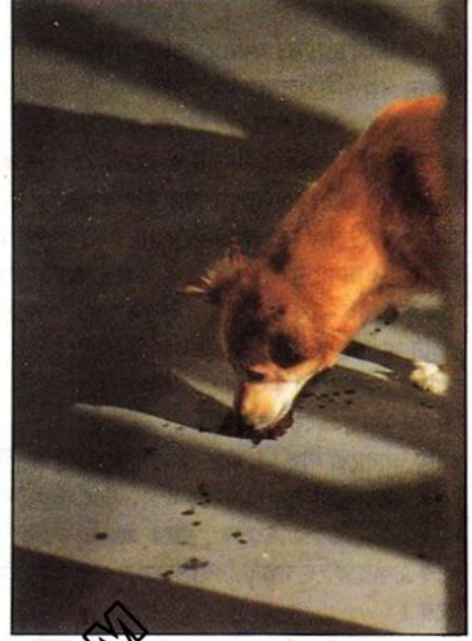
আমাদের আরেক শক্তিমান অভিনেতা কুকুর- বদির গা থেকে ঝরে পড়া রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছে।

আগুনের পরশমণি ছবির একটি দৃশ্য আছে ডাস্টবিনের পাশে দু'টি ডেডবডি এবং একটি মরা কুকুর পড়ে আছে। পাকিস্তানী মিলিটারী কুকুর এবং মানুষকে সমগোত্রীয় মনে করে। গুলি করে এক সঙ্গেই ফেলে রাখে। দৃশ্যটির ভেতরের কথা এই।

মরা কুকুর পাওয়া যাচ্ছে না। মিনহাজ বলল, স্যার রাস্তার একটা কুকুর ধরে বিষ খাইয়ে মেরে ফেরি। আমি বললাম, অসম্ভব। ছবির জন্যে প্রাণী হত্যা করতে পারব না। তোমরা খোঁজ রাখ কোথাও কোন মরা কুকুর দেখলে আমরা দৃশ্য ধারণ করব। একজনের কাজই হল ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে ঘুরে বেড়ানো। মরা কুকুর সাধারণত ডাস্টবিনের আশে পাশে ফেলে রাখা হয়। মরা কুকুর আর পাওয়া যায় না। একদিন মনে হল আচ্ছা মিউনিসিপ্যালিটিকে বলে দেখি না কেন ? তারাতো বেওয়ারিশ কুকুর মারে। একটা মৃত কুকুর আমাদেরকে দেবে। মিউনিসিপ্যালিটিকে বলা হল। একদিন এফডিসি'তে মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে উপস্থিত। ড্রাইভার হাসি মুখে বললেন স্যার কুত্তা আনছি। পছন্দ করেন। যেটা পছন্দ রাখেন।

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম পছন্দ করে কুকুর রাখার ব্যাপারটা মাথায় ঠিক ঢুকল না। ড্রাইভার গাড়ির ডালা খুলল— আমাদের সবার চোখ ব্রহ্মতালুতে উঠে গেল— খুব কম হলেও একশ' মরা কুকুর। বাছাবাছির প্রশ্নতো আসেই।

হৃষ্ট-পুষ্ট একটা কুকুর বেছে রাখা হল। সেদিনই শুটিংটা আমরা করতে পারলাম না। দিন ছিল মেঘলা, রোদ নেই।

পরদিন শুটিং হবে। মৃত কুকুরটা একদিন রাখতে হবে। আমি মিনহাজকে গম্ভীর মুখে বললাম, মিনহাজ কুকুরটাকে খুব ভাল করে প্যাক করে আসাদুজ্জামান নূর সাহেবের ডীপ ফ্রীজে রেখে এসো ভাবী যেন জানতে না পারে। আগামী কাল নিয়ে আসবে শুটিং হবে।

মিনহাজ বলল, জ্বি আচ্ছা স্যার।

এই হচ্ছে মূল ঘটনা।

চটের ব্যাগে ভরে কুকুর ডাস্টবিনে ফেলে রাখা হয়েছিল। পরদিন শুটিং হয়েছে।
কয়েকদিন পরেই পত্র-পত্রিকায় দেখলাম— আসাদুজ্জামান নূর সাহেবের ডীপ ফ্রীজে মরা কুকুর। নূর সাহেবের স্ত্রী পত্রিকা পড়ে আমাকে কাঁদো কাঁদো গলায় টেলিফোন করলেন— হুমায়ূন ভাই, আমি চাকরী করি। দিনে বাসায় থাকি না। এই ফাঁকে আপনার শুটিং এর মরা কুকুর আমার ডীপ ফ্রীজে রেখেছেন। বাচ্চাদের রান্না করা খাবার আমার ডীপ ফ্রীজে থাকে.......।
আমি বললাম ভাবী আমি একটা রসিকতা করেছিলাম পত্রিকাওয়ালারা সেই রসিকতা সত্যি ভেবে ছেপে দিয়েছে।
'রসিকতা ?'
'রসিকতা তো বটেই'
'বলেন কি ? আমি আমার ডীপ ফ্রীজের সমস্ত মাছ মাংস ফেলে ডীপ ফ্রীজ ডেটল দিয়ে ধুইয়েছি। আমার পুরো মাসের বাজার ছিল ডীপ ফ্রীজে।'
'ভাবী সরি।'
'হুমায়ূন ভাই আপনি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত রসিকতা কেন করেন ?'
আমি প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিনি।
একজীবনে রসিকতার কারণে আমি অসংখ্য জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছি— তারপরেও আমার শিক্ষা হয়নি। না আর না, রসিকতা বন্ধ করে এখন সিরিয়াস হতে হবে। রামগরুর ছানা হয়ে সিরিয়াস কর্মকাণ্ড করতে হবে। দাঁত ফুটানো যায় না এমন সব গল্প লিখতে হবে। কিছুই বোঝা যায় না এমন সব ছবি বানাতে হবে।

আগুনের পরশমণির শেষ দৃশ্য। ভোরের আলো স্পর্শ করার চেষ্টা করছে বদিউল আলম।

ডাবিং

ডাবিং প্রসঙ্গে বলি । এতক্ষণে যা করা হয়েছে তা হল শব্দহীন ছবি বানানো হয়েছে। শব্দযুক্ত হলেই ছবিঘরে ছবি মুক্তি দেয়া যাবে । শব্দহীন ছবির ছোট ছোট 'লুপ' বানিয়ে বড় পর্দায় লুপ চালানো হবে । শিল্পীরা তা দেখে ঠোঁট মিলিয়ে কথা বলবেন । শিল্পীদের এক সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে ।
যেমন—
১ । ঠোঁট যেন মেলে; ২ । অভিনয় ঠিক থাকে, রিডিং পড়া যেন না হয়;
৩ । উচ্চারণ যেন স্পষ্ট হয় ।
প্রফেশন্যালদের জন্যে কাজটা জটিল না, যারা প্রফেশন্যাল নয় তাদের জন্যে অত্যন্ত জটিল হবার কথা । আমি যাদের নিয়ে কাজ করছি তাঁদের বেশীর ভাগই এই প্রথম ডাবিং করবে । তাঁরা যেমন নার্ভাস, আমিও তেমনি নার্ভাস ।
রেকর্ডিং রুমে আমি বসে আছি । কানে মাইক্রোফোন লাগানো । আমার পাশে মফিজুল হক সাহেব আমাদের রেকর্ডিষ্ট । শুনেছি এই লাইনে তার অসীম দক্ষতা । রেকর্ডিং রুমের বিশাল কাঁচের জানালায় স্টুডিওতে কি হচ্ছে দেখা যায় । আমি দেখছি আমার ভীত সন্ত্রস্ত শিল্পীরা শুকনো মুখে ঘোরাফেরা করছে । বিপাশার মুখে বিশাল এক পেন্সিল । দূর থেকে মনে হচ্ছে কাঠি লজেন্সের বিকল্প হিসেবে পেন্সিল চুষছে । পরে জানলাম পেন্সিল মুখে দিয়ে বসে থাকলে স্বর পরিষ্কার হয় । এই তথ্য আমার জানা ছিল না । আমি জানতাম মুখে মার্বেল রেখে কথা বললে তোতলামি সারে । গ্রীক বক্তা ডেমেসথিনিস তার তোতলামি এই ভাবে সারিয়ে ছিলেন । বিপাশার তোতলামি আছে বলেতো জানতাম না । সে পেন্সিল মুখে দিয়ে বসে আছে কেন ? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলাম না । এমনিতেই সবাই টেনশনে ভুগছে । টেনশন বাড়িয়ে লাভ কি ? মফিজুল হক সাহেব বললেন, কেউ টেনশন করবেন না । আমি আছি । কয়েকবার দেখলেই ব্যাপারটা কি ধরতে পারবেন ।
তিনি আমাকে বললেন, হুমায়ূন ভাই আপনি শুধু লক্ষ্য রাখবেন অভিনয় অংশ ঠিক হয় কিনা । ঠোঁটের দিকে আমি লক্ষ্য রাখব ।
স্টুডিওতে শিল্পীরা যে সব কথাবার্তা বলছে তা শোনা যাচ্ছে । তাদের কথাবার্তা শুনে তেমন ভরসা পাচ্ছি না । যেমন বিন্তি বলল, শীলা দেখ ভয়ে আমার জ্বর এসে গেছে । গায়ে হাত দিয়ে দেখ ।
শীলা বলল, পুতুল আপু আপনি কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করবেন না । আমি নিজের যন্ত্রণাতেই অস্থির । আমি জানি আমি কিচ্ছু পারব না ।
ডাবিং শুরু হল ।
আশ্চর্য ব্যাপার প্রথম লুপে তিনটি টেকেই মফিজুল হক বললেন, OK
আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি OK ?
'আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখুন— শব্দ এসেছেও খুব সুন্দর— 'টনটনা শব্দ ।'
'টনটনা শব্দের মানে কি ?'
'টনটনা শব্দের মানে বলতে পারব না । সিনেমা হলে গেলে টের পাবেন ।'
আমাদের ডাবিং দ্রুত এগুতে লাগল । মফিজুল হক সাহেব খুব খুশী । প্রফেশন্যালরাও নাকি এত সুন্দর কাজ পারে না । তিনি হয়ত আমাদের খুশী করার জন্যই বললেন— আমরা খুশী হলাম এবং একই সঙ্গে উৎসাহিতও হলাম ।
মাঝে মাঝে দু' একটা লুপ আটকে যেতে লাগল । টেকের পর টেক হয়— কিছুতেই O.K হয় না । এও নাকি স্বাভাবিক । মফিজুল হকের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতি ছবিতে এ রকম কিছু লুপ থাকে— জান খারাপ করে দেয় । আমরাও বেশ কয়েকটা জান খারাপ করা লুপ পেলাম ।
এর মধ্যে একটা গাজীপুরের পুতুলের । সামান্য কথা কিন্তু সে ঠিকমত বলতে পারছে না । আটকে যাচ্ছে, ঠোঁট মিলছে না । যখন ঠোঁট মিলছে তখন অভিনয় হচ্ছে না । ভয়াবহ অবস্থা । রেগে আগুন হয়ে বললাম, এবার যদি না পার আমি তোমাকে আছাড় দেব, ফাজিল মেয়ে ।

সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মফিজুল হক।

পুতুল ভেঁউ ভেঁউ করে কেঁদে ফেলল।

'খবরদার কাঁদবে না। চোখের পানি দেখতে চাই না। চোখ মোছ।'

পুতুল চোখ মুছে মাইকের সামনে দাঁড়াল এবং ধমকের জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক প্রথম দফাতে পার হয়ে গেল।

ছবির সঙ্গে যুক্ত না থেকে আমার সবচেয়ে বেশী বকা যে মেয়েটি খেয়েছে তার নাম শাওন। তাকে আমি এনেছিলাম বদির ছোট বোনের ভূমিকায় যে মেয়েটি করছে (তিথি), তার বিকল্প হিসেবে। তিথির গলার স্বর ভাল না— ক্যান ক্যানে ভাব আছে। সাধারণ কথা বললেও মনে হয় ঝগড়া করছে (আশা করি তিথি, আমার সত্য ভাষণের জন্য কিছু মনে করবে না)। কাজেই আমি শাওনকে নিলাম। অভিনয় তিথি করলেও কণ্ঠ ধার দেবে শাওন। শাওনের গলার স্বর মিষ্টি, অভিনয়ও সে খুব ভাল জানে। আমার ধারণা ছিল তিথির অংশটা সে চমৎকার করবে।

চমৎকার করা দূরে থাক সে একেবারে বেড়াছেড়া করে ফেলল। তার ডায়ালগ সামান্যই। কাঁদতে কাঁদতে বলবে— 'ভাইয়া তুমি যে ফিরে আসবে তা তো আমি জানি।'

যখন কান্না শোনা যায় তখন ডায়ালগ শোনা যায় না, যখন ডায়ালগ শোনা যায় তখন কান্না শোনা যায় না। মফিজুল হক বললেন, হুমায়ূন ভাই এই মেয়েকে কোত্থেকে এনেছেন? একে বাদ দিন। আমাদের এখানে সুফিয়া বলে একটা মেয়ে আছে। খুবই প্রফেশন্যাল— এক টানে করে দেবে।

আমি বললাম, এতক্ষণ ধরে কষ্ট করছে, এখন একে বাদ দিলে মনে কষ্ট পাবে। মেয়েটাকে আরো কিছু সময় দেয়া যাক। নিশ্চয়ই পারবে।

শাওন শেষ পর্যন্ত পারল— সত্যিকার চোখের জল ফেলতে ফেলতেই বলল, 'ভাইয়া তুমি যে ফিরে আসবে তাতো আমি জানি'। ভালই বলল। একটা কাজের ছেলের কণ্ঠেও আমরা মেয়েটিকে ব্যবহার করলাম। ডাবিং শেষে বললাম, বকা খেয়ে কিছু মনে করনিতো?

এই প্রশ্নের উত্তরে, চোখ মুছতে মুছতে বলল, জ্বিনা কিছু মনে করিনি।
তাঁর প্রাপ্য সম্মানীর পাঁচশ টাকা সে কিছুতেই নিতে রাজি হল না। মনে হয় আমার বকাটা তাঁকে খুব আহত করেছে। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

ডাবিং এর সঙ্গে সঙ্গে সাউণ্ড এফেক্টের বিষয়গুলিও দেখা হয়। বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি পড়ার শব্দ, বাতাসের শব্দ, কড়া নাড়ার শব্দ। তরকারী রান্না হচ্ছে তার শব্দ, ব্রেক কষে মোটর গাড়ি থেমে গেল সেই শব্দ। বেশীর ভাগ শব্দই অন্যভাবে তৈরি করা হল। কড়াইয়ে তরকারী ভাজা হচ্ছে সেই শব্দ সিগারেট প্যাকেটের উপরের পাতলা পলিথিন কাগজ মুচড়ে তৈরী করা হল। এই কাজগুলি বেশির ভাগই করল মিনহাজ। জানা গেল সাউন্ড এফেক্টের ব্যাপারে সে নাকি বিশেষজ্ঞ বিশেষ। আমি তার এই প্রতিভায় মুগ্ধ হলাম, কড়াইয়ে তরকারী ভাজার সাউন্ড এফেক্ট সে যে ভাবে করল তা দেখে তাকে তাৎক্ষণিক ভাবে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিলাম।
সেদিন তার মুখের ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়ে শিল্পীরা যতটা আনন্দিত হয় মিনহাজ আমার কাছ থেকে সামান্য এক হাজার টাকা পেয়ে ততটাই আনন্দিত হয়েছে।

ডাবিং শেষে মফিজুল হক সাহেব তৃপ্ত মুখে বললেন, কাজ খুব ভাল হয়েছে। টনটনা ভয়েস। অনেকদিন এমন টনটনা ভয়েস রেকর্ড করিনি।

আমি মফিজুল হক সাহেবের কথায় তেমন গুরুত্ব দিলাম না। 'টনটনা ভয়েস' আমার মাথায় ঢুকল না। তবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণার পর অবাক হয়ে দেখলাম— মফিজুল হক সাহেবকে আগুনের পরশমণি ছবির জন্যে শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

জটিলতা সরলতা

ডাবিং শেষ হবার পর শুরু হল ছবির আবহ সংগীত যোজনা। এই কাজটি সংগীত পরিচালক ছাড়া সবার জন্যই মোটামুটি আনন্দদায়ক।

রেকর্ডিং রুমে আমরা সবাই বসে থাকি। ভুল বললাম বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকি। এসি দেয়া বিশাল ঘর। কার্পেট পাতা। আমার নির্দেশে মিনহাজ গোটাদশেক বালিশ এনেছে। বালিশে মাথা রেখে আমরা শুয়ে আছি। পর্দায় ছবি চলছে। প্রথমে আবহ সংগীত ছাড়া, তারপর আবহ সংগীত সহ। সত্য সাহা একটু পর পর জিজ্ঞেস করছেন কেমন হচ্ছে— আমি বলছি 'অসাধারণ'। না বুঝেই বলছি, সঙ্গীত কলা আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ছোটবেলায় একবার গান শেখার ইচ্ছা হয়েছিল— বাবাকে গিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিলাম, আমি গান শিখব। তিনি বিস্মিত হলেও একজন গানের শিক্ষক নিয়ে এলেন। সেই ভদ্রলোক অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমার গান শুনলেন এবং দুঃখিত ও ব্যথিত গলায় বললেন, তোমার গলায় সুর নেই এবং সুরবোধ নেই, তুমি বরং তবলা শেখ। আমার তাতেও আপত্তি ছিল না— দেখা গেল তবলার জন্যে যে তালবোধ দরকার তাও আমার নেই। 'তেরে কেটে ধিনতা' পর্যন্ত যাবার পর আমার তবলা শিক্ষক পালিয়ে গেলেন। সংগীতের মোহন জগতের দরজা আমার জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই সত্য সাহার প্রতিটি
কথায় আমার 'অসাধারণ' বলা ছাড়া উপায় কি ?

আমি রেকর্ডিং ফ্লোরে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমার পাশে অন্যরাও আছে। পরিচালক হিসেবে বিশেষ ব্যবস্থা— আমাকে একটি কোল বালিশও দেয়া হয়েছে— গল্পগুজব, হৈ চৈ হচ্ছে, হঠাৎ আমার কাছে মনে হল আমি যেন ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না।

এক ধরনের মানসিক চাপ অনুভব করছি, সেই মানসিক চাপের কারণটা স্পষ্ট হচ্ছে না। সমস্যাটা কি ? আমি কার্পেট ছেড়ে উঠে বসলাম। পর পর দু'টা সিগারেট খেলাম। সত্য সাহা বললেন, হুমায়ূন ভাই কি ব্যাপার ?
আমি বললাম, কোন ব্যাপার না।
'আপনি কি কোন কিছু নিয়ে খুব চিন্তিত ?'
'হ্যাঁ।'
'ব্যাপারটা কি ?'
ব্যাপারটা কি আমি সত্য সাহাকে বললাম না। হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা আমাকে অভিভূত করে ফেলছে। আমি সেটা নিয়েই ভাবছি। খুব অস্থির বোধ করছি। আমি বানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ছবি। সেই ছবিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে কোন না কোন ভাবে উপস্থিত করা যায় না ? মূল চিত্রনাট্যে তিনি নেই। উপন্যাসেও নেই। অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর তিন দিনের কাহিনীতে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি একটা ছবি বানাচ্ছি— সেই ছবিতে তিনি থাকবেন না ? আমার ছবি কেন বাংলাদেশ টেলিভিশন হবে ? বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিনি নিষিদ্ধ, আমার ছবিতে কেন নিষিদ্ধ হবেন ?
অনেকগুলি সমস্যা দেখা দিল।
এক· যে চিত্রনাট্যে সরকারী অনুদান পেয়েছি সেই চিত্রনাট্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই। তাঁকে নিয়ে এলে অনুদান কমিটি আমাকে ধরবে।
দুই· আমি ছবি শেষ করে ফেলেছি। এখন কোথায় তাঁকে আনব ? আনলে এমন ভাবে আনতে হবে যেন আরোপিত মনে না হয়। সেটা কি সম্ভব ?
তিন· ধরা যাক তাঁকে ভালমতই আনলাম, সেন্সর বোর্ড কি আমাকে ছাড়পত্র দেবে ? সূর্যের চেয়ে বালি সব সময় গরম থাকে। সেন্সর বোর্ড বিষয়ক বালি খুবই উত্তপ্ত থাকার কথা।
চার· এই নিয়ে পত্র পত্রিকায় বিতর্ক শুরু হলে দেখা যাবে মহান বিজয় দিবসে আমি ছবিটি মুক্তিই দিতে পারছি না। কি করা যায় ?

আমি ছবির নির্বাহী প্রযোজক মোজাম্মেল হোসেন সাহেবকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম আমি বঙ্গবন্ধুকে কোন না কোন ভাবে ছবিতে আনার পরিকল্পনা করেছি— আপনি কি বলেন ?

মোজাম্মেল সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, সর্বনাশ এই কাজটা করবেন না। নিজের মহাবিপদ নিজে ডেকে

আনবেন না।

আমি ছবির সঙ্গে যুক্ত আমার আরো কিছু ঘনিষ্ঠজনকে জিজ্ঞেস করলাম। আশ্চর্যের কথা হল সবাই বললেন, কাজটা ঠিক হবে না।

একটা কিছু আমার মাথায় ঢুকে গেলে আমি সেটাই করি। সবার আপত্তি অগ্রাহ্য করলাম। ছবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ যুক্ত হল। কি ভাবে হল বলি—

ছবিটি শুরু হচ্ছে মতিন উদ্দিন সাহেবকে দিয়ে (চিত্রনাট্য দেখুন)। মতিন সাহেব শর্টওয়েভে বিবিসি ধরার চেষ্টা করছেন। ধরতে পারছেন না। খাঁচার টিয়া পাখি তাকে বিরক্ত করছে, তার স্ত্রী সুরমা সেলাই মেশিনে সেলাই করছে। মেশিনের ঘটাং ঘটাং শব্দ তাঁকে বিরক্ত করছে। এর মধ্যেও তিনি গভীর আগ্রহে বিবিসি শোনার চেষ্টা করছেন।

আমি করলাম কি বিবিসি'র বদলে করে দিলাম স্বাধীন বাংলা বেতার। স্বাধীন বাংলা বেতারে তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বজ্রকণ্ঠ' প্রচারিত হত। ৭ই মার্চের ভাষণের এক অংশ— 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম·····। যেহেতু 'বজ্রকণ্ঠ' সে সময় প্রচারিত হত সেহেতু ব্যাপারটা মোটেই আরোপিত মনে হল না। মনে হল ছবিটি বানানোই হয়েছে এই ভাবে।

বজ্রকণ্ঠের পরপরই আমি একটা গান ব্যবহার করলাম— 'জয় বাংলা বাংলার জয়।' কোথাও ছন্দপতন হল না। বরং পুরো বিষয়টায় একটা প্রতীকীভাব চলে এল। মুক্তিযুদ্ধের একটা ছবি শুরুই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বজ্রকণ্ঠ' দিয়ে।

আমি ছবিটির দুটি ভার্সান তৈরী করলাম। একটিতে বজ্রকণ্ঠ আছে, অন্যটিতে নেই। চিত্রনাট্যে যে রকম আছে সে রকম। যদি সেন্সর থেকে পাশ করাতে না পারি তাহলে চিত্রনাট্যের ভার্সানটি ছবি ঘরে যাবে। আমি ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটা জানল— আমার সহকারী পরিচালক তারা চৌধুরী, ব্যবস্থাপক মিনহাজুর রহমান, ছবির এডিটর আতিকুর রহমান মল্লিক এবং সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মফিজুল হক। আমি 'বজ্রকণ্ঠ' আছে এই প্রিন্টটি সেন্সরে জমা দিলাম।

সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা ছবি দেখলেন। তাঁদের অনেকের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তাঁরা আমাকে বোর্ড রুমে ডেকে পাঠালেন। বোর্ডের সভাপতি বললেন, ছবি ঠিক আছে তবে কয়েকটি ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরেই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।
আমি বললাম, বিষয়গুলি বলুন।
'শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠ বাদ দিতে হবে, নগ্ন করে দুটি মানুষকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সেটা বাদ দিতে হবে, পাকিস্তানী মিলিটারী কথাটি বাদ দিতে হবে। আমরা সার্কভুক্ত দেশ, আমরা এমন কিছু করতে পারি না যা সার্কের চেতনা ক্ষুণ্ণ করে।'
'আমি কি এই বিষয়ে আমার মতামত বলতে পারি ?'
'অবশ্যই পারেন। আমরা ছবির ছাড়পত্র না দিলে আপীল বোর্ডে আপীলও করতে পারবেন।'

আমি আমার পক্ষের যুক্তি দিতে শুরু করলাম। পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি আমি মিসির আলি সাহেবের মত না পারলেও মোটামুটি ভাল যুক্তি দিতে পারি। তা ছাড়া আমি গিয়েছিলাম পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে। সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের সেই প্রস্তুতি ছিল না। ছবিটি দেখার পর পরই তাঁদেরকে যুক্তি তর্কে আসতে হয়েছে। তাঁরা চিন্তা ভাবনার সময় পাননি। সেন্সর বোর্ডের কিছু সম্মানিত সদস্য আমাকে সমর্থন করলেন। বেশ ভালভাবেই করলেন। একজনের নাম না বললেই নয়, তিনি মোস্তফা জামান আব্বাসী। আব্বাসী সাহেব আমার পেছনে শক্ত পাঁচিলের মত দাঁড়ালেন।

সেন্সর বোর্ডের বৈরী সদস্যরা সামান্য ভুল করলেন। তাঁদের হাতে একটা শক্ত যুক্তি ছিল তাঁরা সেই যুক্তি ব্যবহার করলেন না। তাঁরা বলতে পারতেন— এটি সরকারী অনুদানে নির্মিত ছবি। অনুদানের জন্যে স্ক্রীপ্ট জমা দেয়া হয়েছিল। সরকারের সঙ্গে আপনার চুক্তি হয়েছিল আপনি স্ক্রীপ্টের বাইরে যাবেন না। এই মর্মে

আগুনের পরশমণি ছবির শেষ দৃশ্যটি অন্যভাবেও নেয়া হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশের পতাকা হাতে ছুটে আসছে একদল শিশু। শেষ পর্যন্ত শিশুদের দৃশ্যটি ব্যবহার করা হয়নি। 'আকাশে অসংখ্য পাখি উড়ছে'— এই প্রতীকী ব্যবহারে ছবির সমাপ্তি টেনেছি।

আপনি চুক্তিপত্রে সই করেছেন। এখন স্ক্রীপ্টের বাইরে গিয়েছেন। তা আপনি করতে পারেন না।

এ যুক্তি যদি তাঁরা দিতেন আমি স্বীকার করে নিতাম। এবং 'বজ্রকণ্ঠ' ছাড়াই ছবিটি পাশ করিয়ে নিতাম।

আমি যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তি বিদ্যার প্রতি আমার আস্থাও প্রবল কিন্তু তাঁরা সেই যুক্তিতে না গিয়ে হাস্যকর যুক্তি দিতে লাগলেন যা ধোপে টেকে না।

শেষ পর্যন্ত 'বজ্রকণ্ঠ' সহই তাঁরা ছবির ছাড়পত্র দিলেন। মূল নাটক শুরু হল তারপর। আমি পুরো ব্যাপারটা যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করেও গোপন রাখতে পারলাম না। চারদিকে খবর ছড়িয়ে গেল। খবরটা ছড়াল ভুল ভাবে— আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ছবি থেকে কেটে বাদ দিয়েছি।

পত্রিকার ইন্টারভিউয়াররা আগুনের পরশমণির অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে গেলেন। তাঁরা আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁরা বললেন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কি ছবিতে আছে? কই আমরাতো কিছু জানি না।

আসলেই তাঁরা কিছু জানেন না। তাঁদের কিছু জানাইনি। একটা ভুল আমি করলাম, যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করলাম না। পত্রিকায় একটা ঘোষণা দিয়ে আমি তা দূর করতে পারতাম। আমার ইচ্ছে করল না। ছবিঘরে ছবি একদিন রিলিজ হবে তখনই সবাই জানবে ব্যাপারটা কি। তাছাড়া আমার একটু মনও খারাপ হল।

দৈনিক সংবাদে আমাদের দেশের একজন নামী টিভি অভিনেত্রী দীর্ঘ প্রতিবেদন ছাপলেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাদ দেয়ার জন্যে আমাকে অনেক গালাগালি করা হল। এবং সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের আহবান জানানো হল কেউ যেন আমার কোন নাটক বা সিনেমায় অভিনয় না করেন। আমাকে যেন বয়কট করা হয়।

সনদপত্র নং এল. এফ.-৭২/৯৪ তারিখ ০১-১১-৯৪ ইং

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

ঢাকা

সনদপত্র

এতদ্বারা প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে ......আগুনের পরশমনি......

নামক ছায়াছবি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের ১৯৭২ সালের ৪১ নং আদেশবলে সংশোধিত ১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশীপ আইন (১৯৬৩ সনের ১৮ নং আইন)-এর আওতাভুক্ত বাংলাদেশের সমস্ত এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে অবাধ প্রদর্শনের জন্য পাশ করা হইয়াছে।

আবেদনকারী......জনাব হুমায়ূন আহমেদ

প্রযোজক......জনাব হুমায়ূন আহমেদ

ছায়াছবির ভাষা......বাংলা

ছায়াছবির গেজ......৩৫ মিঃ মিঃ

সনদপত্র প্রদত্ত দৈর্ঘ্য......১১,২১১......ফুট/~~মিটার~~, রীল সংখ্যা......১২ (বার)

সন......১৯৯৪ ইং

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

অভিনেত্রীর প্রতিবেদন পড়লে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণযুক্ত ছবিটি অন্য কেউ বানিয়েছেন। আমি কাঁচি দিয়ে সেটা বাদ দিয়েছি।

তিনি সবাইকে আহবান জানিয়েছেন আমার কোন নাটক বা সিনেমায় অংশগ্রহণ না করার জন্যে। তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশন এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করে না। সেই বাংলাদেশ টেলিভিশন কিন্তু তিনি বয়কট করেননি। মনের আনন্দেই সেখানে অভিনয় করেছেন এবং করছেন। আমি এই অভিনেত্রীকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি সবাই যখন ঝিম ধরে ছিলেন তখন 'তুই রাজাকার' শ্লোগান এ দেশের প্রতিটি ঘরে আমি পৌঁছে দিয়েছিলাম।
তাঁকে আবারো মনে করিয়ে দিই— "লেখকদের বলা হয় জাতির আত্মা।" আমি ক্ষুদ্র লেখক হলেও এই কথাটি সব সময় মনে রাখি।

আগুনের পরশমণি ছবিটি ভুল সময়ে ভুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। ১৬ই ডিসেম্বর ছবিটি চট্টগ্রামে মুক্তি পেল না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নেই এই অজুহাতে চট্টগ্রামে যে সিনেমা হলে ছবি মুক্তির কথা ছিল সেই সিনেমা হল ভাংচুর করা হল।

এই দুঃখ আমার কোন দিন যাবার নয়।

এসো কর স্নান

আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন ছবি বানানোর গল্প বলার সময় আমি তেমন কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করছি না। যখন যা মনে আসছে গল্প করার মত বলে যাচ্ছি। আগেরটা পেছনে। পেছনেরটা আগে হয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো ভাব চলে এসেছে। অংকের মত ধাপে ধাপে এগিয়ে শেষ পর্যায়ে আসছি না। এই ভাল, সব সময় অংক কষে লাভ কি ? আসুন এখন আপনাদের বলি সেটে ছবির সর্বশেষ দৃশ্য কি ভাবে নেয়া হল। শেষ দিনের শুটিং। এ কি হল— কেমন হল।

সর্বশেষ শুটিং হল মতিন উদ্দিন সাহেবের বাড়ির উঠোনে। দৃশ্যটা এ রকম— হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। রাত্রির খুব বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে। সে উঠোনে নেমে গেল। বৃষ্টিতে ভিজছে। একা ভিজে সে তেমন আনন্দ পাচ্ছে না। ছোট বোন অপালাকেও ডাকল। অপালা টিয়াপাখির খাঁচা হাতে উঠোনে নেমে গেল। সে নিজেও স্নান করবে, টিয়া পাখিকেও স্নান করাবে। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হল কাজের মেয়ে বিন্তি। তারা মহানন্দে বৃষ্টিতে ভিজছে ব্যাকগ্রাউন্ডে গান হচ্ছে।

শেষ দৃশ্যের জন্যে যতটুকু বৃষ্টি প্রয়োজন তারচে অনেক বেশী বৃষ্টির ব্যবস্থা আমি করে রেখেছিলাম। পরিকল্পনা হল— দৃশ্য গ্রহণ শেষ হবে কিন্তু বৃষ্টিপাত থামবে না। বৃষ্টি পড়তেই থাকবে— আমি সবাইকে নিয়ে সেই বৃষ্টিতে নেমে পড়ব।

দৃশ্য গ্রহণ শেষ হল। আমি বৃষ্টিতে নেমে পড়লাম। বললাম, আসুন আপনারাও আসুন। সকলেই হতভম্ব। ভাল কাপড় চোপড়ও পরে সবাই এসেছে— বৃষ্টিতে ভিজলে উপায় হবে কি ? আমার আহবানের সাড়া জাগল না। কেউ নামল না। আমি একাই ভিজছি। সম্ভবত আমাকে একা ভিজতে দেখে আমার ছোট মেয়ে বিপাশার মায়া লাগল। সে বৃষ্টিতে নেমে এসে আমার হাত ধরল।

নেমে এলেন আমার বন্ধু আর্কিটেক্ট করিম। কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে মোজাম্মেল সাহেবকে পানিতে ফেলে দিলেন। তিনি জাপ্টে ধরে নামালেন ক্যামেরাম্যান আখতার হোসেনকে। তারপর একে একে সবাই বৃষ্টিতে নেমে এলেন। নকল বৃষ্টি আমাদের মাথায় মুষল ধারে পড়ছে। মহিলারা শুরুতে ইতস্ততঃ করছিলেন— তাঁরা তাঁদের দ্বিধা কাটিয়ে পানিতে নামলেন। আনন্দিত গলায় বলতে লাগলেন— আরো বৃষ্টি। আরো বৃষ্টি। একজন অতিথি স্যুট পরে এসেছিলেন, তিনিও পানির মুখে নেমে পড়লেন। দু'টি বড় বড় স্পীকারে গান হচ্ছে—

> এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে
> এসো কর স্নান নবধারা জলে

উঠোনে সবাই নাচতে নাচতে ভিজছে। তাদের উল্লাসে গানের কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

এক সময় আমার চোখে পানি এসে গেল। বিরাট একটা দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলাম সেই দায়িত্ব শেষ করেছি।

প্রবল বৃষ্টিতে আমার চোখের পানি কেউ দেখল না। না দেখাই ভাল।

আমার ছোট মেয়ে আমার হাত ধরে গানের তালে তালে খুব নাচছে। তার মা দাঁড়িয়ে ডাকছে বিপাশা উঠে এসো। সে উঠবে না।

আমি মুগ্ধ হয়ে আমার কন্যার নাচ দেখতে দেখতে মনে মনে বললাম—

> আমি অকৃতি অধম বলেওতো তুমি
> কম করে কিছু দাও নি।
> যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
> কেড়েওতো কিছু নাও নি।
> তব আশিষ কুসুম ধরিয়া এ শিরে
> পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে,
> তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ
> প্রতিদান কিছু চাওনি.......

শিল্পী তালিকা

নাম	চরিত্রের নাম
বিপাশা হায়াত	রাত্রি
আসাদুজ্জামান নূর	বদিউল আলম
আবুল হায়াত	মতিনউদ্দিন
ডলি জহুর	সুরমা
শীলা আহমেদ	অপালা
হোসনে আরা পুতুল	বিন্তি
মোজাম্মেল হোসেন	বদির মামা
দিলারা জামান	বদির মা
তিথি	বদির বোন
সালেহ আহমেদ	পান দোকানদার
জহির বিশ্বাস	মুক্তিযোদ্ধা
লুৎফর রহমান জর্জ	”
তুহিন	”
ইয়ামিন আজমান	”
বদরুদ্দোজা	”
ফারুক আহমেদ	অফিস কর্মচারী
ওয়ালিউল ইসলাম ভূঁইয়া	মিলিটারী কর্নেল
ডাঃ মিনার আহমেদ	অফিস সহকর্মী
অরুণ শংকর	দুধওয়ালা
শফি কামাল	নেপথ্য ঘোষক
শহীদ [illegible]	গ্যারেজ মালিক
সুবর্ণা [illegible]রা	মুক্তিযোদ্ধা তুহিনের স্ত্রী
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৪৬ ব্রিগেড	পাকিস্তানী সেনাবাহিনী

কলা-কুশলী

নির্বাহী প্রযোজক	মোজাম্মেল হোসেন
চিত্রগ্রাহক	আখতার হোসেন
সম্পাদক	আতিকুর রহমান মল্লিক
সংগীত পরিচালক	সত্য সাহা
শিল্প নির্দেশক	এস এ কিউ মইনউদ্দিন
রূপসজ্জাকর	দীপক কুমার শুর
সহকারী চিত্রগ্রাহক	আব্দুস সালাম স্বপন
সহকারী সম্পাদক	একরামুল হক
সহকারী পরিচালক	মিনহাজুর রহমান। হারুণ মেহেদী
ব্যবস্থাপক	সিদ্দিকুর রহমান। আব্দুর রহমান
বিশেষ দৃশ্য পরিচালনা	আরমান
প্রধান সহকারী পরিচালক	মুনির হাসান চৌধুরী তারা
কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	হুমায়ূন আহমেদ

আগুনের পরশমণির জয়মাল্য

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ১৯৯৪

- ☐ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ঃ (আগুনের পরশমণি)
  প্রযোজক হুমায়ূন আহমেদ
- ☐ শ্রেষ্ঠ কাহিনী ঃ হুমায়ূন আহমেদ
- ☐ শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা ঃ হুমায়ূন আহমেদ
- ☐ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ঃ বিপাশা হায়াত
- ☐ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক ঃ সত্য সাহা
- ☐ শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী ঃ শীলা আহমেদ
- ☐ শ্রেষ্ঠ শব্দ গ্রাহক ঃ মফিজুল হক
- ☐ শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার ঃ
  হোসনে আরা পুতুল

আগুনের পরশমণি
(চিত্রনাট্য)

SEQ 1

রাত। ১০ টার মত বাজে। পুরানো ঢাকার জনমানবশূন্য ফাঁকা রাস্তা। রাস্তায় সঙ্গীহীন একটি কুকুরকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলির কোন কোনটিতে বাতি জ্বলছে। কুকুরটির গায়ে হঠাৎ টর্চের কড়া চোখ-ধাঁধানো আলো এসে পড়ল। কুকুরটি ডেকে উঠল। টর্চের আলো নিভে গেল। মিলিটারী জীপে বসে থাকা কেউ টর্চের আলো ফেলেছে। আলো নিভে গেল। জীপ চলে যাচ্ছে। তার পেছনে একটি ট্রাক, তার পেছনে আরেকটি। ঘোষকের গলা শোনা যাচ্ছে।

ঘোষক

১৯৭১ সনের মে মাস। অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এই নগরীকে নিয়ে নিয়েছে তাদের হাতের মুঠোয়। তীব্র হতাশা, তীব্র ভয়ে কাটছে নগরীর মানুষদের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী। তবুও নগরবাসী স্বাধীনতা নামের আশ্চর্য স্বপ্নটি গোপনে লালন করে। তারা রাত জেগে শুনে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। শুনতে চায় আশার কোন বাণী। মতিন সাহেব এই মুহূর্তে তাই করছেন। ভয়েস অব আমেরিকা ধরতে চেষ্টা করছেন। মতিন সাহেব এবং তাঁর পরিবারকে নিয়েই আমাদের গল্প— আগুনের পরশমণি।

SEQ 2

রাত। পাকা দালানের ভেতরের অংশ। বারান্দা। ইজিচেয়ারে মতিন সাহেব শুয়ে আছেন। ভয়েস অব আমেরিকার পরিচিত বাজনা বাজছে। খবর শুরু হল—

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলছি......

বাকিটা শোনা যাচ্ছে না। বাড়ির ভেতর থেকে খট-খট- খট-খট শব্দ হচ্ছে। মতিন সাহেব বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালেন। কিছুই শোনা যাচ্ছে না— খট-খট শব্দ। তিনি কানের কাছে ট্রানজিস্টার ধরেছেন। লাভ হচ্ছে না। মতিন সাহেব বিরক্ত চোখে তাঁর শোবার ঘরের দিকে তাকালেন।

SEQ 3

রাত। ক্যামেরা চলে গেল শোবার ঘরে। দেখা যাচ্ছে মতিন সাহেবের স্ত্রী হাত-মেশিনে কি যেন সেলাই করছেন। ক্যামেরা এমনভাবে ধরা যে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। এক সময় সেলাই বন্ধ হল— কারণ, তাঁর সামনে দিয়ে ছোট মেয়ে অপালা (১০/১১) যাচ্ছে। মেয়েটা এমন ভঙ্গিতে যাচ্ছে যাতে মনে হয় তার কোন একটা মতলব আছে। সে দেয়াল ঘেঁষে, মার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে।

মা : কি ?
অপালা : কিছু না মা।

[অপালা রান্নাঘরে ঢুকে গেল]

SEQ 4

রাত। রান্নাঘর। কাজের মেয়ে বিন্তি চাল বাড়ছে। অপালা ফ্রীজ খুলে একটা ডিম নিচ্ছে।

বিন্তি : আম্মা রাগ হইব আফা।
অপালা : (মুখ ভেংচে) আম্মা রাগ হইব আফা।

অপালা ডিমটা হাতে লুকিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরুল।

SEQ 5

রাত। অপালা আবার মার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। মা সেলাই করছেন। তাকালেন। এই প্রথম মার মুখ দেখা গেল।

মা : হাতে কি ?
অপালা : কিছু না মা।

মা আবার সেলাই শুরু করেছেন।

SEQ 6

রাত। অপালাদের ঘর। অপালা ডিমের মাথাটা ভেঙ্গে একটা পিরিচের উপর কুসুম ফেলছে। সে বসেছে পড়ার টেবিলের লাগোয়া চেয়ারে। পাশের খাটে তার বড় বোন রাত্রি (২০/২১)। কুসুম ফেলতে ফেলতে একবারও তার বোনের দিকে না তাকিয়ে বলল—

অপালা : আপা, বইটা কি দুঃখের ?
রাত্রি : না।

রাত্রি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা উপন্যাস পড়ছে। পড়তে পড়তে তার চোখে পানি আসছে। সে চোখ মুছে।

অপালা ঃ দুঃখের না, তাহলে কাঁদছ কেন ?
রাত্রি ঃ কথা বলিস না তো। (রাত্রি ঘুরে গেল)

অপালা ডিমের খোসায় মানুষের মুখ আঁকছে। পাশেই রঙ-তুলি। সুন্দর একটি মেয়ের মুখের ছবি। অপালা এই প্রথম রাত্রির দিকে তাকাল। রাত্রির চোখের জল দেখে চট্ করে তুলি দিয়ে তার ডিমের খোসার মেয়েটির চোখে এক বিন্দু অশ্রু যোগ করল। পায়ের শব্দ হল। অপালা চট্ করে তোয়ালে দিয়ে ডিম, রঙ-তুলি সব ঢেকে ফেলল। মা ঢুকলেন।

মা ঃ ভাত দেয়া হয়েছে। খেতে আয়।
অপালা ঃ চল মা।

মা তোয়ালে সরিয়ে মেয়ের কাণ্ড দেখবেন। ঠাশ করে একটা চড় বসাবেন মেয়ের গালে। মা বের হয়ে যাবেন। রাত্রি বই নিয়েই খেতে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে অপালা।

SEQ 7

রাত। বারান্দায় খাবার টেবিলে বাবা দু'মেয়েকে নিয়ে খেতে বসেছেন। মা খাবার দিচ্ছেন। রাত্রি গল্পের বই সঙ্গে নিয়ে এসেছে। প্লেটের পাশে রেখে পড়ছে।

মতিন ঃ তুমি খাবে না ?

মা জবাব দিলেন না। রাত্রির সামনে থেকে গল্পের বই নিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে দেবেন। বেড়ালের গায়ে বইটা পড়ল। বিড়াল দৌড়ে পালাচ্ছে।

মতিন ঃ তাড়াতাড়ি খেয়ে বাতি নিভিয়ে দেওয়া দরকার। চারদিকে মিলিটারী ঘুরঘুর করছে। বাতি জ্বলা দেখে হঠাৎ যদি এসে পড়ে। অবশ্যি অবস্থান এখন ভিন্ন। গেরিলা ফাইটার নেমে গেছে।
রাত্রি ঃ ভয়েস অব আমেরিকা তাই বলল— ?
মতিন ঃ ইংগিতে বলেছে। বুদ্ধিমানদের জন্যে ইংগিতই যথেষ্ট।

পূর্ব-পরিচিত ভারী ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া গেল। সবাই চমকেছে। খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

বিন্তি ঃ বাতি নিভাইয়া দিমু আম্মা ?
সুরমা ঃ (তাকালেন স্বামীর দিকে)
বাবা ঃ হঠাৎ করে বাতি নেভানো ঠিক হবে না। এতে সন্দেহ আরো বাড়তে পারে।

আরো একটা ট্রাক গেল। বিক্ষিপ্তভাবে গুলির শব্দ হতে থাকল। অপালা বাবার কাছে চলে এসেছে।

মতিন ঃ এরা ভয় দেখানোর জন্যে ফাঁকা গুলি করে। আসলে কিছু না।

[বেশ কিছুক্ষণ গুলি হল]

মতিন ঃ বিন্তি, বাতি নিভিয়ে দাও।

[বিন্তি বাতি নেভাচ্ছে]

SEQ 8

রাত। ফাঁকা রাস্তা। দু'পাশের বাড়িঘরের বাতি একে একে নিভে যাচ্ছে। কুকুর ডাকছে।

SEQ 9

রাত। মা'র শোবার ঘর। হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের কাচে কাগজ দেয়া যাতে আলো কম হয়। বড় খাটে সবাই আড়াআড়ি শুয়েছে। দুই মেয়ে মাঝখানে, বাবা একদিকে, মা অন্যদিকে। বিড়ালটাও আছে। দরজায় শব্দ হল—

বিন্তি ঃ আম্মা, আম্মা।
মা ঃ কি হয়েছে ?
বিন্তি ঃ একলা শুইতে ডর লাগতাছে আম্মা।

মা ওঠে দরজা খুলবেন। মাদুর এবং বালিশ নিয়ে বিন্তি ঢুকবে। খাটের পাশে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বে। অপালা খাটে বসবে।

অপালা ঃ বাবা !
বাবা ঃ কি মা ?

অপালা ঃ ঘুম আসছে না বাবা। আমরা এইভাবে কতদিন থাকব ?

[অপালা কাঁদছে]

SEQ 10

দিন। বারান্দায় তিনটা পাখির খাঁচা। মোড়ায় দাঁড়িয়ে পাখিকে ধান খাওয়াচ্ছে রাত্রি। নিচে থালায় ধান নিয়ে অপেক্ষা করছে অপালা। পাখি কিচকিচ করছে।

SEQ 11

অফিসের পোশাকে মতিন সাহেব দাঁড়িয়ে। হাতে ফাইল। একটা ছাতা। সুরমা কোরান শরীফ নিয়ে ঢুকবেন। মতিন সাহেব কোরান **শরীফে** চুমু খাবেন।

মতিন ঃ যাই ?

দরজা খুলবেন। ইতস্তত করে বলবেন—

মতিন ঃ ইয়ে সুরমা, আমার কাছে একটা ছেলে আসবে। আমার এক বন্ধুর ছেলে। কয়েকটা দিন থাকবে। এই ধর, চার-পাঁচ দিন, এর বেশি না।

সুরমা ঃ এই সময় তোমার কাছে ছেলে আসবে ? কি বলছ তুমি ? কে আসবে ? স্পষ্ট করে বল তো।

মতিন সাহেব কিছু না বলে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছেন।

SEQ 12

দিন। মতিন সাহেব এগুচ্ছেন। রাস্তার মোড়ের একটা পান-বিড়ির দোকানে থামলেন। দোকানে পাকিস্তানী পতাকা উড়ছে। ইয়াহিয়া খানের ছবি বাঁধানো। দোকানদার পূর্ব-পরিচিত। সে সিগারেট বাড়িয়ে দিল।

দোকানী ঃ পান দিমু স্যার ?

মতিন ঃ দাও।

দোকানী ঃ কাইল মিলিটারী দুইটা মানুষ মারছে। ফালাইয়া থুইছে। হারামজাদারা ভয় দেখাইতে চায়। খয়ের দিমু স্যার ?

মতিন ঃ দাও।

দোকানী ঃ লাশ দুইটা রাস্তার হেই মাথায় আছে।

মতিন ঃ এইসব কথা বাদ দাও। দেখি চুন দেখি।

দোকানী ঃ ফাইট কিন্তু স্যার শুরু হইছে।

মতিন ঃ আহ্ চুপ কর। দেখি জর্দা।

দোকানী ঃ (জর্দা দিতে দিতে) গেরিলা নাইম্যা গেছে।

SEQ 13

দিন। রাস্তার পাশে দু'টি ডেডবডি। একটা মরা কুকুর। লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। আড় চোখে দেখছে। এমনভাবে তারা যাচ্ছে যেন কিছুই না। মতিন সাহেবও দেখলেন। থমকে দাঁড়ালেন। আবার হাঁটতে শুরু করেছেন।

SEQ 14

আকাশ অন্ধকার। মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি শুরু হল। বাড়ির ভেতরের বারান্দায় অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। রাত্রি এবং অপালাকে দেখা যাচ্ছে খাঁচা দুটি বৃষ্টির পানিতে ধরে আছে। মা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছেন।

রাত্রি ঃ মা, বৃষ্টিতে গোসল করব ?

মা জবাব দিচ্ছেন না। দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছেন। এক সময় হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির পানি হাতে নিয়ে মুখে মাখলেন। রাত্রি এবং অপালা পাখির খাঁচা হাতে বৃষ্টিতে নেমে পড়ছে। খুব মজা করছে। রাত্রি গান গাইছে—

এসো কর স্নান নব ধারা জলে
এসো নীপ বনে ছায়াবীথি তলে।

SEQ 14 B

মশলা পিষতে পিষতে বিন্তি দেখল ওরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গান করছে। সে মশলা পেষা বন্ধ করে দ্রুত রাত্রির ঘরে ঢুকে— ঠোটে লিপস্টিক মেখে আবার নিজের ঘরে চলে আসবে। আয়নায় একবার মুখ দেখে মশলা পেষা শুরু করবে। গুন গুন করে গাইছে—

এসো কর স্নান নব ধারা জলে.....

SEQ 15

দিন। মিলিটারী ট্রাক থেমে আছে। ট্রাকের উইন্ড শিল্ডে বৃষ্টি পড়ছে। উইন্ড শিল্ডের কাঁটা যখন ঘুরছে তখনই গাড়িতে বসা কালো চশমা চোখে একজন মিলিটারীকে দেখা যাচ্ছে।

SEQ 16

দিন। বৃষ্টি পড়ছে রাস্তার মোড়ে পড়ে থাকা শবদেহ এবং কুকুরটির গায়ে। জমাট রক্ত বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে।

SEQ 17

দিন। মা বারান্দায় ভেজা কাপড় শুকাতে দিচ্ছেন। দরজায় কড়া নড়ল। মা'র হাত থেকে একটা ভেজা কাপড় পড়ে গেল। বিন্তি দরজার কাছে গিয়ে বলল—

বিন্তি : কে ?
বাইরে থেকে : আমি।
বিন্তি : আমিডা কে ?

মা, রাত্রি, অপালা চলে এসেছে বসার ঘরে।

বাইরে থেকে : এটা কি মতিন সাহেবের বাড়ি ?
বিন্তি : আম্মা দরজা খুলুম ?
মা : খোল।

দরজা খুলতেই দেখা গেল কাক-ভেজা হয়ে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার গা বেয়ে পানি পড়ছে। সঙ্গে একটা কাপড়ের ব্যাগ। সেটি চুইয়েও পানি পড়ছে। ছেলেটি ঘরে ঢুকে পড়ল। নিজেই দরজা বন্ধ করল। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

ছেলে : আমার নাম বদিউল আলম।
ছেলে : আপনাদের বাড়িতে আমার কয়েকটা দিন থাকার কথা।
মা : (মেয়েদের দিকে তাকিয়ে) এই, তোমরা এখান থেকে যাও।

মেয়েরা এবং বিন্তি চলে যাবে।

মা : সত্যি কথা বল— তুমি কি মুক্তিবাহিনীর ছেলে ?
বদিউল : (কিছুক্ষণ চুপ থেকে) জ্বি।
মা : তোমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে ?
বদিউল : একটা স্টেইনগান আছে।
মা : আমাদের পক্ষে তোমাকে এ বাড়িতে রাখা সম্ভব না। আমি দু'টা মেয়ে নিয়ে থাকি।
বদিউল : আমাকে বলা হয়েছিল আপনারা খুব আগ্রহ করে আমাকে রাখবেন।
মা : ভুল বলা হয়েছিল। তুমি অন্য কোথাও যাও।

[মা দরজা খুলবেন]
[বদিউল নির্বিকার ভঙ্গিতে বেতের চেয়ারে বসল]

মা : তুমি বসলে কেন ?
বদি : বুঝতে পারছি আপনাদের সমস্যায় ফেলেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করবে তারা এই ঠিকানাই জানে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঠোঁটে একটা সিগারেট নেবে। ভেজা দেয়াশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে।

মা : আমি তোমার মা'র বয়েসী একজন মহিলা। তুমি আমার সামনে সিগারেট খাচ্ছ ?

[বদিউল সিগারেট এসট্রেতে রেখে দেবে]

মা : তুমি কি যাবে, না যাবে না ?
বদি : আমার দলের ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না। আমি কোন্ ঘরে থাকব ব্যবস্থা করে দিন। শুকনো কাপড় দিন।

আগুনের পরশমনি

প্রথম রাতের গল্প, মে মাস। সময় রাত আটটা।

Seq 1	বর্ণনা ,শব্দ ও কথোপকথন

শট ১

টপ এঙ্গেল শটে উঁচু থেকে ক্যামেরা ধরা। ফাঁকা রাস্তা। লাইট পোস্টের সামান্য আলো। গলির দু'পাশের বাড়ি ঘরের কিছু কিছু জানালা খোলা , তার আলো এসে রাস্তায় পড়েছে। একটা কুকুর রাস্তায় এসে ঢুকলো । কুকুর ক্যামেরার দিকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারী গাড়ি স্টার্টের শব্দ। হেড লাইটের আলো কুকুরের উপর এসে পড়ল। গাড়ি এগিয়ে এল ক্যামেরার ফিল্ডের ভেতর। ক্যামেরা ক্রেইন ডাউন হয়ে গাড়ির চাকার উপর স্থায়ী হল। একটার পর একটা চাকা সামনে এগুচ্ছে। ক্রেইন ডাউন এবং ঘোষকের কথা একসঙ্গে শুরু হল।

ঘোষক : ১৯৭১ সনের মে মাস। অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এই নগরীকে নিয়ে নিয়েছে তাদের হাতের মুঠোয়। তীব্র হতাশা তীব্র ভয়ে কাটছে নগরীর মানুষদের দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী। তবুও নগরবাসী স্বাধীনতা নামের আশ্চর্য স্বপ্নটি গোপনে লালন করে [illegible] রাত জেগে শুনে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, [illegible] বাংলা বেতার কেন্দ্র। শুনতে চায় আশার [illegible]। মতিন সাহেব এই মুহূর্তে তাই করছেন।

AUDIO হবে

Seq 2

[illegible] সাহেব [illegible] ইজিচেয়ারে [illegible] পাখির [illegible] দিকে [illegible] টানজিস্টার। বিবিসি [illegible] [illegible] পাখির খাঁচা। ক্যামেরা মতিন সাহেব [illegible] ,ওয়াইড এ্যাঙ্গেল। ক্যামেরা ট্রলী [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] চলছে।

ঘোষক: বিবিসি ধরতে চেষ্টা করছেন। মতিন সাহেব এবং তাঁর [illegible] নিয়েই আমাদের গল্প - 'আগুনের পরশমনি।'

জুম । মতিন সাহেবের মুখ। মুখের উপর পাখির খাঁচার ছায়া। ছায়া দুলছে। খাঁচার পাখি [illegible] ভাবে ডেকে উঠল। পাখির ডাক মতিন সাহেবের উপর ওভারল্যাপ। তিনি খাঁচার দিকে বিরক্ত মুখে তাকালেন।

[illegible] : আহ।

শট ২

ক্যামেরা লো এঙ্গেলে। মতিন সাহেব ফ্রেমের সেন্টে। লেফট ফ্রেমে পাখির খাঁচা। মতিন সাহেব খাঁচা থেকে আবার ট্রানজিস্টারের দিকে তাকালেন। টিউনিং করছেন। কানের কাছে ধরছেন। ভেতর থেকে হঠাৎ খট খট শব্দ। মতিন সাহেব অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে মাঝ ঘরের দিকে তাকালেন।

শট ৩

ROLL NO (1)

24/4/94 TK-10K

25/4/94 TK-10K

RT

15/5/94 TK-10K

STC

4/7 TK-10K

24/4/94 TK-20K

25/4/94

TK-40K

New MEG

সুরমা রাগী চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছেন। সে আরেকটি সিগারেট মুখে নিয়েছে। সুরমাকে দেখে সেটিও এসট্রেতে রেখে দেবে। সুরমা বের হয়ে যাবেন।

SEQ 18

দিন। সুরমা এসেছেন বারান্দায়। রাত্রির সঙ্গে দেখা।

রাত্রি ঃ উনি কে মা?

মা ঃ তোর বাবার বন্ধুর ছেলে।

রাত্রি ঃ এখানে থাকবেন?

মা ঃ না, এখানে কেন থাকবে?

রাত্রি ঃ তুমি রেগে যাচ্ছ কেন মা?

মা ঃ বিন্তি! বিন্তি!

[বিন্তি এল]

মা ঃ কোণার ঘরটা রেডি করে দে। এই ছেলে থাকবে।

SEQ 19

দিন। রাত্রি পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিল। বদিউলের ঠোঁটে সিগারেট। সে ভেজা দেয়াশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। বদিউল তাকাল রাত্রির দিকে।

বদি ঃ একটা দেয়াশলাই দিতে পারেন?

রাত্রি পর্দার আড়ালে মুখ সরিয়ে নিল। জবাব দিল না। বদি ভেজা দেয়াশলাই দিয়েই আবার চেষ্টা করছে।

SEQ 20

দিন। মতিন সাহেব অফিস থেকে ফিরছেন। একটা দোকানে কায়েদে আজম এবং ইয়াহিয়া খানের বাঁধানো ছবি বিক্রি হচ্ছে। তিনি পাঁচ টাকা দিয়ে একটা ছবি কিনলেন। তাঁর হাতে কিছু কলা। একটি কলা ছিঁড়ে পড়ে গেল। তিনি কলাটা তুলতে গিয়েও তুললেন না।

SEQ 21

দিন। যেখানে ডেডবডি পড়েছিল, সেই রাস্তা দিয়ে মতিন সাহেব আসছেন। আড়চোখে ঐ জায়গার দিকে তাকালেন। ডেডবডিগুলি নেই। তবে মরা কুকুরটি আছে। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। এখানেও তাঁর হাত থেকে আরেকটি কলা ছিঁড়ে পড়ে গেল। রাস্তার একটা ছেলে কলাটা তুলে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে।

SEQ 22

দিন। বারান্দা। অফিস থেকে মতিন সাহেব ফিরেছেন। ছাতা রাখলেন। জামা খুলছেন। চায়ের কাপ হাতে মা দাঁড়িয়ে আছেন। মতিন সাহেব বাজার থেকে আনা একটা কলার খোসা ছাড়াচ্ছেন। এমনভাবে ছাড়াচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে তিনিই খাবেন। দেখা গেল, কলাটা তিনি পাখির খাঁচায় দিচ্ছেন। চায়ের কাপ নিয়ে মা পিছু পিছু এলেন।

মা ঃ তোমার বন্ধুর ছেলে এসেছে। খালি হাতে আসেনি। তার সঙ্গে একটা স্টেইনগান আছে। আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে তুমি কি আরাম পাও?

মতিন ঃ না— মানে····

মা ঃ ছেলে ঘুমুচ্ছে। তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোল। তাকে বল— এক্ষুণি যেন সে অন্য কোথাও চলে যায়। তুমি কি চাও তার জন্যে আমরা সবাই মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ি? তোমার দু'টা মেয়ে আছে—

মতিন ঃ আচ্ছা বলছি। বলছি।

মা ঃ চা খাও। চা খেয়ে ছেলেকে বুঝিয়ে বল।

মতিন ঃ ঠিক বলেছ— বুঝিয়ে বলতে হবে।

[বাবা চিন্তিত ভঙ্গিতে পিরিচে ঢেলে চা খাচ্ছেন]

SEQ 23

দিন। বাবা এসে দাঁড়ালেন বদির ঘরের ভেতর। বদিকে দেখা যাচ্ছে কুণ্ডলি পাকিয়ে অসহায়ের মত শুয়ে আছে। বাবার পাশে অপালা এসে দাঁড়াল।

অপালা ঃ বাবা, এই ভদ্রলোক আসার পর থেকে ঘুমুচ্ছে। দুপুরে ভাতও খায়নি।
বাবা ঃ ক্লান্ত। অনেকদিন ঘুমায়নি।
অপালা ঃ অনেক দিন ঘুমায়নি কেন বাবা ?

বাবা জবাব দেবার আগেই টিয়াপাখি দু'টি ক্যাচক্যাচ করে উঠল। চমকে জেগে উঠল বদি। বাবাকে দেখল। মনে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না। আবার শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

SEQ 24
দিন। বাবা দেয়ালে কায়েদে আজমের বাঁধানো ছবি টানাচ্ছেন। চেয়ারের উপর মোড়া দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়েছেন। অপালা মোড়া ধরে আছে। রাত্রি দূর থেকে দেখছে। মা দেখছেন। ছবির জন্যে পেরেক পুততে গিয়ে বাবার আঙুল থেতলে গেছে। রক্ত বের হচ্ছে। রক্তের খানিকটা কায়েদে আজমের ছবিতে লেগে গেল। বাবা রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করলেন।

বাবা ঃ রাত্রি মা, ডেটল নিয়ে আয় তো।

[রাত্রি ডেটল আনতে গেল]

মা ঃ তুমি কি ছেলেটিকে চলে যেতে বলেছ ?
বাবা ঃ ঘুমুচ্ছে তো, বলতে পারিনি। কাল ভোরে বললে কেমন হয় সুরমা ?
মা ঃ কাল ভোরে তুমি বলবে ?
মতিন ঃ অবশ্যই বলব। অবশ্যই। মুক্তিবাহিনী ঘরে রেখে শেষে মারা পড়ব না-কি ?

সুরমা কঠিন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন।

SEQ 25
রাত। বদিউলের ঘর। বদি ঘুমুচ্ছে। খাবার নিয়ে বিন্তি ঢুকেছে।

বিন্তি ঃ এই যে, এই যে হুনছেন ? ভাত আনছি। রাইত মেলা হইছে।

[বদি চোখ মেলল]

বিন্তি ঃ ভাত আনছি।
বদি ঃ আমার জ্বর এসেছে। আমি কিছু খাব না।
বিন্তি ঃ থুইয়া যাই। ইচ্ছা হইলে খাইবেন। ইচ্ছা না হইলে নাই।

[খাবার নামিয়ে রাখল]

SEQ 26
রাত। বারান্দায় বাবা এবং দুই কন্যা খবর শুনছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। চরমপত্র হচ্ছে। চরমপত্রে ঢাকা নগরীতে গেরিলা তৎপরতার কথা বলা হল। বাবা দারুণ উত্তেজিত।

বাবা ঃ তোদের বলিনি— গেরিলা ফাইটিং শুরু হয়েছে। মিলিটারীগুলিকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে। টেলিফোন লাইন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই সব এরা শেষ করে দেবে। এইগুলা বাঘের বাচ্চা। সাক্ষাত আজদহা।

কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড শব্দ হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল।

বাবা ঃ কথা বলতে না বলতে ফলে গেল। দিয়েছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই শেষ করে। গুড ! ভেরি গুড।

ইলেকট্রিসিটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা আলোকিত হয়ে গেল চাঁদের আলোয়।

রাত্রি ঃ কি সুন্দর চাঁদ দেখেছ বাবা ?
বাবা ঃ স্বাধীন দেশের চাঁদ— সুন্দর হবে না ? দেশ স্বাধীন হবার বেশি বাকি নেই। হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তারপর দেখবি— চাঁদের আলোয় বসে আমরা গলা খুলে গান গাইব— চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে
রাত্রি ঃ ভুল সুরে গান গেও না বাবা। রাগ লাগে—

নিজে গান শুরু করবে—
(গান)

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো।

SEQ 27

রাত। বদিউল আলমের ঘুম ভেঙেছে। সে অবাক হয়ে গান শুনল। উঠে এলো জানালার পাশে। জানালা দিয়ে দেখছে। জোছনায় দলটি বসে আছে। গান গাইছে। দৃশ্যটি তার কাছে অদ্ভুত লাগছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই রাত্রি গান থামিয়ে দিল— খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বদিউল চলে গেল নিজের ঘরে।

বাবা : গানটা শেষ কর মা।
রাত্রি : না।

SEQ 28

রাত। খাটে সবাই আড়াআড়ি শুয়েছে। কাজের মেয়েটি শুয়েছে নিচে মেঝেতে।

অপালা : আমরা সবাই এক সঙ্গে, শুধু ঐ মানুষটা আলাদা।

বাবা হাত বাড়িয়ে ট্রানজিস্টারটা নিলেন। চালু করলেন। ঢাকা রেডিও-র জাতীয় সংগীত হচ্ছে।

পাকসার জামিন সাদ বাদ
কিসোয়ারে হাসিন সাদ বাদ
তুমিসানে আজমে আলি সান....

রাত্রি : বাবা, যন্ত্রণাটা বন্ধ কর তো।

বাবা বন্ধ করে দিলেন। হাত-পাখায় হাওয়া করছেন। গুলির শব্দ হচ্ছে। মড়মড় করে সবাই উঠে বসল।

মতিন : বাতি নিভাও না কেন?

[বাতি নিভে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল]

SEQ 29

ভোর। খাঁচার পাখিগুলি কিচকিচ করছে। খাঁচার সামনে বদিউল দাঁড়িয়ে। আগ্রহ নিয়ে পাখি দেখছে। দাঁত ব্রাশ করতে করতে আসবে অপালা।

অপালা : এগুলি কি পাখি বলুন তো?
বদিউল : টিয়া।
অপালা : হয় নি। এগুলি হচ্ছে তোতা।
বদিউল : বলুন তো, এদের মধ্যে কোনটা মেয়ে, কোনটা ছেলে।
অপালা : বলতে পারছি না।
বদিউল : যে পাখির মাথাটা লাল সেটা ছেলে। মানুষদের মধ্যে যেমন মেয়েরা সুন্দর, পাখিদের মধ্যে তেমন ছেলেরা সুন্দর।

বদিউল হাসছে। এই প্রথম হাসল। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির মাথায় হাত রাখল।

[রাত্রি বের হয়ে এল]

বদিউল : (হাসিমুখে) কেমন আছেন?

[রাত্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। কিছু বলল না]

বদিউল : কাল রাতে আপনার গান অসম্ভব ভাল লেগেছে। গান বলে যে একটা ব্যাপার আছে ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ গান শুনে ঘুম ভাঙলো— মনে হল— এটা বোধহয় সত্যি না— স্বপ্ন।
রাত্রি : শুধু শুধু এত কথা বলছেন কেন?
অপালা : আপা শুধু শুধু রেগে যায়।
বদিউল : তাই তো দেখছি।
অপালা : আমরা ক' বোন বলুন তো?

বদিউল ঃ দু'বোন।

অপালা ঃ হয়নি। তিন বোন। আমার আর আপার মাঝামাঝি একটা বোন ছিল— ও সাত বৎসর বয়সে মারা গেছে। ওর ছবি দেখবেন ?

বদিউল ঃ দেখব।

অপালা ঃ আসুন আমার সঙ্গে।

[ওরা দু'জন যাচ্ছে]

রাত্রি ঘরে ঢুকে গেল। বদিউলের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। অপালারও মন খারাপ।

SEQ 30

অপালাদের ঘরে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির সামনে বদিউল ও অপালা দাঁড়িয়ে আছে। সাত বছর বয়েসী হাসি-খুশি একটা মেয়ের ছবি। ঢুকল রাত্রি।

রাত্রি ঃ আপনি এখানে কি করছেন ? এটা আমাদের শোবার ঘর। হুট করে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন— একবার ভাবলেন না— এটা ঠিক না।

বদিউল ঃ সরি ! সরি !

[সে বের হয়ে যাবে]

অপালা ঃ আপা, আমি উনাকে নিয়ে এসেছিলাম।

রাত্রি ঃ কেন তুই ওকে নিয়ে আসবি ? কেন ?

SEQ 31

দিন। বসার ঘর। মা সুঁচ দিয়ে সোফার ছেঁড়া কাভার ঠিক করছেন। বদিউল ঢুকল। তাঁর কাছে গেল।

বদিউল ঃ আমি একটু বেরুচ্ছি। আমার খোঁজে কেউ এলে তাকে বসতে বলবেন।

মা ঃ (নিশ্চুপ)

বদিউল ঃ বুঝতে পারছি আমি খুব সমস্যার সৃষ্টি করছি। আমার দলের কোন একজনের সঙ্গে যোগাযোগ হলেই আমি চলে যাব।

মা ঃ আচ্ছা।

বদিউল ঃ এই জিনিসটা কোথাও লুকিয়ে রাখুন।

[তোয়ালে দিয়ে মোড়া স্টেইনগানটি মা'র কাছে নামিয়ে রাখবে]

বদিউল বের হয়ে গেল। মা দরজা বন্ধ করলেন। তোয়ালে দিয়ে মোড়া জিনিসটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তোয়ালে সরাবেন। একটি স্টেইনগান। মা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। রাত্রি কখন ঢুকেছে লক্ষ্যই করেন নি। রাত্রি হতভম্ব।

রাত্রি ঃ মা !

[মা চমকে তাকালেন। তোয়ালে দিয়ে ঢেকে ফেললেন]

রাত্রি ঃ এসব কি ?

[মা কিছু বলছেন না]

রাত্রি ঃ উনি কি মুক্তিবাহিনীর ছেলে ?

[মা তাকিয়ে আছেন]

রাত্রি ঃ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না মা। কি আশ্চর্য ! আমাদের বাসায় মুক্তিবাহিনীর একজন মানুষ····।

মা ঃ আস্তে কথা বল্।

রাত্রি নিচু হয়ে তোয়ালে সরাবে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে গভীর ভালবাসা ও মমতায় স্টেইনগানটির উপর হাত বুলাবে।

রাত্রি ঃ আমার খুব খারাপ লাগছে মা। আমি উনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি— আমি বুঝতে পারি নি।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। মা, মেয়ে দু'জনই চমকে উঠল। রাত্রি স্টেইনগানটি নিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে। মা ফ্যাকাশে।

মা ঃ কে ?

কোন জবাব নেই। কড়া নড়ছে।

SEQ 32

দিন। রাত্রি তাদের ঘরে। ঘর ফাঁকা। সে ছট্‌ফট্ করছে— অস্ত্রটা কোথায় লুকাবে। এক সময় শীতের জন্যে আলাদা করে রাখা লেপের ভেতর সে স্টেইনগানটি লুকিয়ে ফেলবে। তার সারা মুখে ঘামের ফোঁটা।

SEQ 33

দিন। মা নিজেই দরজা খুলেছেন। দরজার ওপাশে অপরিচিত একজন যুবক। যুবক ভেতরে ঢুকল।

যুবক ঃ বদিউল আলম কোথায় ?
মা ঃ বাসায় নেই।
যুবক ঃ আশ্চর্য ব্যাপার ! কোথায় গেল ?
মা ঃ জানি না।
যুবক ঃ তারতো কোথাও যাবার কথা না। ঘরে বসে থাকার কথা।
মা ঃ তুমি অপেক্ষা কর, ও চলে আসবে।
যুবক ঃ না, আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। তাকে কি একটা জরুরী খবর দিতে পারবেন ? অসম্ভব জরুরী— বলবেন— আজ বিকাল চারটায়।
মা ঃ তোমার নাম কি ?
যুবক ঃ (হেসে ফেলবে) আমার নাম জলিল— সবাই অবশ্যি ডাকে 'পোকা'। আমি যাই। ওকে বলবেন— আজ বিকাল চারটায়। যাই কেমন ?

যুবক কায়েদে আজমের ছবি আগ্রহ নিয়ে দেখছে।

SEQ 34

দিন। গাড়ির গ্যারাজ। গাড়ির ভেতর অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে এক বুড়ো কাজ করছে। অল্প বয়েসী একজন হেল্পার তাকে সাহায্য করছে। বদিউল আলম তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। হেল্পারটি ভীত গলায় বলল—

হেল্পার ঃ কেডা জানি আফনের কাছে আইছে।

[বুড়ো বের হয়ে এল। মনে হচ্ছে বিহারী]

বুড়ো ঃ কিয়া মাংতা ?
বদিউল ঃ পোকা কোথায় আছে জানেন ?
বুড়ো ঃ জানতে নেহি।

[আবার ভেতরে ঢুকে গেল]

বদিউল ঃ ওকে আমার খুব দরকার।

[বুড়ো আবার বেরিয়ে এল]

বুড়ো ঃ মুঝকো পাস কোই আদমীকো এড্ডেস নেহি হ্যায়— আভি নিকালো।

বদিউল চলে যাচ্ছে। বুড়ো চোখের ইশারায় হেল্পারকে বলল বদিকে ডাকতে।

হেল্পার ঃ আফনেরে ডাকে।

[বদি এগিয়ে এল]

বুড়ো ঃ আল্লাহ্‌কো পাস দোয়া ভেজ। পোকা উকা সব মিল জায়গা। হে হে হে।

[বদিউল চলে যাচ্ছে।]

SEQ 35

দিন। পুরনো ফ্ল্যাট বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে বদিউল উঠছে। অন্য একজন নামছে। সে সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে বদিউলের দিকে। বদিউল তিনতলার একটা ফ্ল্যাটে উঠে কলিংবেল টিপল। একবার, দু'বার, তিনবার। দরজা খুলছে না। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল দরজায় বিশাল এক তালা। সে তালা হাত দিয়ে স্পর্শ করে চলে যেতে ধরল। তখন বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ধমকের সুরে কেউ একজন বলল— দাঁড়া।

বদিউল বিস্মিত। সে লক্ষ্য করল তালা বন্ধ হুক খুলে যাচ্ছে। দরজা খুলল। বদিউলের মামা শরীফ সাহেব বললেন— ভেতরে আয়।

বদিউল ভেতরে ঢুকল। শরীফ সাহেব শান্ত ভঙ্গিতে দরজার হুক লাগালেন। ঘর আবার বাইরে থেকে তালাবন্ধ হয়ে গেল।

শরীফ : সালাম কর ।

[বদিউল সালাম করল]

বদিউল : কেমন আছ মামা ?

শরীফ : জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগে না ? মহাবীর বদিউল আলম কাউকে কিছু না বলে যুদ্ধে চলে গেলেন । তার মা'র কি অবস্থা, তার ভাই-বোনগুলির কি অবস্থা— তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ।

বদিউল : মা কেমন আছে ?

শরীফ : You have no right to ask this. মুক্তিবাহিনী ! দু'তিনটা বোমা ফাটালেই দেশ স্বাধীন হবে ! স্বাধীনতা এত সস্তা ! আরে গাধা, বুঝতে পারছিস না— আমেরিকা পাকিস্তানকে সাপোর্ট দিচ্ছে, চায়না দিচ্ছে। তোরা কোন আশায় স্বর্গের সিঁড়ি বানাচ্ছিস ? হাসবি না— খবরদার, হাসবি না ।

SEQ 36

দিন । শরীফ শোবার ঘরে ঢুকলেন । সোফা ও বিছানা । টেবিলের কাছে টিভি, ট্রানজিস্টার, হুইস্কির বোতল, গ্লাস ।

বদিউল : বাসা খালি কেন মামা ?

শরীফ : সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি । পাঠিয়ে টেনশান— শুনলাম ওখানে মিলিটারী পৌঁছে গেছে ।

বদিউল : টেনশানে মদ ধরেছ ?

শরীফ : হ্যাঁ ধরেছি । মদ ধরেছি, সিগারেট ধরেছি, গাঁজা থাকলে গাঁজাও ধরতাম ।

[মদ্যপান করবেন]

তোকে দেখে ভাল লাগছে রে বদি । তুই বেঁচে আছিস এটাই বড় কথা । এভাবে ফুট্‌ফাট্‌ করে কিছু হবে না । যুদ্ধ কোন আতশবাজীর খেলা না ।

সাইরেন বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে একটা এম্বুলেন্স চলে গেল । মামা বাইনোকুলার চোখে দিয়ে জানালা দিয়ে নিচে তাকাবেন । দেখা যাবে, ছোট একটা ছেলেকে পাশে নিয়ে এক ভদ্রলোক হাঁটছেন । হঠাৎ বাচ্চাটিকে তিনি কোলে তুলে নিলেন । মেশিনগান বসানো একটা ট্রাক যাচ্ছে । ভদ্রলোক বাচ্চাটিকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকলেন । বাচ্চাটি আগ্রহ নিয়ে ট্রাক দেখার চেষ্টা করছে । বাইনোকুলার নামিয়ে বলবেন—

মামা : চলে যা বদি । আমার এই ফ্ল্যাটবাড়ি খুব রিস্কি । মুক্তিবাহিনীর একটা ছেলে এখান থেকে ধরা পড়েছে । চিন্তা করিস না । তোর মা ভাল আছে । দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি ।

বদি : তাহলে যাই মামা ?

মামা : কাছে আয়, একটু আদর করে দেই ।

[বদি কাছে আসবে । মামা তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাচ্ছেন]

মামা : বয়স নেই— বয়স থাকলে তোর সঙ্গে চলে যেতাম ।

মামার চোখে পানি এসে গেছে । তিনি বদিউলের গায়ে-মাথায় হাত বুলাচ্ছেন ।

SEQ 37

দিন । রাস্তা । বদি রাস্তায় হাঁটছে— ছোট্ট একটি মিছিলের মুখোমুখি হল । মিছিলটা একটা খোলা ট্রাকে । সঙ্গে মাইক আছে । ব্যানারে লেখা আছে— ঢাকা মহানগরী শান্তি কমিটি । কয়েকটা পোস্টারে কায়েদে আজম এবং ইয়াহিয়া খানের ছবি । শ্লোগান হচ্ছে—

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

একজন রিকশাওয়ালা মিছিলটি দেখছে । ট্রাক চলে যেতেই সে থু করে মাটিতে থুতু ফেলল । তারপর রিকশা নিয়ে এগিয়ে চলল ।

SEQ 38

দিন । বদি ঘরে ঢুকছে । দরজা খুলছেন মা । মা শান্ত ভঙ্গিতে বললেন—

মা : তোমার কাছে একটা ছেলে এসেছিল । সে বলল আজ বিকাল চারটা ।

বদি তাকাল দেয়াল ঘড়ির দিকে । ঘড়িতে চারটা দশ বাজে ।

মা : এই ঘড়িটা নষ্ট । এখন বাজে দুইটা দশ ।

বদি : আপনি আমার জিনিসটা এনে দিন ।

মা ঃ কিছু খাবে না ?
বদি ঃ না।

SEQ 39
দিন। অপালা এবং রাত্রির ঘর। রাত্রি গল্পের বই পড়ছে। অপালা ছবি আঁকছে ডিমের খোসায়। রাত্রি লক্ষ্য করল, বদি বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বই হাতে উঠে দাঁড়াল। চলে এল বারান্দায়।

SEQ 40
দিন। বদি তার নিজের ঘরে। পাঞ্জাবি খুলছে— ঢুকল রাত্রি। বদি হকচকিয়ে গেল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাচ্ছে। রাত্রিও তাকিয়ে আছে।

বদি ঃ কিছু বলবেন ?

রাত্রি না-সূচক মাথা নাড়ল। বদিকে বিস্মিত করে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আবার তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকল।

রাত্রি ঃ আমি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি খুবই লজ্জিত।

[বদি হেসে ফেলল]

রাত্রি ঃ মানুষ ভুল করে, করে না ?
বদি ঃ হ্যাঁ, করে।
রাত্রি ঃ আমি কি খানিকক্ষণ বসতে পারি ?
বদি ঃ না, আমি এক্ষুণি বেরুব।
রাত্রি ঃ কোথায় যাবেন ?
বদি ঃ (জবাব দিল না।)

[মা ঢুকলেন। ট্রেতে ভাত তরকারি]

মা ঃ কিছু খেয়ে যাও। অভুক্ত অবস্থায় যাবে, তা ঠিক না।
রাত্রি ঃ মা, উনি কোথায় যাবেন ?
মা ঃ তুই ওর জিনিসটা এনে দে।

রাত্রি একটা ধাক্কা খেল। নিজেকে সামলাতে সময় লাগল। সে ঘর ছেড়ে গেল।

SEQ 41
দিন। অপালাদের ঘর। অপালা ডিমের খোসায় সুন্দর ছবি এঁকেছে। এখনো আঁকছে। রাত্রি ঘরে ঢুকল। লেপের ভেতর থেকে স্টেইনগান বের করল। খুব সাবধানে নিয়ে যাচ্ছে। অপালা নিজের মনে ছবি আঁকছে। শুধু বন্দুকটা নিয়ে বের হয়ে যাবার সময় একবার তাকাবে। আবার ছবি আঁকবে। নিজের মনে বলবে—

অপালা ঃ এরা মনে করেছে আমি কিছু জানি না। আমি আসলে সব জানি !

ডিমের খোসায় একজন মুক্তিযোদ্ধার ছবি আঁকা হয়েছে। হাতে বাংলাদেশের পতাকা !

SEQ 42
দিন। বদি বসার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মা আছেন সামনে। পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রি।

বদি ঃ যাই।

দরজার দিকে রওনা হয়েছে। মা কাছে এগিয়ে এলেন।

মা ঃ রাত্রি, কোরান শরীফটা আন্ তো মা।

রাত্রি কোরান শরীফ নিয়ে এল। মা কোরান শরীফ এগিয়ে দিলেন।

মা ঃ নাও, চুমু খাও।

বদি কোরান শরীফে চুমু খেল। মা দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন। বদি দরজা দিয়ে বেরুতে গিয়ে চৌকাঠে ধাক্কা খেল।

মা ঃ একটু বসে যাও।
বদি ঃ আরে না, বসতে হবে না।
রাত্রি ঃ প্লীজ, বসে যান। প্লীজ।

বদিউল বসল। তাকিয়ে আছে বন্ধ ঘড়ির দিকে।

বদি ঃ এখন উঠি ?

কেউ কিছু বলল না। বদি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মা এবং মেয়ে একা।

শট ৪

মিড ক্লোজ রাত্রি। হাসছে।

ওভারল্যাপে বাবার গলা।– মা যাই। সাবধানে থেকো।

রাত্রি : আমরা তো ঘরেই বসে থাকি। সাবধানে তুমি থেকো।

শট ৫

~~কমপ্লিট টু শট।~~

~~বাবা : কি আমানুল্লাহ।~~

রাত্রি : বাবা আমরা কি একটু ছাদে যেতে পারি? ঘরে বসে থেকে থেকে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

বাবা : এইতো আর মাত্র কয়েকটা দিন। দেশ স্বাধীন হলে দিন রাত ছাদে পড়ে থাকবি। কোন অসুবিধা নেই। যাই মা কেমন?

বাবা ঘর থেকে বের হলেন। ক্যামেরা তাঁকে অনুসরণ করছে। বড় মেয়ের মাথায় চুমু দিতে গেলেন।

শট ৬

বাবার পয়েন্ট অব ভিউ থেকে রাত্রি। সে রাগ করে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

রাত্রি : থাক আমার আদর লাগবে না।

ক্যামেরা বাবাকে অনুসরণ করছে। বাবা বারান্দা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। মা'র ঘরের কাছে দাঁড়ালেন।

বাবা : সুরমা আমি যাচ্ছি।

বসার ঘরে ঢুকলেন।

Seq 14

শট ১

বসার ঘরে ... শটে বাবাকে ধরা। মা ঢুকলেন।

বাবা : সুরমা আমার কাছে একটা ছেলে আসবে। কয়েক দিন থাকবে। আজই আসার কথা।

শট ২

ক্লোজ মা।

মা : এই সময় তোমার কাছে ছেলে আসবে মানে? কি বলছ তুমি? কে আসবে?

শট ৩

মায়ের পয়েন্ট অব ভিউতে বাবা।

রাত্রি ঃ আমার কেন জানি খুব খারাপ লাগছে মা। খুব খারাপ লাগছে।

SEQ 43

পানের দোকানের সামনে বদি দাঁড়িয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল।

দোকানী ঃ পান দিমু ?
বদি ঃ না।

বদি ঘড়ি দেখল।

রাস্তার শেষ মাথায় পুরানো টয়োটা গাড়ি থেমেছে। গাড়ি থেকে নেমে এসেছে জলিল। বদি হন্ হন্ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

SEQ 44

দিন। গ্যারেজে বুড়ো আছে। বদি এবং আরো চারটি ছেলে অপেক্ষা করছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। ওদের চা দেয়া হয়েছে। অতি ছোট ছোট কাপ। ঢুকল পোকা....

পোকা ঃ দেরি কইরা ফেলছি না ?

[কেউ জবাব দিল না]

পোকা ঃ পথে আসতেছি— দেখি এক জায়গায় বান্দরের খেলা। বহুত দিন বান্দরের খেলা দেখি না— ভাবলাম— মরি কি বাঁচি ঠিক নাই। বান্দরের খেলাটা দেইখ্যা যাই। ঐ পিসকি চা দে।

[চা নিয়ে বসল]

পোকা ঃ আইজ অপারেশনটা হবে কোথায় বদি ভাই কিছু ঠিক করেছেন—?
বুড়ো ঃ তুম জেয়াদা বাত করতা। জেয়াদা বাত মাত করো— শালা বুরবাক।
পোকা ঃ তুম শালা বুড়া বুরবাক— বেহারী বোলতা। ফের বেহারী বোলনেসে কল্লা কাট দেগা।
বুড়ো ঃ বেহারী সাইজ্যা আছি বইল্যা— তোমাদের আশ্রয়।
বদি ঃ নে যাওয়া যাক।
পোকা ঃ চা-টা শেষ করে নি। কে জানে এটাই হয়ত শেষ কাপ চা।

[সবাই চা শেষ করার জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই গাড়িতে উঠল। গাড়ি চালাচ্ছে বুড়ো]

SEQ 44 A

দিন। একটি একজনের দৃশ্য। গাড়ির জানালা থেকে মিলিটারী ট্রাকের উপর গুলিবর্ষণ।

SEQ 45

রাত। রান্নাঘর। মা চা বানাচ্ছেন। রাত্রি ঢুকল।

মা ঃ তোর বাবাকে চা-টা দিয়ে আয়।
রাত্রি ঃ মা,. উনি তো এখনো এলেন না। ছ'টা বেজে গেছে।

মা কিছু বললেন না। রাত্রি চায়ের কাপ নিয়ে বের হয়ে গেল।

SEQ 46

রাত। বারান্দায় বাবা চায়ের কাপ থেকে পিরিচে ঢেলে চা খাচ্ছেন। তাকিয়ে আছেন ভেতরের দিকের ঝুপড়ি গাছটার দিকে।

রাত্রি ঃ বাবা, উনি তো এখনো এলেন না।
বাবা ঃ (চুপ করে আছেন)
রাত্রি ঃ উনার কোন বিপদ হয়নি তো ?
বাবা ঃ গাছটায় কত জোনাকি দেখেছিস মা ?

দু'জন জোনাকি পোকা ভর্তি গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। জোনাকি পোকা জ্বলছে, নিভছে। কা কা করে কাক ডেকে উঠল।

রাত্রি ঃ এমন বিশ্রী করে কাক ডাকছে কেন বাবা ? আমার ভীষণ ভয় করছে।
বাবা ঃ আল্লাহ্ মালিক মা ! আল্লাহ্ মালিক !

SEQ 47

রাত। বাবা-মা, অপালা খেতে বসেছে। সবাই নীরব।

মা ঃ ছেলেটা তো এখনো এল না। আটটা বাজে। ন'টা থেকে কারফিউ।
বাবা ঃ এখনো এক ঘন্টা বাকি আছে। ইনশাআল্লাহ্ এসে পড়বে। রাত্রি খাবে না ?

মা ঃ না।
বাবা ঃ খাবে না কেন ?
অপালা ঃ আপা খুব কাঁদছে বাবা।

বাবা খাওয়া ছেড়ে উঠে গেলেন।

SEQ 48

রাত। বাবা রাত্রির ঘরে ঢুকেছেন। রাত্রি বালিশে মাথা গুঁজে খুব কাঁদছে। বাবা রাত্রির পিঠে হাত রাখলেন।

রাত্রি ঃ বাবা, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনার ভয়ংকর কোন বিপদ হয়েছে।
বাবা ঃ ওর কিছু হয় নি।
রাত্রি ঃ তুমি কেন আমাকে শুধু শুধু সান্ত্বনা দিচ্ছ। আমি জানি। উনি ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলেন। তা ছাড়া আজ দুপুরে আমি উনাকে নিয়ে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রাত্রি থেমে গেল। বাবা চমকে উঠলেন। আবার কড়া নড়ল! রাত্রি উঠে বারান্দা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

SEQ 49

রাত। বারান্দায় মা খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। খাবার টেবিলের সামনে দিয়ে রাত্রি ছুটে যাচ্ছে।

মা ঃ রাত্রি, তুই দরজা খুলবি না। খবর্দার! খবর্দার!

[রাত্রি থমকে দাঁড়াল]

SEQ 50

রাত। বসার ঘর। বাবা দরজা খুলছেন। মা পাশে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলা হল। ঘরে ঢুকল বদি। তাকাল সবার দিকে।

বাবা ঃ তুমি ভাল আছ ?
বদি ঃ আছি। অপারেশন খুব ভাল হয়েছে। এত ভাল হবে কেউ আশা করে নি।

সবাই দাঁড়িয়ে আছে। বদি এগিয়ে যাচ্ছে। পর্দার ওপাশে রাত্রি।

SEQ 51

বদি তাকাল রাত্রির দিকে। বদি এগিয়ে যাচ্ছে নিজের ঘরের দিকে। রাত্রি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বাবা এসে রাত্রির পাশে দাঁড়ালেন। রাত্রি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল—

রাত্রি ঃ আমার এত ভাল লাগছে বাবা। এত ভাল লাগছে।

SEQ 52

রাত। বদি বিছানায় শুয়ে আছে। মা ঢুকলেন।

মা ঃ তোমার খাবার কি এখন দেব ?
বদি ঃ না। রাতে আমি কিছু খাব না।
মা ঃ দুপুরেও কিছু খাও নি।
বদি ঃ (চুপ করে আছে)
মা ঃ এক গ্লাস দুধ দেই ?
বদি ঃ দিন। (উঠে বসবে)। কাল আমি চলে যাব। অন্য একটা জায়গা ঠিক হয়েছে।
মা ঃ কখন যাবে ?
বদি ঃ সকালে যাব। আগামী কালও অপারেশন হবে। অপারেশনের পর যদি বেঁচে থাকি— নতুন জায়গায় যাব।
মা ঃ তুমি ইচ্ছা করলে এখানে থাকতে পার।
বদি ঃ না। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া এক জায়গায় বেশি দিন থাকার আমাদের নিয়ম নেই।

SEQ 53

রাত। বাবা, মা, রাত্রি ও অপালা স্বাধীন বাংলা বেতারে গান শুনছে।

রাত্রি ঃ বাবা!
বাবা ঃ কি ?
রাত্রি ঃ উনাকে ডেকে নিয়ে আসি। উনি একা একা বসে আছেন।

বাবা ঃ যা মা, নিয়ে আয়। এক সঙ্গে চরমপত্র শুনি।

SEQ 54

রাত। রাত্রি বদিউলের ঘরে ঢুকল। বদিউল বালিশে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসেছিল।

রাত্রি ঃ আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার শুনছি— আপনি কি শুনবেন ?
বদি ঃ না।
রাত্রি ঃ আপনি এলে আমার খুব ভাল লাগতো।

বদি খাট থেকে নামার জন্যে পা নামিয়েছে। হঠাৎ তাকে অবাক করে দিয়ে রাত্রি পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল।

বদি ঃ এসব কি ?
রাত্রি ঃ কিছু না, এসব কিছু না।

[রাত্রি প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল]

SEQ 55

রাত। বাবা সবাইকে নিয়ে বসে আছেন। ট্রানজিস্টারটা নষ্ট হয়ে গেছে। কোন আওয়াজ দিচ্ছে না। বাবা অসম্ভব বিরক্ত। বদিউল এসে বসল।

বাবা ঃ দেখ তো, এই সময় ট্রানজিস্টারটা নষ্ট হয়ে গেল।
মা ঃ তুমি চড়-চাপড় দিয়ে এটাকে আরো নষ্ট করছ। রেখে দাও না।
বাবা ঃ কি বল ? রেখে দেব ? চরমপত্র শুনব না ?

বাবা ট্রানজিস্টার কানের কাছে নিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিলেন। ট্রানজিস্টারের একটা অংশ খুলে পড়ে গেল। সবাই হেসে উঠল।

রাত্রি ঃ ট্রানজিস্টারটা রেখে দাও তো বাবা।
অপালা ঃ আমার কেন জানি মনে হচ্ছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে।

[সবাই হেসে উঠল]

রাত্রি ঃ তোমরা সবাই চুপ কর। আমি একটা গান গাইব।

মা চমকে উঠে তাকালেন রাত্রির দিকে। তাকিয়ে আছেন।

অপালা ঃ আপা আসলে উনাকে গান শুনাতে চাচ্ছে। আমাদের না।

সবাই হঠাৎ চুপ করে যাবে। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা। বাবা নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

বাবা ঃ গাও মা। একটা গান শুনি।
রাত্রি ঃ হাছন রাজার গান গাইব বাবা ?
বাবা ঃ গাও।
রাত্রি ঃ নিশা. লাগিল রে
বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে
হাছন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিল রে।

রাত্রি গান গাইছে। জোনাকী পোকা ঝিকমিক করছে। মা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন— গান গাইতে গাইতে রাত্রি কাঁদছে।

SEQ 56

রাত। তেল দিয়ে মা রাত্রির মাথায় চুল বেঁধে দিচ্ছেন। ঘরে আর কেউ নেই।

মা ঃ রাত্রি !
রাত্রি ঃ কি মা ?
মা ঃ ভুল মানুষকে ভালবাসতে নেই মা। ভুল মানুষকে ভালবাসলে সারাজীবন কাঁদতে হয়।
রাত্রি ঃ আমাকে শুধু শুধু এসব কেন বলছ ? কাকে আমি ভালবাসলাম ?
মা ঃ তোর বুদ্ধি তো কম না মা। তোকে এসব কেন বলছি তুই ভালই জানিস।

রাত্রি মা'র দিকে ফিরল। মা'কে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ঢুকলেন বাবা। বিস্মিত হয়ে বললেন—

বাবা ঃ কি হয়েছে ?
মা ঃ কিছু হয় নি। কিছু হয় নি।

SEQ 57

রাত। রান্নাঘর। বিন্তি লিপিস্টিক দিচ্ছে ঠোটে। সামনে অপালা।

অপালা : তুই লিপিস্টিক কোথায় পেয়েছিস ? আপার লিপিস্টিক চুরি করেছিস ?
বিন্তি : (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়বে)
অপালা : আপা খুব রাগ করবে।
বিন্তি : (হাতের আয়নায় মুখ দেখল) ছোট আফা, আমারে কি সুন্দর লাগতাছে ? চুলডি লম্বা থাকলে আরো সুন্দর লাগত।

মা'র গলা শোনা যাবে— বিন্তি ! ও বিন্তি !

[বিন্তি সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট মুছে রওনা হচ্ছে]

বিন্তি : (লিপিস্টিক অপালার হাতে দিয়ে) যান আফা, বড় আফার টেবিলে থুইয়া আসেন।

SEQ 58

দিন। ভোরবেলার দৃশ্য। অপালা বারান্দায় বসে আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে পানি দিচ্ছে।

অপালা : আজ না-কি আপনি চলে যাচ্ছেন ?
বদি : (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়বে)
অপালা : আর আসবেন না ?
বদি : দেশ স্বাধীন হলে— একবার এসে তোমাদের দেখে যাব।
অপালা : আপনি যে একজন গেরিলা যোদ্ধা— সেটা কিন্তু আমি জানি।
বদি : তোমার তো অনেক বুদ্ধি।
অপালা : আমি অনেক কিছুই জানি কিন্তু ভাব করি যে কিছুই জানি না।
বদি : (হাসছে)।
অপালা : আমি খুব ভাল ছবি আঁকতে পারি।
বদি : আমার একটা ছবি এঁকে দিও।
অপালা : আপনার ছবি তো এঁকেছি।

অপালা ভেতরে চলে গেল। ডিমের খোসা নিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে বদির ছবি আঁকা।

বদি : সুন্দর হয়েছে ছবি। খুব সুন্দর।
অপালা : এটা আপনি রেখে দিন। এই ছবিটা আপনাকে আমি দিলাম।
বদি : থ্যাংক য়ু।

[বদি ডিমের খোসা পকেটে রাখল]

SEQ 59

দিন। বাবা অফিসের পোশাক পরে তৈরি হয়েছেন। বেরুলেন। মা কোরান শরীফ এনে দিলেন। বাবা কোরান শরীফে চুমু খেলেন।

মা : ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে যাও। ও আজ চলে যাবে।

[বাবা বারান্দার দিকে রওনা হলেন]

SEQ 60

দিন। বদি এবং বাবা। দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বাবা : ভাল থেক।
বদি : আপনিও ভাল থাকবেন।
বাবা : দেশ স্বাধীন হবার পর আবার যদি আস খুব খুশি হব।
বদি : আমি আসব।
বাবা : আচ্ছা যাই— ফি আমানিল্লাহ্। তুমি কখন যাবে ?
বদি : কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হব।

বাবা ঘর থেকে বের হয়ে যাবেন। আবার ফিরে আসবেন— জড়িয়ে ধরবেন ছেলেটাকে। বাবা চলে গেলেন। বদি তার ব্যাগে জিনিসপত্র গুছাচ্ছে। রাত্রি এসে দাঁড়াল।

বদি ঃ কিছু বলবেন ?
রাত্রি ঃ (না-সূচক মাথা নাড়ল) আপনি কি এক্ষুণি রওনা হবেন ?
বদি ঃ হ্যাঁ।

SEQ 61

দিন। মতিন সাহেব হেঁটে অফিসে যাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

SEQ 62

দিন। রাস্তার পাশে দু'জন মিলিশিয়া। তারা মহানন্দে হো হো করে হাসছে। তাদের সামনে চশমা-পরা ভীত চেহারার সুদর্শন একজন তরুণ। সম্পূর্ণ নগ্ন। কানে ধরে উঠ-বোস করছে। এক কোণায় তার খোলা প্যান্ট, শার্ট। মিলিশিয়ারা পাশের আরেক জনের দিকে তাকাল। ইশারা করল। সেও তার শার্ট খুলছে। মিলিশিয়ারা মজা পেয়ে খুব হাসছে। মতিন সাহেব পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। মাথা নিচু। আড়চোখে একবার দেখলেন। মিলিশিয়া দু'জনের হো হো হাসির শব্দ কানে আসছে।

SEQ 63

গাড়ির গ্যারেজ। সবাই আগের মত গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছে। ক্যাম্প খাটের উপর বুড়ো শুয়ে আছে। জ্বরে কাতর। হেল্পারটি মাথা টিপে দিচ্ছে। বদিউল উঠে এল।

বদি ঃ বুড়ো, তোমার কি হয়েছে ?
বুড়ো ঃ বিমার হো গিয়া। বহুত বিমার।
বদি ঃ গাড়ি চালাবে কে ?
পোকা ঃ আমি চালাব। গাড়ি খুব ভাল চালাতে পারি। চিন্তা করবেন না।

[বদি বুড়োর মাথায় হাত দিয়ে চমকে উঠল। অনেক জ্বর]

বদি ঃ গা তো পুড়ে যাচ্ছে। এই শোন, আমরা চলে যাবার পর তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আনবে। পারবে না ?
হেল্পার ঃ পারব।
বদি ঃ চল রওনা দেই।

SEQ 64

দিন। তারা গাড়িতে উঠল। ছোট বাচ্চাটি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছে।

পোকা ঃ কি রে, যাবি আমাদের সাথে ?
বাচ্চা ঃ (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।)

SEQ 65

গাড়ি দাঁড়াল মিলিশিয়া দু'জনের একটু দূরে। নগ্ন লোক দু'টি এখনো কানে ধরে উঠ-বোস করছে। মিলিশিয়া দু'জন হাসছে। গাড়ির দরজা খুলে গেল। গাড়িতে বসা চারজনের দল। একজন হাত ইশারা করে মিলিশিয়াদের ডাকল। ওরা খানিকটা সন্দেহে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড গুলির শব্দ। মিলিশিয়া দু'জন গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।
পথচারী, রিকশা ছুটে যাচ্ছে।
একজন ফলওয়ালা মাথায় ফলের ঝুড়ি নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। উল্টে পড়ে ফল রাস্তায় গড়িয়ে পড়েছে। গাড়ি ছুটছে তীব্র গতিতে। এম্বুলেন্স শব্দ করে আসছে। মিলিটারী ট্রাক ছুটছে।

SEQ 66

দিন। একটি পেট্রোল ট্যাংকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পেছনে আগুনের লকলকে শিখা। আগুনের সামনে বদি এবং আরো দু'জনকে দেখা যাচ্ছে। তিনজনের হাতে স্টেইনগান। অন্য একজনের হাতে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড। রাস্তার ওপাশে দোতলা বাড়ির বারান্দায় ন'-দশ বছর বয়েসী একটা মেয়ে। বদি হাতের ইশারা করছে ভেতরে চলে যেতে।
মিলিটারী ট্রাক এবং জীপ দূর থেকে ছুটে আসছে। জলিল হ্যান্ড গ্রেনেডের ক্লীপ দাঁতে খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে পুরো দৃশ্য হয়ে যাবে স্লো মোশান।
নিচের দৃশ্যগুলি দেখা যাবে।
১। পথচারীরা দৌড়ে যাচ্ছে।
২। বদি ইশারা করে মেয়েটিকে সরে যেতে বলছে।
৩। বদির সঙ্গে দু'জন স্টেইনগান হাতে যেদিকে ট্রাক আসছে সেদিকে ছুটে যাচ্ছে।
৪। গ্রেনেড ছোঁড়া হল— গ্রেনেড উড়তে উড়তে যাচ্ছে। বিস্ফোরণ। গুলির শব্দ। পাখি উড়ে যাচ্ছে।

SEQ 67

রাত। গ্যারেজে বুড়ো শুয়ে আছে। মাথায় পানি ঢালছে হেল্পার। দরজা ভেঙে দু'জন পাকিস্তানী মিলিটারী ঢুকল। বুড়ো ধড়মড় করে উঠে বসল। এরা বুড়োকে শার্টের কলার ধরে নিচে নামাল।

SEQ 68

রাত। হলঘরের মত জায়গা— ইনটারোগেশন রুম। বুড়োকে ঘরে ঢুকানো হচ্ছে। সে দেখছে, একজন মিলিটারী বসে আছে সামনে। বুড়োকে সামনে এগিয়ে দেয়া হল। সে সামনে এগিয়ে এসে দেখে, পোকা বসে আছে চেয়ারে। মারের চোটে তার মুখ ফুলে গেছে। দাঁত ভেঙে গেছে।

পোকা : মাইর সহ্য করতে পারি নাই। আপনার নাম-ঠিকানা বলে দিয়েছি। মাফ করে দিবেন।

বুড়ো : ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমারটা বলছ ভাল করছ, আর বলবা না।

মিলিটারী : You got to say more news young man.

মিলিটারীর পাশে রাখা একটা পেপার কাটার। বুড়োর আঙুল রাখা হল পেপার কাটারের ব্লেডে।
ক্যাঁচ করে নেমে এল পেপার কাটার। তীব্র আর্তনাদ। দু'টা আঙ্গুল কেটে পড়ে গেছে। মিলিটারীর ঠোঁটে সিগারেট। একজন সিগারেট ধরিয়ে দিল। কাটা আঙ্গুল দু'টা দেখা যাচ্ছে।

SEQ 69

রাত। বাবা ভাঙা ট্রানজিস্টার ঠিক করার চেষ্টা করছেন। ট্রানজিস্টার খুলে ফেলা হয়েছে। পাশে এক প্যাকেট সিগারেট এবং ম্যাচ। রাত্রি চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল।

বাবা : সিগারেটটা ধরিয়ে দে তো মা।

রাত্রি বাবার সিগারেট ধরিয়ে দিল। বাড়ির সামনে একটা বেবীটেক্সী এসে থামল। বাবা চিন্তিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন।

SEQ 70

রাত। একটা বেবীটেক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বদিকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে একজন বেবীটেক্সিওয়ালা। রক্তে তার পাঞ্জাবী ভেসে যাচ্ছে।

বেবিটেক্সিওয়ালা : এই বাড়ি ?

বদি : (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।)

বেবীটেক্সিওয়ালা দরজার কড়া নাড়ছে।

SEQ 71

রাত। বাবা দরজা খুলে দিয়েছেন। রক্তাক্ত অবস্থায় বদিকে ধরে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

লোক : স্যার, উনার গুলি লেগেছে। উনি এইখানে আনতে বলছে।

বাবা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাত্রি এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। মা এলেন। অপালা এল। অপলক তাকিয়ে আছে সবাই। হঠাৎ দেখা গেল, মা এসে জড়িয়ে ধরছেন বদিকে।

SEQ 72

রাত। অন্ধকার গলি। বাবা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছেন। পানের দোকানটা বন্ধ করে দোকানদার চলে যাচ্ছে। মতিন সাহেবকে দেখে দাঁড়াবে।

দোকানদারঃ যান কই ?

মতিন : ডাক্তার লাগবে। আমার একজন ডাক্তার লাগবে।

দোকানদারঃ এক্ষন বাড়িতে যান। কার্ফু দিয়া দিছে। শহরে বিরাট গণ্ডগোল। ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিটারী নামছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নামছে।

বাবা দাঁড়িয়ে পড়বেন। সদর রাস্তায় মিলিটারী কনভয় নেমেছে। বাবা ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফিরছেন।

SEQ 73

রাত। দরজার কাছে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে আসতে দেখে ব্যাকুল হয়ে বলল—

রাত্রি : ডাক্তার পাওয়া গেল না বাবা ?

বাবা : (না-সূচক মাথা নাড়লেন।)

বদির ঘর থেকে মা ডাকলেন—

মা : রাত্রি ! রাত্রি !

রাত্রি ক্লান্ত ভঙ্গিতে যাচ্ছে।

SEQ 74

রাত। রাত্রি বদিউলের ঘরের সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে। তার ভেতরে ঢোকার সাহস নেই।

মা : রাত্রি, রাত্রি!

রাত্রি : কি মা?

মা : ফ্রীজ থেকে বরফ নিয়ে আয়।

রাত্রি ফ্রীজ থেকে বরফ আনতে গেল।

SEQ 75

রাত। বদি বিছানায় শুয়ে আছে। তার চোখ বন্ধ। পেটে গুলি লেগেছে। মা ভাজ করে একটা শাড়ি পেটে চেপে ধরে আছেন। সেই শাড়ি রক্তে ভিজে লাল হয়ে আছে।

মা : বাবা, তুমি একটু তাকাও।

[বদি তাকাল।]

মা : মনে সাহস রাখ বাবা। যে ভাবেই হোক তোমাকে ভোর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে। ভোর হলেই ডাক্তারের ব্যবস্থা করব। শহরের সব বড় বড় ডাক্তার আমি নিয়ে আসব বাবা।

[রাত্রি বরফ নিয়ে ঢুকল]

মা : এইখানে বরফ দিয়ে চেপে ধরে থাক। রক্ত বন্ধ করতে হবে।

মা বের হয়ে যাবেন। রাত্রি তাকিয়ে আছে। তার হাতে ধরে থাকা শাদা বরফ— দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠছে।

SEQ 76

বুড়ো প্রচণ্ড মা'র খেয়েছে। তার হাত কাটারটার নিচে।

মিলিটারী : লাস্ট চান্স। কুছ বাতায়গা?

বুড়ো : হ্যাঁ বাতায়গা।

মিলিটারী : হাঁ বাতাও।

বুড়ো : You son of a bitch.

ঘ্যাচ করে কাটার নেমে এল। বুড়ো কোন শব্দ করল না। অনেক কষ্টে থু করে থুথু ফেলল।

SEQ 77

রাত। মা জায়নামাজে বসেছেন। একমনে কোরান পড়ছেন—

"ফাবিয়াইয়ে আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।"

SEQ 78

রাত। অপালার ঘর। অপালা কাঁদছে। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বিন্তি।

SEQ 79

রাত। বাবা অন্ধকার বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। আগুনের ফুলকি উঠছে, নামছে। কোরান পাঠের আওয়াজ ভেসে আসছে।

SEQ 80

রাত। বদির ঘর। বদি ছটফট করছে।

রাত্রি : খুব কষ্ট হচ্ছে?

বদি : (না-সূচক মাথা নাড়ল)

রাত্রি : ভোর হতে মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি। ভোর হোক, দেখবেন আপনার জন্যে আমরা কত ডাক্তার নিয়ে আসব।

বদি : (হেসে ফেলল) পানি খাব।

রাত্রি : মা! মা!

SEQ 81

রাত। কোরান পাঠ বন্ধ করে মা ছুটে আসছেন। তাঁর মনে হল বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

SEQ 82

রাত। মা ঢুকেছেন বদির ঘরে।

রাত্রি : চামুচে করে পানি দাও মা।

মা চামুচে করে পানি খাওয়াচ্ছেন। হঠাৎ দরজায় খট খট শব্দ। মা'র হাত থেকে চামুচ পড়ে গেল।

SEQ 83

রাত। বাবা ভয়ে ভয়ে দরজা খুললেন। দেখা গেল, একটা কুকুর চেটে চেটে রক্ত খাচ্ছে। বাবা কুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দরজা বন্ধ করে দিলেন। কুকুর ডাকছে। রাত্রি এসে দাঁড়াল।

রাত্রি : বাবা!

বাবা : (তাকালেন)

রাত্রি : রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না বাবা।

রাত্রি কাঁদছে। বাবা রাত্রিকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাবা : ভোর হতে বেশি বাকি নেই মা। ভোর হতে বেশি বাকি নেই।

বাবা তাকাচ্ছেন বন্ধ ঘড়ির দিকে। ঘড়িতে চারটা বাজে।

SEQ 84

বিন্তি মা'র কাছে গেছে। মা কোরান শরীফ পড়ছেন।

বিন্তি : আম্মা বড় রাস্তার কোণায় এক ডাক্তার সাবে আছে— আমি বাসা চিনি এক দৌড়ে নিয়া আসি?

মা : আবে না। কার্ফিউ আছে না!

বিন্তি : কেউ বুঝব না এক দৌড়ে নিয়া আমু....

বিন্তি উঠে চলে যাচ্ছে। মা পেছনে পেছনে যাচ্ছেন তিনি আটকাবার আগেই বিন্তি দরজা খুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—

SEQ 85

অন্ধকার রাস্তায় বিন্তি দৌড়াচ্ছে—

পেছনে থেকে বাবার গলা বিন্তি বিন্তি।

অন্ধকার। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। মিলিটারী জীপের শব্দ। গুলির শব্দ। বাবার পাশে অপালা।

বাবা : মা তুই ভেতরে যা। ভেতরে যা।

মেয়েকে ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে বাবা শেষ পর্যন্ত রওনা হলেন বড় রাস্তায় আসতেই দেখা গেল বিন্তি ছুটতে ছুটতে আসছে।

বিন্তি : ডাক্তার সাব নাই।

বাবা বিন্তির হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বাসায় ফিরলেন।

SEQ 86

রাত। বদির ঘর। বাবা-মা, বিন্তি এবং অপালা আছে। বাবা বদির দু'হাত ধরে বসে আছেন। মা পেটের কাছের কাপড় চেপে ধরে আছেন। অপালা পায়ের কাছে খাটে বসে আছে। তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে পানি পড়ছে।

বদি : এই মেয়েটাকে এখান থেকে সরিয়ে দিন। ও কষ্ট পাচ্ছে।

অপালা : না। আমি যাব না।

বাবা : পানি খাবে? এক চামুচ পানি মুখে দেই।

বদি : (না-সূচক মাথা নাড়ল)।

মা : খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা?

বদি : (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল)। রাত্রি রাত্রি কোথায়?

বাবা : ও একা একা বারান্দায় বসে আছে। ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভোর হলেই সে এসে তোমাকে খবর দেবে।

SEQ 87

রাত। বারান্দায় রাত্রি একা একা বসে আছে। বাতাসে তার মাথার চুল উড়ছে। পাখির খাঁচা দুলছে। গাছে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে। নিভছে।

SEQ 88

রাত। বদির ঘর।

বাবা : গায়ে অনেক জ্বর। মাথায় কি একটু পানি দেব সুরমা?

সুরমা কিছুই বলছেন না। দোয়া পড়ে ফুঁ দিচ্ছেন।

অপালা ঃ ভোর হতে আর কত দেরি বাবা ?

বদি অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাল।

SEQ 89

আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। সূর্য উঠল। আজানের শব্দ ভেসে আসছে। রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

SEQ 90

বদির ঘর। রাত্রি ঢুকেছে।

রাত্রি ঃ ভোর হয়েছে।

বদি তাকিয়েছিল। এখন [illegible]। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।

রাত্রি ঃ চোখ বন্ধ করলে হবে না। আপনাকে তাকাতে হবে। আপনাকে ভোর দেখতে হবে।

রাত্রি ছুটে গিয়ে জানালার পর্দা সরালে আলো এসে ঢুকল ঘরে।

রাত্রি ঃ আপনি তাকান— আপনি দয়া করে তাকান।

বদি তাকাল। ভোরের আলো দেখল। একটা হাত অনেক কষ্টে বাড়াল সেই ভোরের পবিত্র আলো স্পর্শ করবার জন্যে। বদির চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। পাখি ডাকছে।

SEQ 91

আকাশময় ভোরের আলো। পাখির ঝাঁক উড়ছে আকাশে।

আগুনের পরশমণি
(উপন্যাস)

এক

সারাটা সকাল উৎকণ্ঠার ভেতর কাটল। উৎকণ্ঠা এবং চাপা উদ্বেগ। মতিন সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। গেটে সামান্য শব্দ হতেই কান খাড়া করে ফেলেন, সরু গলায় বলেন, — বিন্তি দেখ তো কেউ এসেছে কি-না। বিন্তি এ বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে। তার কোন ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই, কিন্তু গেট খোলায় খুব আগ্রহ। সে বারবার যাচ্ছে এবং হাসিমুখে ফিরে আসছে। মজার সংবাদ দেয়ার ভঙ্গিতে বলছে— বাতাসে গেইট লড়ে। মানুষজন নাই। দুপুরের পর মতিন সাহেবের উদ্বেগ আরো বাড়ল। তিনি তলপেটে একটা চাপা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। এই উপসর্গটি তাঁর নতুন। কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত হলেই তলপেটে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হতে থাকে। ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার বোধ হয়। আলসার হলে কি এরকম হয়? আলসার হয়ে গেল নাকি?

মতিন সাহেব পাঞ্জাবী গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। সুরমা অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

এই একটু রাস্তায়।

রাস্তায় কি?

কিছু না। একটু হাঁটব আর কি।

তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

সুরমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। গত রাতে তাঁদের বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। সাধারণত ঝগড়ার পর তিনি কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বলেন না। আজ তার ব্যতিক্রম হল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, তুমি সকাল থেকে এ রকম করছ কেন? কারোর কি আসার কথা?

মতিন সাহেব পাংশু মুখে বললেন— আরে না, কে আসবে? এই দিনে কেউ আসে?

মতিন সাহেব স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিচু হয়ে চটি খুঁজতে লাগলেন। সুরমা বললেন, রাস্তায় হাঁটাহাঁটির কোন দরকার নেই। ঘরে বসে থাক।

যাচ্ছি না কোথাও। এই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।

গেটের বাইরে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

তিনি জবাব দিলেন না।

স্ত্রীর কথার অবাধ্য হবার ক্ষমতা তাঁর কোন কালেই ছিল না। কিন্তু আজ অবাধ্য হলেন। হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবী গায়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা ফাঁকা। তিনি পরপর দুটি সিগারেট শেষ করলেন। এর মধ্যে মাত্র একটা রিকশা গেল। সে রিকশাও ফাঁকা। অথচ কিছুদিন আগেও দুপুর বেলায় রিকশার যন্ত্রণায় হাঁটা যেত না। মতিন সাহেব রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেলেন। ইদ্রিস মিয়ার পানের দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইদ্রিস মিয়া শুকনো গলায় বলল, স্যার ভাল আছেন?

তিনি মাথা নাড়লেন। যার অর্থ হ্যাঁ। কিন্তু মুখের ভাবে তা মনে হল না। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভাল নেই।

বিক্রিবাটা কেমন ইদ্রিস?

আর বিক্রি। কিনব কে কন? কিনার মানুষ আছে?

দেখি একটা পান দাও।

মতিন সাহেবের এখনো দুপুরে খাওয়া হয় নি। এক্ষুণি গিয়ে ভাত নিয়ে বসতে হবে। পান খাওয়ার কোন মানে হয় না। কিন্তু একটা দোকানের সামনে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এখন সময় খারাপ। আচার-আচরণে কোন রকম সন্দেহের ছাপ থাকা ঠিক না।

জর্দা দিমু?

দাও।

ইদ্রিস নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে পান সাজাতে লাগল। তার মাথায় ঝুঁটিবিহীন একটা লাল ফেজ টুপি। কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে বললেন— দাড়ি রাখছ নাকি ইদ্রিস? ইদ্রিস জবাব দিল না।

দাড়ি রেখেই ভাল করেছ। যে দিকে বাতাস সেই দিকে পাল তুলতে হয়। পান কত?

দেন যা ইচ্ছা।

ইদ্রিসের গলার স্বরে স্পষ্ট বৈরাগ্য। যেন পানের দাম না দিলেও তার কিছু আসে যায় না। মতিন সাহেব একটা সিকি ফেলে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। নিউ পল্টন লাইনের এই গলিটায় বেশ কয়েকটি দোকান।

কিন্তু মডার্ন সেলুন এবং পাশের ঘরটি ছাড়া সবই বন্ধ। তিনি মডার্ন সেলুনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করবার চেয়ে সেলুনে চুল কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা ভাল। সেলুনটা এক সময় মস্তান ছেলেপুলেদের আড্ডাখানা ছিল। লম্বা চুলের চার-পাঁচটা ছেলে শার্টের বুকের বোতাম খুলে বেঞ্চির উপর বসে থাকত। সেলুনের একটা এক ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টার সারাক্ষণই বাজত। ট্রানজিস্টারের ব্যাটারির খরচ দিতে গিয়েই সেলুনের লাটে উঠার কথা। কিন্তু তা উঠে নি। রমরমা ব্যবসা করেছে। আজ অবশ্যি জনশূন্য। তবে ট্রানজিস্টার বাজছে। আগের মত ফুল ভল্যুমে নয়। মৃদু শব্দে। দেশাত্মবোধক গান। কথা ও সুর নজিবুল হক। মতিন সাহেব বেশ মন দিয়েই গান শুনতে লাগলেন। তবে চোখ রাখলেন রাস্তার উপর।

চুলটা একটু ছোট কর।

নাপিত ছেলেটি বিস্মিত হল। সে ইনার চুল গত বুধবারেই কেটেছে। আজ আরেক বুধবার। এক সপ্তাহে চুল বাড়ে দুই সুতা। তার জন্যে কেউ চুল কাটাতে আসে না।

স্যার চুল কাটাবেন?

হুঁ। পিছনের দিকে একটু ছোট কর।

নাপিতের কাঁচি যন্ত্রের মত খটখট করতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন— দেশের হালচাল কি?

ভালই।

চুল কাটতে এলে এই ছোকরার কথার যন্ত্রণায় অস্থির হতে হয়। কথা শুনতে তাঁর খারাপ লাগে না। কিন্তু এই ছোকরা কথা বলার সময় থুথুর ছিটা এসে লাগে। আজ সে নিশ্চুপ। থুথু গায়ে লাগার কোন আশংকা নেই।

দাম দেবার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাতদিন ট্রানজিস্টার চালাও কিভাবে? ব্যাটারির তো মেলা দাম। নাপিত ছোকরা জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে টাকা ফেরত দিয়ে বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে রইল। মতিন সাহেব বললেন, আজ কার্ফু ক'টা থেকে জান নাকি?

জানি, ছয়টায়।

এক ঘন্টা পিছিয়ে দিল, ব্যাপারটা কি?

ঝামেলা নাই। গণ্ডগোল নাই। কার্ফুও নাই।

তা তো ঠিকই। এখন হয়েছে ছ'টা, তারপর হবে সাতটা, আটটা; কি— বল?

তিনি কোন উত্তর পেলেন না। ছেলেটা শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে। আজকাল কেউ বাড়তি কথা বলতে চায় না। চেনা মানুষদের কাছেও না।

রোদ উঠেছে কড়া এবং ঝাঁঝাল। কিন্তু এই কড়া রোদেও তাঁর কেমন শীত শীত করতে লাগল। তিনি ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে দ্বিতীয়বার এসে দাঁড়ালেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন ঘরে যথেষ্ট সিগারেট আছে কিনা। পাঁচটার পর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। গত সোমবারে সিগারেটের অভাবে খুব কষ্ট করেছেন। রাত ন'টার সময় বিন্তি এসে বলল, সিগারেটের প্যাকেট খুঁইজ্যা পাই না। কি সর্বনাশ! বলে কি! তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গেল। অমানিশি কাটবে কিভাবে? এটা ফ্ল্যাট বাড়ি না। ফ্ল্যাট বাড়ি হলে অন্যদের কাছে খোঁজ করা যেত। তবু তিনি রাত দশটার সময় পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির উকিল সাহেবকে চিকন সুরে ডাকতে লাগলেন— ফরিদউদ্দিন সাহেব, সিগারেট আছে? সুরমা এসে তাঁকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলেন। রেগে আগুন হয়ে বললেন, মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? একটা রাত সিগারেট না ফুঁকলে কী হয়?

মতিন সাহেব মানিব্যাগ খুললেন। ইদ্রিস মিয়া তার দোকানে আগরবাতি জ্বালিয়েছে। সব দোকানদারের মধ্যে এই একটি নতুন অভ্যাস দেখা যাচ্ছে। আগরবাতি জ্বালান। আগে কেউ কেউ সন্ধ্যাবেলা জ্বালাত। এখন প্রায় সারাদিনই জ্বলে। আগরবাতির গন্ধ মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। মতিনউদ্দিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ইদ্রিস, দুই প্যাকেট ক্যাপস্টান দাও।

ইদ্রিস সিগারেট বের করল। দাম এক টাকা করে বেশি নিল। সিগারেটের দাম চড়ছে। ছেলে-ছোকরারা এখন সারাদিন ঘরে বসে থাকে এবং সিগারেট ফুঁকে। এছাড়া আর কি করবে?

দু'টা ম্যাচও দাও।

ইদ্রিস মিয়া ম্যাচ দিতে দিতে বলল, আফনে কাউরে খুঁজতেছেন?

তিনি চমকে উঠলেন। বলে কি এই ব্যাটা? টের পেল কিভাবে?

কারে খুঁজেন ?

আরে না, কাকে খুঁজব ? চুল কাটাতে গিয়েছিলাম। চুল একটু বড় হলেই আমার অসহ্য লাগে।

তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। গোরস্থান ঘেঁষে রাস্তা গিয়েছে। সেই জন্যই কি গা ছম ছম করে ? না অন্য কোন কারণ আছে ? একটা কটু গন্ধ আসছে। নিউ পল্টন লাইনের লোকজনদের ধারণা, বর্ষাকালে এই গন্ধ পাওয়া যায়। লাশ পচে গন্ধ ছড়ায়। এখন বর্ষাকাল। গোরস্থানের পাশে বাড়ি ভাড়া নেয়াটা ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল।

বিন্তি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মতিন সাহেবকে দেখে সে দাঁত বের করে হাসল। এই মেয়েটার হাসি-রোগ আছে। যখন-তখন যার-তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। অভদ্রের চূড়ান্ত। কড়া ধমক দিতে হয়। তিনি ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। সোজা ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন।

সুরমাও বসেছেন। কিন্তু তিনি কিছু খাচ্ছেন না। ঝগড়া-টগড়ার পর তিনি খাওয়া-দাওয়া আলাদা করেন। মাঝে মাঝে করেনও না। মতিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন, আজ কার্ফু ছয়টা থেকে। সুরমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, তাকে কি ?

না কিছু না। এম্নি বললাম। কথার কথা।

আজ অফিসে গেলে না কেন ?

শরীরটা ভাল না।

একটা সত্যি কথা বল তো, কেউ কি আসবে ?

তিনি বিষম খেলেন। পানি-টানি খেয়ে ঠাণ্ডা হতে তাঁর সময় লাগল। সুরমা তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ কঠিন। মতিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এক সময়ে সুরমার এই মুখ খুব কোমল ছিল। কথায় কথায় রাগ করে কেঁদে ভাসাত। একবার তাঁকে এক সপ্তাহের জন্যে রাজশাহী যেতে হবে। সুরমা গম্ভীর হয়ে আছে। কথাটথা বলছে না। রওনা হবার আগে আগে এমন কান্না! মতিন সাহেব বড় লজ্জার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি ভর্তি লোকজন। এদের মধ্যে মেজো ভাবীও আছেন। মেজো ভাবীর মুখ খুব আলগা। তিনি নিচু গলায় বাজে ধরনের একটা রসিকতা করলেন। কি অস্বস্তি। পঁচিশ বছর খুব কি দীর্ঘ সময় ? এই সময়ের মধ্যে একটি কোমল মুখ চিরদিনের জন্যে কঠিন হয়ে যায় ?

কি, কথা বলছ না কেন ?

কি বলব ?

কারোর কি আসার কথা ?

আরে না, কে আসবে ?

সত্যি করে বল।

মতিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, ইয়ে আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়।

কে সে ?

তুমি চিনবে না।

তোমার আত্মীয় আর আমি চিনব না— কি বলছ এ সব ?

দেখা-সাক্ষাৎ নেই তো। আমি নিজেই ভাল করে চিনি না।

তুমি নিজেও চেন না ?

সুরমার কপালে ভাঁজ পড়ল। মতিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, দুই এক দিন থাকবে। তারপর চলে যাবে। নাও আসতে পারে। ঠিক নাই কিছু। না আসারই সম্ভাবনা।

সে করে কি ?

জানি না।

জানি না মানে ?

বললাম তো আমি নিজেও চিনি না ভাল করে। যোগাযোগ নেই।

মতিন সাহেব উঠে পড়লেন। সাধারণত ছুটির দিনগুলিতে তিনি খাওয়া-দাওয়ার পর গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ ছুটির দিন নয়। কিন্তু তিনি অফিসে যান নি। কাজেই দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ধরা যেতে পারে। তাঁর উচিত একটা বই নিয়ে বিছানায় চলে যাওয়া। তিনি তা করলেন না। বই হাতে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলেন। চোখ রাস্তার দিকে।

দিনের আলো আসছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। পর পর কয়েকদিন খটখটে রোদ গিয়েছে। এখন আবার কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টি হবার কথা। বাড়ির ভেতরে সুরমা বসেছে তার সেলাই মেশিন নিয়ে। বিশ্রী ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। মতিন সাহেবের ঘুম পেয়ে গেল। হাতে ধরে থাকা বইটির লেখাগুলি ঝাপসা হয়ে উঠেছে। ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। রোদ নেই একেবারেই। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি হবে, জোর বৃষ্টি হবে। তিনি বই বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালেন। বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান। সুরমা ক্রমাগতই খটখট করে যাচ্ছে। কিসের তার এত সেলাই ? আচ্ছা ছেলেবেলায় সুরমা কেমন ছিল ? প্রতিটি মানুষ একেক বয়সে একেক রকম। যৌবনে সুরমা কত মায়াবতী ছিল। বর্ষার রাতগুলি তাঁরা গল্প করে পার করে দিতেন। একবার খুব বর্ষা হল। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট এসে বিছানা ভিজিয়ে একাকার করেছে তবু তাঁরা জানালা বন্ধ করলেন না। ভেজা বিছানায় শুয়ে রইলেন। হাওয়া এসে বারবার মশারিকে নৌকার পালের মত ফুলিয়ে দিতে লাগল। কত গভীর আনন্দেই না কেটেছে তাঁদের যৌবন। মতিন সাহেব কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক অন্ধকার। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। দমকা বাতাস দিচ্ছে। তিনি খোঁজ নিলেন— কেউ এসেছে কি-না। কেউ আসেনি। কার্ফু শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এখন আর আসার সময় নেই। কাল কি আসবে ? বোধহয় না। শুধু শুধুই অপেক্ষা করা হল। তিনি শোবার ঘরে উঁকি দিলেন। সুরমা ঘুমুচ্ছে। একটা সাদা চাদরে তার শরীর ঢাকা। তাকে কেমন অসহায় দেখাচ্ছে। মতিন সাহেব কোমল গলায় ডাকলেন, সুরমা সুরমা। সুরমা পাশ ফিরলেন।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচ বাজে। কার্ফু শুরু হতে এখনো আধ ঘন্টা বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই চারদিক জনশূন্য। লোকজন যার যার বাড়ি ফিরে গেছে। বাকি রাতটায় আর ঘর থেকে বেরুবে না। ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। রোজ শেষ মুহূর্তে কিছু বিক্রিবাটা হয়। আজ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না কে জানে ? অন্ধকার দেখে সবাই ভাবছে বোধ হয় কার্ফুর সময় হয়ে গেছে। সময় না হলেও কিছু যায় আসে না। আজকাল সবাই অন্ধকারকে ভয় পায়। ইদ্রিস মিয়া দোকানের তালা লাগাবার সময় লক্ষ্য করল গলির ভেতরে লম্বা একটি ছেলে ঢুকছে। তার হাতে কয়েকটা পত্রিকা। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাসার নম্বর পড়তে পড়তে আসছে। ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ইদ্রিস মিয়া বলল, আপনে কি মতিন সাহেবের বাড়ি খুঁজছেন ?

ছেলেটি তাকাল বিস্মিত হয়ে। কিছু বলল না। ইদ্রিস বাড়ি দেখিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, লোহার গেইট আছে। গেইটের কাছে একটা নারকেল গাছ। তাড়াতাড়ি যান। ছ'টার সময় কার্ফু।

ইদ্রিস মিয়া হনহন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পিছনে ফিরে তাকাল না। ছেলেটি তাকিয়ে রইল ইদ্রিস মিয়ার দিকে। লোকটি ছোটখাট। প্রায় দৌড়াচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি দূরে থাকে। ছ'টার আগে তাকে পৌঁছতে হবে।

ছেলেটি এগিয়ে গেল। লোহার গেইটের বাড়িটির সামনে দাঁড়াল। নারকেল গাছ দু'টি ঝুঁকে আছে রাস্তার দিকে। প্রচুর নারকেল হয়েছে। ফলের ভারে যেন গাছ হেলে আছে। দেখতে বড় ভাল লাগে। ছেলেটি গেটে টোকা দিয়ে ভারী গলায় ডাকল, মতিন সাহেব, মতিনউদ্দিন সাহেব। বয়সের তুলনায় তার গলা ভারী। ছেলেটির নাম বদিউল আলম। তিন মাস পর সে এই প্রথম ঢুকেছে ঢাকা শহরে।

জুলাই মাসের ছ' তারিখ। বুধবার। উনিশ শো একাত্তর সন। একটি ভয়াবহ বছর। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর কঠিন মুঠির ভেতরে একটি অসহায় শহর। শহরের অসহায় মানুষ। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। সীমাহীন ক্লান্তি। দীর্ঘ দিবস এবং দীর্ঘ রজনী।

বদিউল আলম গেট ধরে দাঁড়িয়েছে। সে শহরে ঢুকেছে সাতজনের একটি ছোট্ট দল নিয়ে। শহরে গেরিলা অপারেশন চালানোর দায়িত্ব তার। ছেলেটি রোগা। চশমায় ঢাকা বড় বড় চোখ। গায়ে হালকা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট। সে একটি রুমাল বের করে কপাল মুছে দ্বিতীয়বার ডাকল, মতিন সাহেব ! মতিন সাহেব !

মতিন সাহেব দরজা খুলে বের হলেন। দীর্ঘ সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। এ তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে ! এরই কি আসার কথা ?

আমার নাম বদিউল আলম।

আস বাবা, ভেতরে আস।

এই সামান্য কথা বলতে গিয়ে মতিন সাহেবের গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। এত আনন্দ হচ্ছে! তিনি চাপা স্বরে বললেন, কেমন আছ তুমি?

ভাল আছি।

সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই?

না।

বল কি!

সুরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছেন। মতিন সাহেব বললেন, আস, ভেতরে আস। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

গেটটা বন্ধ। গেট খুলুন।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

মতিন সাহেব সংকুচিত হয়ে পড়লেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে গেটে তালা দিয়ে দেয়া হয়।

চাবি থাকে সুরমার কাছে। সুরমা আঁচল থেকে চাবি বের করলেন। গেটে তালা দিয়ে রাখি। আগে দিতাম না। এখন দেই। অবশ্যি চুরি-ডাকাতির ভয়ে না। চুরি-ডাকাতি কমে গেছে। চোর-ডাকাতরা এখন কিভাবে বেঁচে আছে কে জানে। বোধ হয় কষ্টে আছে।

বদিউল আলম বসবার ঘরে ঢুকল। মতিন সাহেবের মনে হল এই ছেলেটির কোন দিকেই কোন উৎসাহ নেই। সোফাতে বসে আছে কিন্তু কোন কিছু দেখছে না। বসার ভঙ্গির মধ্যেই গা-ছেড়ে-দেয়া ভাব আছে। মতিন সাহেব নিজের মনের কথা বলে যেতে লাগলেন,

কয়েকদিন ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী আছি এই বাড়িতে। আমাদের দুই মেয়ে আছে— রাত্রি আর অপালা। ওরা তার ফুফুর বাড়িতে। সোমবার আসবে। ওদের ফুফু, মানে আমার বোনের কোন ছেলেপুলে নেই। মাঝে-মধ্যে রাত্রি আর অপালাকে নিয়ে যায়। ওরাও তাদের ফুফুর খুব ভক্ত। খুবই ভক্ত।

বদিউল আলম কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। মতিন সাহেব খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন— অবস্থা কি বল শুনি।

কিসের অবস্থা?

তোমরা যেখানে ছিলে সেখানকার অবস্থা।

ভালই।

আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাঘের পেটের ভেতর আছি। কাজেই বাঘটা কি করছে না করছে বোঝার উপায় নেই। বাঘ মারা না পড়া পর্যন্ত কিছুই বুঝব না। মারা পড়ার পরই পেট থেকে বের হব।

মতিন সাহেবের এটা একটা প্রিয় ডায়ালগ। সুযোগ পেলেই এটা ব্যবহার করেন। শ্রোতারা তখন বেশ উৎসাহী হয়ে তাকায়। কয়েকজন বলেই ফেলে— ভাল বলেছেন। কিন্তু এবারে সে রকম কিছু হল না। মতিন সাহেবের ভয় হল ছেলেটা হয়ত শুনছেই না।

তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস। চায়ের ব্যবস্থা করছি।

চা খাব না। ভাতের ব্যবস্থা করুন, যদি অসুবিধা না হয়।

না না, অসুবিধা কিসের, কোন অসুবিধা নেই। খাবার-টাবার গরম করতে বলে দেই।

গরম করবার দরকার নেই। যেমন আছে দিন।

মতিন সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলেন। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বকবক করছিলেন। খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির প্রসঙ্গে সুরমা কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যেন দেখবার পর তাঁর সব কৌতূহল মিটে গেছে। ভাত খাওয়ার সময় নিজেই দু'একটা বললেন। যেমন একবার বললেন, তুমি মনে হচ্ছে ঝাল কম খাও। ছেলেটি তার জবাবে অন্য এক রকম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয়বারে বললেন, ছোট মাছ তুমি খেতে পারছ না দেখি। আস্তে আস্তে খাও, আমি একটা ডিম ভেজে নিয়ে আসি।

ছেলেটি এই কথায় খাওয়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল। ভাজা ডিমের জন্য প্রতীক্ষা। ব্যাপারটা মতিন সাহেবের বেশ মজার মনে হল। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে সবাই বলে— না না লাগবে না। লাগবে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বদিউল আলম বলল, আমাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিন। মতিন সাহেব

বললেন, এখুনি শোবে কি ? বস, কথাবার্তা বলি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবে না ?
জ্বি না। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবার আমার কোন আগ্রহ নেই।
বল কি তুমি ! কখনো শোন না ?
শুনেছি মাঝে মাঝে।
তিনি খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন। ছেলেটি স্বাধীন বাংলা বেতার শুনে না সে কারণে নয়। ক্ষুণ্ণ হলেন কারণ খাওয়া শেষ করেই সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বলতে গেলে এ তার ছেলের বয়েসী। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সামনে এ রকম ফট করে সিগারেট ধরান ঠিক না। তা ছাড়া ছেলেটি দু'বার কথার মধ্যে তাঁকে বলেছে মতিন সাহেব। এ কি কাণ্ড ! চাচা বলবে। যদি বলতে খারাপই লাগে কিছু বলবে না। কিন্তু মতিন সাহেব বলবে কেন ? তিনি কি তা ইয়ার দোস্তদের কেউ ? এ কেমন ব্যবহার ?
ঘর ঠিকঠাক করলেন সুরমা। রাত্রি ও অপালার পাশের ছোট ঘরটায় ব্যবস্থা হল। বিন্তির ঘর। বিন্তি ঘুমুবে বারান্দায়। এ ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার করতে সময় লাগল। তবু পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। চৌকির নিচে রসুন ও পেঁয়াজ। বস্তায় ভর্তি চাল-ডাল। এসব থেকে কেমন একটা টকটক গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুরমা বললেন, তুমি এ ঘরে ঘুমুতে পারবে তো ? না পারলে বল আমি বসার ঘরে ব্যবস্থা করে দেই। একটা ক্যাম্প খাট আছে। পেতে দিব।
লাগবে না।
বাথরুম কোথায় দেখে যাও।
বদিউল আলম বাথরুম দেখে এল।
কোন কিছুর দরকার হলে আমাকে ডাকবে।
আমার কোন কিছুর দরকার হবে না।
সুরমা চৌকির এক প্রান্তে বসলেন। বসার ভঙ্গিটা কঠিন। বদিউল আলম কৌতূহলী হয়ে তাঁকে দেখল।
আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান ?
হ্যাঁ।
বলুন।
তুমি কে আমি জানি না। কোত্থেকে এসেছ তাও জানি না। কিন্তু কি জন্যে এসেছ তা আন্দাজ করতে পারি।
আন্দাজ করবার দরকার নেই। আমি বলছি কি জন্যে এসেছি। আপনাকে বলতে আমার কোন অসুবিধা নেই।
তোমার কিছু বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে কি বলছি সেটা মন দিয়ে শোন।
বলুন।
তুমি সকালে উঠে এখান থেকে চলে যাবে।
ছেলেটি কিছু বলল না। তাঁর দিকে তাকালও না।
দুটি মেয়ে নিয়ে আমি এখানে থাকি। কোন রকম ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। রাত্রির বাবা আমাকে না জিজ্ঞেস করে এসব করেছে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাচ্ছি ?
পারছি।
তুমি কাল সকালে চলে যাবে।
কাল সকালে যাওয়া সম্ভব না। সব কিছু আগে থেকে ঠিকঠাক করা। মাঝখান থেকে হুট করে কিছু বদলান যাবে না। আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকব। আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করবে তারা এই ঠিকানাই জানে।
সুরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কি রকম উদ্ধত ভঙ্গিতে সে কথা বলছে। এ কি কাণ্ড ! তোমার জন্যে আমি আমার মেয়েগুলিকে নিয়ে বিপদে পড়ব ? এসব তুমি কি বলছ ?
বিপদে পড়বেন কেন ? বিপদে পড়বেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর পরের বার আমি এখানে উঠব না। আর আপনার মেয়েরা তাদের ফুফুর বাড়িতে থাকুক। এক সপ্তাহ পর আসবে।
তুমি থাকবেই ?
হ্যাঁ। অবশ্যি আপনি যদি ভয় দেখান আমাকে ধরিয়ে দেবেন, সেটা অন্য কথা। তা দেবেন না সেটা

বুঝতে পারছি।

সুরমা উঠে দাঁড়ালেন। যে ছেলেটিকে এতক্ষণ লাজুক এবং বিনীত মনে হচ্ছিল এখন তাকে দুর্বিনীত অভদ্র একটি ছেলের মত লাগছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির এই রূপটিই তার ভাল লাগল। কেন লাগল তিনি বুঝতে পারলেন না।

আলম।

বলুন।

ঢাকা শহরে কি তোমার বাবা-মা'রা থাকেন ?

হ্যাঁ থাকেন।

কোথায় থাকেন ?

শহরেই থাকেন।

বলতে কি তোমার অসুবিধা আছে ?

হ্যাঁ আছে।

তুমি এক সপ্তাহ থাকবে ?

হ্যাঁ।

সুরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ঘন অন্ধকারে নগরী ডুবে গেল। ঝুম বৃষ্টি নামল। সুরমা লক্ষ্য করলেন ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। লাল আগুনের ফুলকি উঠানামা করছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে বসে আছেন। 'চরমপত্র' শোনা যাচ্ছে। এটি তাঁকে দেখে যে-কেউ বলে দিতে পারবে। তিনি তীব্র কণ্ঠে কিছুক্ষণ পরপরই বলছেন, 'মার লেংগী। 'মার লেংগী' শব্দটি তার নিজের তৈরি করা। একমাত্র 'চরমপত্র' শোনার সময়ই তিনি এটা বলে থাকেন।

সুরমা মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'কুমিল্লা সেক্টরে তো অবস্থা কেরোসিন করে দিয়েছে। লেংগী মেরে দিয়েছে বলেই খেয়াল হল। এই জাতীয় কথাবার্তা সুরমা সহ্য করতে পারে না। তিনি আশংকা করতে লাগলেন সুরমা কড়া কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছু বলল না।

সুরমা যথেষ্ট সংযত আচরণ করছে বলে তাঁর ধারণা। এখনো ছেলেটিকে নিয়ে কোন হৈচৈ করেনি। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। কাজেই আশা করা যায় বাকিগুলিও কাটবে। অবশ্যি ছেলের আসল পরিচয় জানলে কি হবে বলা যাচ্ছে না। প্রয়োজন না হলে পরিচয় দেয়ারই বা দরকার কি। কোন দরকার নেই।

স্বাধীন বাংলা থেকে দেশাত্মবোধক গান হচ্ছে। তিনি গানের তালে তালে পা ঠুকতে লাগলেন 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' তাঁর চোখ ভিজে উঠল। এইসব গান আগে কতবার শুনেছেন কখনো এ রকম হয় নি। এখন যতবার শুনেন চোখ ভিজে উঠে। বুক হু-হু করে।

রেডিওটা কান থেকে নামাও।

মতিন সাহেব ট্রানজিস্টারটা বিছানার উপর রাখলেন। নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। সুরমা বললেন, কাল তুমি তোমার বোনের বাসায় গিয়ে বলে আসবে রাত্রি এবং অপালা যেন এক সপ্তাহ এখানে না আসে।

কেন ?

তোমাকে বলতে বলছি, তুমি বলবে। ব্যাস। এই মাসটা ওরা সেখানেই থাকুক।

আচ্ছা বলব।

আরেকটা কথা।

বল।

ভবিষ্যতে কখনো আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করবে না।

আচ্ছা। এক কাপ চা খাওয়াবে ?

এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরমাকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয়া। সে বসে থাকা মানেই স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকেও একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। পূর্ব রণাঙ্গনে বিদ্রোহী সৈন্য

এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ভেতর খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে বলে অসমর্থিত খবরে জানা গেছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ছোট বড় শহর পাকিস্তানী বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। আমেরিকান দু'জন সিনেটার ঐ অঞ্চলের ব্যাপক প্রাণহানির খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংকট নিরসনের জন্যে আশু পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন।

ভাল খবর হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গনে খণ্ড যুদ্ধ। আমেরিকানদের খবর। এরা তো আর না জেনেশুনে কিছু বলছে না। জেনেশুনেই বলছে। রাত্রি নেই, সে থাকলে এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। টেলিফোনও নষ্ট হয়ে আছে। ঠিক থাকলে ইশারা-ইংগিতে জিজ্ঞেস করা যেত সে ভয়েস অব আমেরিকা শুনেছে কিনা।

মতিন সাহেব রেডিও পিকিং ধরতে চেষ্টা করতে লাগলেন। পাশাপাশি অনেকগুলি জায়গায় 'চ্যাং চ্যাং চিন মিন' শব্দ হচ্ছে। এর কোন একটি রেডিও পিকিংয়ের এক্সটারনাল সার্ভিস। কোনটা কে জানে। রাত এগারোটায় রেডিও অস্ট্রেলিয়া। মাঝে মাঝে রেডিও অস্ট্রেলিয়া খুব পরিষ্কার ধরা যায়। তারা ভাল ভাল খবর দেয়।

তিনি নব ঘুরাতে লাগলেন খুব সাবধানে। তাঁর মন বেশ খারাপ। বিবিসির খবর শুনতে পারেন নি। খুব ডিসটারবেন্স ছিল। একটা ভাল ট্রানজিস্টার কেনা খুবই দরকার।

রাত সাড়ে দশটায় ইলেকট্রিসিটি এল। সুরমা লক্ষ্য করলেন ছেলেটি বারান্দায় রাখা চেয়ারটায় বসে আছে। সারাটা সময় কি এখানেই বসে ছিল? না ঘুমিয়ে পড়েছে বসে থাকতে থাকতে? তিনি এগিয়ে গেলেন। না ঘুমায় নি। জেগেই আছে। চোখে চশমা নেই বলে অন্য রকম লাগছে।

আলম, তোমার কি ঘুম আসছে না?

জ্বি না।

গরম দুধ বানিয়ে দেব এক গ্লাস? গরম দুধ খেলে ঘুম আসে।

দিন।

সুরমা দুধের গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডেকে তুলতে তাঁর মায়া লাগল। তিনি বারান্দায় বাতি নিভিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

দুই

সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে একটি অচেনা বাড়িতে দু'দিন কেটে গেল। দু'দিন এবং তিনটি দীর্ঘ রাত। আজ হচ্ছে তৃতীয় দিনের সকাল। আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। কাজের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেছে। সে চায়ে চুমুক দেয় নি। ইচ্ছে করছে না। অস্থির লাগছে। পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধটা সহ্য হচ্ছে না। সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। এই যন্ত্রণার উৎস নিশ্চয়ই পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নয়। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যেই এ রকম হচ্ছে। দম আটকে আসছে।

কথা ছিল সাদেক তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যেদিন সে ঢাকা এসে পৌঁছেছে তার পরদিনই। যোগাযোগটা হবার কথা কিন্তু এখনো সাদেকের কোন খোঁজ নেই। ধরা পড়ে গেল নাকি ? দলের একজন ধরা পড়ার অর্থ হচ্ছে প্রায় সবারই ধরা পড়ে যাওয়া। এ কারণেই কেউ কারোর ঠিকানা জানে না। কাজের সময়ই সবাই একত্র হবে। তারপর আবার ছড়িয়ে পড়বে। ঝিকাতলার একটি বাসায় কনটাক্ট পয়েন্ট। সেখানেও যাবার হুকুম নেই। নিতান্ত জরুরী না হলে কেউ সেখানে যাবে না।

সবার দায়িত্ব ভাগাভাগি করা আছে। মালমশলা জায়গা মত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব রহমানের। সেগুলি নিশ্চয় পৌঁছে গেছে। রহমান অসাধ্য সাধন করতে পারে। রহমানকে যদি বলা হয়— রহমান, তুমি যাও তো, সিংহের লেজটা দিয়ে কান চুলকে আস। সে তা পারবে। সিংহ সেটা বুঝতেও পারবে না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে— রহমান অসম্ভব ভীতু ধরনের ছেলে। এ জাতীয় দলে ভীতু ছেলেপুলে রাখাটা ঠিক না। কিন্তু রহমানকে রাখতে হয়েছে।

আলম খাট থেকে নামল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিল। ঠাণ্ডা চা। সর পড়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডার জন্যেই মিষ্টি বেশি লাগছে। বমি বমি ভাব এসে গেছে। সে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। কিছু করবার নেই। এ বাড়ির ভদ্রমহিলা গতকাল বিশাল এক উপন্যাস দিয়ে গেছেন— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদম ফুল'। প্রেমের উপন্যাস। প্রেম নিয়ে কেউ এতবড় একটা উপন্যাস ফাঁদতে পারে ভাবাই যায় না। কাকলী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে একটি ছেলের— এ রকমই গল্প। কোন সমস্যা নেই, কোন ঝামেলা নেই— সুখের গল্প। পড়তে ভাল লাগছে না। তবু ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া হয়েছে। আবার বইটি নিয়ে বসবে কিনা আলম মনস্থির করতে পারল না।

পাশের ঘর থেকে সেলাই মেশিনের খটাং খটাং শব্দ হচ্ছে। মেশিন চলছে তো চলছেই। রাতদিন এই মহিলা কি এত সেলাই করেন কে জানে ? ক্লান্তি বলেও তো একটা জিনিস মানুষের আছে। খট খট খটাং, খট খট খটাং চলছে তো চলছেই। গতকাল রাত এগারোটা পর্যন্ত এই কাণ্ড।

আলম হাত বাড়িয়ে 'প্রথম কদম ফুল' টেনে নিল। ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে না। যে কোন একটা জায়গা থেকে পড়তে শুরু করলেই হয়। তার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভাল হত। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। দুটি বাথরুম এ বাড়িতে। একটি অনেকটা দূরে সার্ভেন্টস বাথরুম। অন্যটি এদের শোবার ঘরের পাশে। পুরোপুরি মেয়েলী ধরনের বাথরুম। ঝকঝক তকতক করছে। ঢুকলেই এয়ার ফ্রেশনারের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। বিশাল একটি আয়না। আয়নার নিচেই মেয়েলী সাজসজ্জার জিনিস। চমৎকার করে গোছান। আয়নার ঠিক উল্টোদিকে একটি জলরঙ ছবি ফ্রেমে বাঁধান। গামছা পরা দুটি বালিকা নদীতে নামছে। চমৎকার ছবি। আয়নার ভেতর দিয়ে এই ছবিটি দেখতে বড় ভাল লাগে। এ জাতীয় একটি বাথরুম বাইরের অজানা-অচেনা এক মানুষের জন্যে নয়।

আলম বই নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক তখনই সেলাই মেশিনের শব্দ থেমে গেল। সে এই ব্যাপারটি আগেও লক্ষ্য করেছে। ঘর থেকে বেরুলেই ভদ্রমহিলা সেলাই থামিয়ে অপেক্ষা করেন। কিভাবে তিনি যেন টের পেয়ে যান। আলম বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সুরমা বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখে বুড়োদের মত একটা চশমা। মাথায় ঘোমটা দেয়া। এটিও আলম লক্ষ্য করেছে— ভদ্রমহিলা মাথায় সব সময় কাপড় দিয়ে রাখেন। হেড মিসট্রেস হেড মিসট্রেস মনে হয় সে কারণেই।

সুরমা বললেন, তোমার কিছু লাগবে ?

না, কিছু লাগবে না।

লাগলে বলবে। লজ্জা করবে না।

জ্বি, আমি বলব।

আমাদের টেলিফোন ঠিক হয়েছে। তুমি যদি কাউকে ফোন করতে চাও বা তোমার বাসায় খবর দিতে চাও

দিতে পার।

না, আমার কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।

সারাক্ষণ ঐ ঘরটায় বসে থাক কেন ? বসার ঘরে এসে বসতে পার। বারান্দায় যেতে পার।

আলম চুপ করে রইল। সুরমা বললেন, তুমি তো কোন কাপড় জামা নিয়ে আসনি। রাত্রির বাবাকে বলেছি তোমার জন্য শার্ট নিয়ে আসবে। ও তোমার জন্যে কিছু টাকাও রেখে গেছে। বাইরে-টাইরে যদি যেতে চাও তাহলে রিকশা ভাড়া দেবে।

আমার কাছে টাকা আছে।

তুমি কি কোথাও বেরুবে ?

দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুপুরের মধ্যে যদি কেউ না আসে তাহলে বেরুব।

কারোর কি আসার কথা ?

হ্যাঁ।

তুমি যখন না থাক তখন যদি সে আসে তাহলে কি কিছু বলতে হবে ?

না, কিছু বলতে হবে না। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সুরমা ভেতরে চলে গেলেন। আবার সেলাই মেশিনের খট খট শব্দ হতে লাগল। ভদ্রমহিলার মাথা ঠিক নেই বোধহয়। কোন সুস্থ মানুষ দিনরাত একটা মেশিন নিয়ে খট খট করতে পারে না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অবশ্যি এখন সময়টাই অস্বাভাবিক। সে জন্যেই বোধ হয় চমৎকার এই সকালটাকে মানাচ্ছে না। দুর্বাঘাসের উপর সুন্দর রোদ। বাতাসে সবুজ ঘাস কাঁপছে, রোদও কাঁপছে। অস্বাভাবিক এই বন্দী শহরে এটাকে কিছুতেই মানান যাচ্ছে না। আলম সিগারেট ধরাল। বিন্তি মেয়েটি নারকেল গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। এই মেয়েটি কি সব সময়ই হাসে ? এত সুখী কেন সে ?

দুপুর তিনটায় আকাশ মেঘলা হয়ে গেল। বাতাস হল আর্দ্র। [illegible] কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধ হয়। আলম গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। মেঘের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা হয়ত। কতক্ষণে বৃষ্টি নামবে আঁচ করা। বিন্তি বলল, কই যান ?

কাছেই।

পাঁচটার আগে আইবেন কিন্তু। 'কারপু' আছে।

আসব, পাঁচটার আগেই আসব।

পানওয়ালা ইদ্রিস মিয়াও দেখল ছেলেটি মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। সেও তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল কম। অল্প যে ক'জন দেখা যায় তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, দু'একটা কথা বলবার জন্যে মন চায়। ইদ্রিস মিয়া কোন কথা বলল না। সে আজ চোখে সুরমা দিয়েছে সে জন্যে বোধ হয় চোখ কড় কড় করছে। কিংবা হয়ত চোখ উঠবে। চোখ-উঠা রোগ হয়েছে। চারদিকে সবার চোখ উঠছে।

আলম হাঁটতে হাঁটতে বলাকা সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঢাকা শহরে প্রচুর আর্মির চলাচল বলে যে কথাটা সে শুনেছিল, সেটা ঠিক নয়। আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে সে একটামাত্র ট্রাক যেতে দেখেছে। সেই ট্রাকে ছাই রঙা পোশাক পরা একদল মিলিশিয়া বসে আছে। সাধারণত ট্রাকে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এরা বসে আছে কেন ? ক্লান্ত ?

চোখ পড়ার মত পরিবর্তন কি কি হয়েছে এই শহরে ? আলম ঠিক বুঝতে পারল না। সে সম্ভবত আগে কখনো এ শহরকে ভালভাবে লক্ষ্য করেনি। প্রয়োজন মনে করেনি। এখন কেন জানি ইচ্ছা করছে আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। চারদিক কেমন যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। পুরানো বইপত্রের হকাররা যে জায়গাটা দখল করে থাকত সেটা খালি। একটি অন্ধ ভিখিরী টিনের মগ নিয়ে বসে আছে। একে ছাড়া অন্য কোন ভিখিরী চোখে পড়ে না। সব ভিখিরীকে কি এরা মেরে শেষ করে দিয়েছে ? দিয়েছে হয়ত।

রিকশায় কিছু বোরকা পরা মহিলা দেখা গেল। মেয়েরা কি আজকাল বোরকা ছাড়া রাস্তায় নামছে না ? কিছু কিছু রিকশায় ছোট ছোট পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ। চাঁদ তারা আঁকা এই ফ্ল্যাগের বাজার এখন নিশ্চয়ই জমজমাট। যেখানে-সেখানে এই ফ্ল্যাগ উড়ছে। এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাবও আছে। কার পতাকাটি কত বড়। লাল রঙের তিনকোণা এক ধরনের পতাকাও দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কি-সব আরবী লেখা। লেখাগুলি তুলে ফেললেই এটা হয়ে যাবে মে দিবসের পতাকা।

আলম একটা রিকশা নিল। বুড়ো রিকশাওয়ালা। ভারী রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে, তবু প্যাডেল করছে প্রাণপণে। সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে একটা বরযাত্রীর দল দেখা গেল। নতুন বর বিয়ে করে ফিরছে। বিশাল একটা সাদা গাড়ি মালা দিয়ে সাজানো। ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে পড়ায় গাড়ি থেমে আছে। আশেপাশের সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখতে চেষ্টা করছে বর-বউকে। আলমের মনে হল— দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন কি এই ছেলেটি একটু লজ্জিত বোধ করবে না? যখন তার যুদ্ধে যাবার কথা তখন সে গিয়েছে বিয়ে করতে। আজ রাতে সে কি সত্যি সত্যি কোন ভালবাসার কথা এই মেয়েটিকে বলতে পারবে?

সিগন্যাল পেরিয়ে বরের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বর একটা রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর সাধারণত বররা রুমালে মুখ ঢাকে না। এই ছেলেটি ঢাকছে কেন? সে কি নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছে? দুঃসময়ে বিয়ে করে ফেলায় সে কি খানিকটা লজ্জিত?

জুন মাসে ইয়াদনগরে নদী পার হবার সময় এ রকম একটা বরযাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দশ-বারো জনের একটা দল। দু'টি নৌকায় বসে আছে। সবার চেহারাই কেমন অস্বাভাবিক। জবু থবু হয়ে বসে আছে। বর ছেলেটি শুটকো মত। তাকে লাগছে উদভ্রান্তের মত। এরা লগীতে নৌকা বেঁধে বসে আছে চুপচাপ। আলমদের দলে ছিল রহমান। সে সব সময়ই বেশি কথা বলে। বরযাত্রী দেখে হাসিমুখে বলল, কি বিয়ে করতে যান? সাবধানে যাবেন। লঞ্চে করে মিলিটারী চলাচল করছে। ঘনঘন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলবেন। নওশাকে পাগড়ী পরিয়ে নৌকার গলুইয়ে বসিয়ে রাখলে কেউ কিছু বলবে না। বরযাত্রী দল থেকে কেউ একটি কথাও বলল না। একজন বুড়ো শুধু বিড়বিড় করতে লাগল। বর ছেলেটি কর্কশ গলায় তাকে ধমক দিল— চুপ করেন। অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল, এরা কনে নিয়ে ফিরছিল। বড় নদী ছেড়ে ছোট নদীতে ঢুকার সময় মিলিটারীদের একটা লঞ্চ এদের থামায়, কনে এবং কনের ছোট বোনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। ছোট বোনটির বয়স এগারো।

আলম বলল, আপনারা কিছুই বললেন না?

কেউ কোন উত্তর দিল না। রহমান বলল, খামোকা এইখানে নৌকা থামিয়ে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান। তারপর আবার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে? অভাব নাই।

লোকগুলি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন কারোর কোন কথাই তাদের মাথায় ঢুকছে না।

আলম ঝিকাতলায় পৌঁছল বিকেল চারটায়। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি খুঁজতে হবে। খুঁজে পাওয়া যাবে কি-না কে জানে। সময় অল্প কার্ফুর আগেই ফিরতে হবে।

বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। ঝিকাতলা ট্যানারীর ঠিক সামনে ৩৩ নম্বর বাড়ি। দোতলা-দালানের উপরের তলায় থাকেন নজিবুল ইসলাম আখন্দ। কনটাক্ট পয়েন্ট।

দোতলায় উঠে আলমের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিশাল এক তালা ঝুলছে বাড়িতে। দরজা জানালা সবই বন্ধ। তালার সাইজ দেখেই মনে হচ্ছে এ বাড়ির বাসিন্দারা দীর্ঘ দিনের জন্যে বাইরে গেছে এবং সম্ভবত আর ফিরবে না।

একতলায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করবার পর দরজা একটুখানি খুলল। ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে বলল, কাকে চান?

আখন্দ সাহেবকে। নজিবুল ইসলাম আখন্দ।

উনি দোতলায় থাকেন। এখন নাই।

কোথায় গেছেন?

দেশের বাড়িতে।

ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ।

কবে গেছেন।

তিন দিন আগে। উনার ছোট ভাই মারা গেছে দেশের বাড়িতে।

ও আচ্ছা।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল। এতো একটা সমস্যায় পড়া গেল। আলম শুকনো মুখে বের হয়ে এল। বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। এর মধ্যে হাঁটতে ভালই লাগছে। তার সারাক্ষণই মনে হতে লাগল বাসায় পৌছে দেখবে সাদেক বিরক্তমুখে অপেক্ষা করছে। পরদিনই কাজে নেমে পড়া যাবে। কাজকর্ম ছাড়া চুপচাপ বসে থাকাটা আর সহ্য হচ্ছে না।

বারান্দায় উদ্বিগ্ন মুখে মতিন সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলমকে দেখেই বললেন, কাউকে কিছু না বলে কোথায় গিয়েছিলে ? আমি চিন্তায় অস্থির। একটু পরই কার্ফু শুরু হয়ে যাবে।

আলম সহজ স্বরে বলল, আমার কাছে কেউ এসেছিল ?

না, কেউ আসে নাই। ভিজতে ভিজতে এলে কোত্থেকে ? গিয়েছিলে কোথায় ?

আলম কোন জবাব না দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে পড়ল। বসার ঘরের সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সোফা একপাশে সরিয়ে একটা ক্যাম্প খাট পাতা হয়েছে। ক্যাম্প খাটে অচিন্ত্যকুমারের 'প্রথম কদম ফুল'। তার মানে শোবার জায়গার বদল হয়েছে। মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমার মেয়েরা চলে এসেছে। কাজেই তোমাকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। তোমার অসুবিধা হবে না তো ?

না, অসুবিধা কিসের ?

আমার বড় মেয়ে একটু ইয়ে ধরনের মানে···· মতিন সাহেব কথা শেষ করলেন না, মাঝ-পথে থেমে গেলেন। আলম বলল, আমার কোন অসুবিধা নেই। আপনি চিন্তা করবেন না।

মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, আলম আরেকটা কথা— ইয়ে— মানে আমাদের আরেকটা বাথরুম যে আছে ঐটিতে তুমি যাবে। ঐটা আমি পরিষ্কার করেছি। মানে প্রবলেমটা তোমাকে বলি···· প্রবলেমটা হল····

আপনাকে প্রবলেম বলতে হবে না। আমার কোন অসুবিধা নেই।

আলম সিগারেট ধরিয়ে ক্যাম্প খাটে বসল। মতিন সাহেব হা হা করে উঠলেন, ভেজা কাপড়ে বিছানায় বসছ কেন ? কাপড় জামা ছাড়। আমি তোমার জন্য শার্ট আর লুঙ্গি কিনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

বারো-তেরো বছরের শান্ত চেহারার একটি মেয়ে উকি দিল। এর নামই বোধ হয় অপালা। মতিন সাহেব বললেন, তোর আপাকে ডেকে আন, পরিচয় করিয়ে দেই।

মেয়েটি ভেতরে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বলল, আপা আসবে না।

মতিন সাহেব খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। আলম বলল, তোমার নাম অপালা ?

হ্যাঁ।

কেমন আছ অপালা ?

ভাল।

বস।

না, আমি বসব না।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ রকম বাচ্চা মেয়ের চোখ এত তীক্ষ্ণ কেন ? এদের চোখ হবে কোমল। আলম সিগারেট ধরাল। মেয়েটি এখনো তাকে মন দিয়ে লক্ষ্য করছে। কেন করছে কে জানে।

অপালা চোখ ফিরিয়ে নিল। শীতল গলায় বলল, আপনি 'প্রথম কদম ফুল' বইটার একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলেছেন। বই ছিঁড়লে আমি খুব রাগ করি।

আর ছিঁড়ব না।

পাতাও মুড়বেন না। এটা আমার খুব প্রিয় বই।

আলম হেসে ফেলল।

তিন

রাত্রি সারাদিন খুব গম্ভীর ছিল। সন্ধ্যার পর আরো গম্ভীর হয়ে পড়ল। পৌনে আটটা থেকে আটটা পর্যন্ত বিবিসি বাংলা খবর দেয়। সে খবর শুনবার জন্যেও তার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। সবাইকে বলল তার মাথা ধরেছে। সুরমা অপালাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর কি হয়েছে ? অপালা গম্ভীর হয়ে বলল— ফুফুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সুরমা খুবই অবাক হলেন। রাত্রি কারো সঙ্গে ঝগড়া করার মেয়ে নয়। সে সব কিছুই নিজের মনে চেপে রাখে। সুরমা বললেন, কি নিয়ে ঝগড়া হল ?

জানি না কি নিয়ে। ফুফু ওকে আলাদা ডেকে নিল।

এতক্ষণ এই কথা বলিসনি কেন ?

মনে ছিল না।

মনে ছিল না মানে ?

আপা আমাকে কিছু বলতে মানা করেছে।

অপালা গল্পের বইয়ে মাথা ডুবিয়ে ফেলল। মার কোন কথাই আসলে তার মাথায় ঢুকছে না। তার বিরক্ত লাগছে। কোন একটা গল্পের বই শুরু করলে অন্য কিছু তার আর ভাল লাগে না। যে গল্পের বইটি সে নিয়ে বসেছে তার নাম 'আলোর পিপাসা'। এই বইটি সে আগেও বেশ কয়েকবার পড়েছে। প্রতিটি লাইন তার মনে আছে, তবু পড়তে ভাল লাগছে। অপালার বয়স তেরো। রোগা বলে তাকে বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয়। এটা তার খুব খারাপ লাগে। তেরো বছর বয়সটা তার পছন্দ নয়। যুদ্ধ শুরু হবার আগে তাদের যে প্রাইভেট মাস্টার ছিল তাকে একদিন সে বলেছে— স্যার, আমার বয়স পনের। বেশি বয়সে পড়ালেখা শুরু করেছি তো এই জন্যে ক্লাস এইটে পড়ি। ছোটবেলায় খুব অসুখ-বিসুখে ভুগতাম। পড়াশোনা শুরু করতে এই জন্যেই দেরি হয়ে গেল।

অপালার এ জাতীয় কথাবার্তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খুব ঝামেলা হয়েছিল। সুরমা শুধু বকাবকি করেই চুপ করে থাকেননি, চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাইভেট মাস্টারটিকে বদলে দিয়ে বুড়ো ধরনের একজন টিচার রাখলেন। এ জাতীয় ঝামেলা অপালা প্রায়ই তৈরি করে। কয়েকদিন আগেই একটা হল। কি-এক উপন্যাস পড়ে তার খুব ভাল লেগেছে। উপন্যাসের নায়িকার নাম মনিকা। সে মনিকা নাম কেটে সমস্ত বইতে নিজের নাম বসিয়েছে। এ নিয়েও মা ঝামেলা করেছেন। তিনি সাধারণত বই-টই পড়েন না। অপালা কেন নায়িকার নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়েছে সেটা জানবার জন্যেই বইটি পড়লেন এবং রাগে তাঁর গা জ্বলে গেল। কারণ উপন্যাসের নায়িকা মনিকা তিনটি ছেলেকে এক সঙ্গে ভালবাসে। ছেলেগুলি সুযোগ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে। মনিকা কোন বাধা দেয় না। এর মধ্যে একটি ছেলে বেশি রকম সাহসী। সে শুধু গায়ে হাত দিতে চায়। মনিকা তার এই স্বভাব সহ্যই করতে পারে না, তবু তাকেই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। ভয়াবহ ব্যাপার।

অপালাকে নিয়ে সুরমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাকে তিনি চোখে চোখে রাখতে চান। নিজে স্কুলে দিয়ে আসেন এবং নিয়ে আসেন। এখন স্কুল বন্ধ বলে এই ঝামেলাটা করতে হচ্ছে না। কিন্তু ওর কোন টেলিফোন এলে তিনি আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করেন।

রাত্রিকে নিয়ে এ রকম কোন ঝামেলা হয়নি। রাত্রি যে বড় হয়েছে এটা সে কখনো কাউকেই বুঝতেই দেয়নি। একবার শুধু খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। ইউনিভার্সিটিতে সেকেণ্ড ইয়ারে যখন পড়ে তখনকার ঘটনা। গরমের ছুটি চলছে। সে সময় সকাল দশটায় এক ছেলে এসে উপস্থিত। সে নাকি রাত্রির সঙ্গে পড়ে। সেলিম নাম। সুরমা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন রাত্রি কেমন অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কথাবার্তা বলতে লাগল উঁচু গলায়। শব্দ করে হাসতে লাগল। এবং এক সময় মাকে এসে বলল, 'মা ওকে আজ দুপুরে খেতে বলি ? হলে থাকে, হলের খাবার খুব খারাপ।' সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললেন— 'অজানা-অচেনা ছেলে দুপুর বেলায় এখানে খাবে কেন ? ওকে যেতে বল।' রাত্রি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'অচেনা ছেলে নয় তো মা। আমার সঙ্গে পড়ে।'

সুরমা শক্ত গলায় বললেন, ক্লাসের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্যে দুপুর বেলায় বাসায় আসবে— এটা আমার পছন্দ নয়। ওকে যেতে বল।

এটা আমি কি করে বলব মা ?

যেভাবে বলার সেভাবে বলবি।

রাত্রি চোখ-মুখ লাল করে কথাটা বলতে গেল। এবং বলে এসে সমস্ত দিন কাঁদল। সুরমা কিছুই বললেন না। কারণ তিনি জানেন এই সাময়িক আবেগ কেটে যাবে। এখানে তাঁকে শক্ত হতেই হবে। ছেলেটিকে তিনি যদি খেতে বলতেন সে বার বার ঘুরে ঘুরে এ বাড়িতে আসত। রাত্রির মত একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার লোভ সামলান কঠিন ব্যাপার। মেয়ে হয়েও সুরমা তা বুঝতে পারেন। বারবার আসা-যাওয়া থেকে একটা ঘনিষ্ঠতা হত। এই বয়সের কাঁচা আবেগের ফল কখনো শুভ হয় না।

সুরমা ভেবে পেলেন না রাত্রি তার ফুফুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করবে? তার ফুফুকে সে খুবই পছন্দ করে। তাদের যে সম্পর্ক সেখানে ঝগড়া হবার সুযোগ কোথায়? নাসিমাকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে কিন্তু তার আগে রাত্রির সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু রাত্রি কি কিছু বলবে? সুরমা অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাত্রি চুল আঁচড়াচ্ছিল। মাকে দেখে অল্প হাসল। সুরমা মনে মনে ভাবলেন— এই মেয়েটি কি সত্যি আমার? এমন মায়াবতী একটা মেয়ের জন্ম দেবার মত ভাগ্য আমার কি করে হয়? সুরমা বললেন, আয় চুল বেঁধে দি।

আস্তে করে বাঁধবে মা। তুমি এত শক্ত করে বাঁধ যে মাথা ব্যথা করে।

রাত্রি মাথা পেতে দিল। তিনি চিরুনী টানতে টানতে বললেন— নাসিমার সঙ্গে তোর নাকি ঝগড়া হয়েছে?

ঝগড়া হবে কেন?

অপালা বলছিল।

অপালা কত কিছুই বলে।

ঝগড়া হয়নি তাহলে?

না। কি যে তুমি বল মা। আমি কি ঝগড়া করবার মেয়ে?

সুরমা শান্ত গলায় বললেন— তার মানে কি এই যে অন্য কোন মেয়ে হলে ঝগড়া করত?

রাত্রি হেসে ফেলল, কোন উত্তর দিল না। সুরমা বললেন, নাসিমা তোকে কি বলছিল?

তেমন কিছু না।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ তিনি জানেন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কোন জবাব পাওয়া যাবে না। রাত্রি বসে আছে মাথা নিচু করে। মেয়েটি প্রতিদিনই কি সুন্দর হচ্ছে? সুরমার সূক্ষ্ম একটা ব্যথা বোধ হল। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, ঐ ছেলেটি কে মা?

কোন্ ছেলে?

আমাদের বসার ঘরে যে ছেলেটি আছে?

তোর বাবার দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে হয়। আমি ঠিক জানি না।

কথাটা তো মা তুমি মিথ্যা বললে। আমি শুনেছি সে বাবাকে মতিন সাহেব, মতিন সাহেব বলছিল।

সুরমা ঝাঁঝাল স্বরে বললেন, আমি জানি না সে কে।

এটাও তো মা ঠিক না। তুমি কিছু না জেনেশুনে একটা ছেলেকে থাকতে দেবে না। তোমার স্বভাবের মধ্যে এটা নেই।

সুরমা কিছু বললেন না। রাত্রি বলল, আমি কারোর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলি না। কেউ যখন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে আমার ভাল লাগে না। সুরমা থেমে বললেন, ছেলেটি ঢাকায় গেরিলা অপারেশন চালানোর জন্যে এসেছে। তোর বাবা জুটিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত থাকবে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।

রাত্রি কিছু বলল না। এটা একটা বড় ধরনের খবর। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার। কিন্তু রাত্রির কোন ভাবান্তর হল না। সে যে ভাবে বসে ছিল সে ভাবেই বসে রইল।

নাসিমাদের বাসার টেলিফোন লাইনে কোন একটা গণ্ডগোল আছে। টেলিফোন করলেই অন্য এক বাড়িতে চলে যায়। বুড়োমত এক ভদ্রলোক বলেন, ডঃ খয়ের সাহেবের বাড়ি। কাকে চান? আজ ভাগ্য ভাল। টেলিফোনে নাসিমাকে পাওয়া গেল। সুরমা বললেন, রাত্রির সঙ্গে তোমার নাকি ঝগড়া হয়েছে? অপালা বলছিল।

ঝগড়া হয়নি ভাবী। যা বলার আমিই বলেছি। ও শুধু শুনেছে।

কি নিয়ে কথা ?

রাত্রির বিয়ের ব্যাপারে। ছেলের মা এসেছিলেন রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে। রাত্রি পাথরের মত মুখ করে বসে রইল।

আমাকে তো এসব কিছু বল নি !

বলার মত কিছু হয় নি।

আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছ আর আমি কিছু জানব না ?

সময় হলেই জানবে। সময় হোক। ভাবী, রাত্রির জন্যে আমি যে ছেলে আনব সে ছেলে তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। রাত্রির ব্যাপারটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও। তোমার তো আরো একটি মেয়ে আছে। ওর বিয়ে তুমি দিও।

নাসিমা।

বল।

এ সময়ে মেয়ের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে কথা হোক এটা আমি চাই না। মেয়ের আমি বিয়ে দেব সুসময়ে।

সুসময়ের দেরি আছে ভাবী। ছ' সাত বৎসরের ধাক্কা। তাছাড়া·····

তা ছাড়া কি ?

এ রকম সুন্দরী অবিবাহিতা একটি মেয়ে এ সময় কেউ ঘরে রাখছে না। গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে হচ্ছে রোজ। এইট নাইনে পড়া মেয়েদেরও বাবা-মা পার করে দিচ্ছে। আমাদের নিচের তলার রকিব সাহেব কি করেছেন শোন····

সুরমা থমথমে গলায় বললেন, রকিব সাহেবের কথা অন্য একদিন শুনব। আজ না। আমার মাথা ধরেছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে। মতিন সাহেব জেগে আছেন এখনো। রেডিও অস্ট্রেলিয়া শোনা হয়নি। রাত্রিও জেগে আছে। রেডিও অস্ট্রেলিয়া ধরে দেবার দায়িত্ব তার। ফাইন টিউনিং সে খুব ভাল পারে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে মতিন সাহেব মেয়ের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা একনাগাড়ে তিনিই বলেন। অবিশ্বাস্য আজগুবি গল্প। রাত্রি কোনটিতেই প্রতিবাদ করে না। হাসিমুখে শুনে যায়।

আজ মতিন সাহেব এক পীর সাহেবের গল্প ফাঁদলেন। পীর সাহেবের বাড়ি যশোহর। তিনি এখন কিছুদিনের জন্যে আছেন ঢাকায়। টিক্কা খানের মিলিটারী এডজুটেন্ট নাকি তাকে নিয়ে গিয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। টিক্কা খান খুব বিনীতভাবে পীর সাহেবকে বললেন দোয়া করতে। উত্তরে পীর সাহেব বললেন— তোমাদের সামনে মহাবিপদ। তোমাদের একজনও এই দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। এক লাখ কবর উঠবে বাংলাদেশে।

রাত্রি বলল, তুমি এই গল্প শুনলে কোত্থেকে ? মতিন সাহেব বললেন, আমাদের ক্যাশিয়ার সাহেবের কাছে শুনলাম। উনি ঐ পীর সাহেবের মুরিদ। নিজেও খুব সুফী মানুষ। বানান গল্প বলার লোক না।

মিলিটারী কি আর পীর-ফকিরের কাছে যাবে বাবা ?

এম্নিতে কি আর যাচ্ছে ? ঠেলায় পড়ে যাচ্ছে ? ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়। কি রকম লেংগী যে খাচ্ছে তুই এখানে বসে কি বুঝবি। বুঝতে হলে ফ্রন্টে যেতে হবে। তবে দু' একটা দিন অপেক্ষা কর, দেখ্ কি হয়।

কি হবে ?

আজদহা নেমে গেছে ঢাকা শহরে। কাঁকড়া বিছার দল। মিলিটারী কাঁচা খাওয়া শুরু করবে।

গেরিলারা ঢাকায় এসেছে নাকি বাবা ?

আসবে না তো কি করবে ? মার কোলে বসে থাকবে ? ঢাকা ছেয়ে ফেলেছে। দু' একদিনের মধ্যে অপারেশন শুরু হবে। একবার অপারেশন শুরু হলে দেখবি সব কটা জেনারেলের আমাশা হয়ে গেছে। বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে সবাই।

রাত্রি হেসে ফেলল। বাবা এমন ছেলেমানুষি বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন যে বড় মায়া লাগে। মাঝে মাঝে রাত্রি ভাবতে চেষ্টা করে এ দেশে এমন কেউ কি আছে যে এই দেশকে তার বাবার চেয়ে ভালবাসে ?

বাবা।

কি ?
শুয়ে পড় বাবা। ঘুমাও।
ঘুম ভাল হয় না রে মা। সব সময় একটা আতংকের মধ্যে থাকি।
একদিন এই আতংক কেটে যাবে। আমরা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমুব।
মতিন সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি গলার স্বর অনেকখানি নিচে নামিয়ে বললেন, আমাদের বাসায় যে ছেলেটা আছে সে কে বল তো মা ? দেখি তোর কেমন বুদ্ধি।
রাত্রি চুপ করে রইল। মতিন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, বলতে পারলি না ? জানি পারবি না। ও হচ্ছে সাক্ষাৎ আজদহা, আবাবিল পক্ষী। ছারখার করে দিবে। কিছু বুঝতে পারলি ?
পারছি।
দেখে মনে হয় ?
আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি।
কথা বলে দেখ, মনে হবে সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে।
উনি তো বাঙালী ঘরের ছেলেই বাবা।
আরে না। ছেলেতে ছেলেতে ডিফারেন্স আছে না ? এরা হচ্ছে সাক্ষাৎ আজদহা।
আজদহাটা কি ?
মতিন সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। আজদহা কি সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট নয়। কথাটা তিনি অফিসে শুনেছেন। গেরিলা প্রসঙ্গে কে যেন বলেছিল— তাঁর খুব মনে ধরেছে।
রাত্রি বলল, বাবা, তুমি কি ইনার কথা কাউকে বলেছ ?
আরে না। কি সর্বনাশ ! কাউকে বলা যায় নাকি ?
তুমি তো পেটে কথা রাখতে পার না বাবা। এই তো আমাকে বলে ফেললে।
তিনি চুপ করে গেলেন। রাত্রি বলল, ভাল করে মনে করে দেখ, কাউকে বলনি ?
না।
তোমাদের ক্যাশিয়ার সাহেব, তাঁকেও না ?
না।
বাবা, ভাল করে ভেবে দেখ। জানাজানি হলে বিরাট বিপদ হবে।
আরে না। তুই পাগল হলি নাকি ?
দুধ খাবে বাবা ? শোবার আগে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শোও। ভাল ঘুম হবে।
দুধ না, চা খেতে ইচ্ছা করছে। তোর মাকে না জাগিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দে। রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

আলম হকচকিয়ে গেল।
প্রায় মাঝরাতে এমন একটি রূপবতী মেয়ে অসংকোচে তার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখবে এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মেয়েটিই রাত্রি, এটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু তার কাণ্ডকারখানা বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, বাবার জন্যে চা বানাতে হল। আপনি জেগে আছেন, তাই আপনার জন্যেও বানালাম। ঠিক কি বললে ভাল হয় আলম বুঝতে পারল না। মেয়েটি চলেও যাচ্ছে না। তাকে কি বসতে বলা উচিত ? কিন্তু এটা তারই বাড়ি। তার বাড়িতে তাকে বসতে বলার মানে হয় না।
আমি এ বাড়ির বড় মেয়ে। আমার নাম রাত্রি।
আপনি কেমন আছেন ?
'আপনি কেমন আছেন' বলে, আলম আরো অস্বস্তিতে পড়ল। বোকার মত একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এবং মেয়েটি তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কারণ সে এই প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নি। আলমের মনে হল মেয়েটি যেন একটু হাসল।
রাত্রি বলল, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছিলেন ?
রাগ করব কেন ?
বিকেলে বাবা আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল তখন আসিনি— সে জন্যে।
আরে না। ঐসব নিয়ে আমি ভাবিই নি।

আমার মন খারাপ ছিল তখন, তাই আসিনি। আমার ফুফুর উপর রাগ করেছিলাম।
ও আচ্ছা।
আপনি বোধ হয় চা-টা খাবেন না। দিন নিয়ে যাই।
না আমি খাব।
আলম চায়ে চমুক দিল। রাত্রি বলল — কিছু বলবেন না?
কি বলব?
ভদ্রতা করে কিছু বলা। যেমন— চা-টা খুব ভাল হয়েছে এই জাতীয়।
রাত্রি হাসছে। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। এই বয়সী মেয়েদের সঙ্গে তার কথা বলার অভ্যেস নেই। খুবই অস্বস্তি লাগছে। সে বুঝতে পারছে তার গাল এবং কান লাল হতে শুরু করেছে। ইচ্ছে করছে এ জায়গা থেকে কোনমতে ছুটে পালিয়ে যেতে এবং একই সঙ্গে মনে হচ্ছে এই মেয়েটি এক্ষুণি যেন চলে না যায়। যেন সে থাকে আরো কিছুক্ষণ। আলমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।
রাত্রি বলল, যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন।
আলম অনেক রাত পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল তার। এই কষ্টের জন্ম কোথায় তা তার জানা নেই।
রাত বাড়ছে। চারদিক চুপচাপ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে। হোক, খুব হোক। সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাক।
আলম বাতি নিভিয়ে দিল। আজ রাতেও ঘুম আসবে না। জেগে কাটাতে হবে। ঢাকায় আসার পর থেকে এমন হচ্ছে। কেন হচ্ছে? আগে তো কখনো হয়নি। সে কি ভয় পাচ্ছে? ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, এসব জিনিসের জন্ম কোথায়?
তার পানির পিপাসা হল। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

চার

শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আলম বলল, কথা বলছ না কেন মামা ? কেমন আছ ?

ভাল আছি। তুই কোত্থেকে। বেঁচে আছিস এখনো ?

আছি। বাসা অন্ধকার কেন ? মামী কোথায় ?

দেশের বাড়িতে। তুই এখন কোন প্রশ্ন করবি না। কিছুক্ষণ সময় দে নিজেকে সামলাই। শরীফ সাহেব সোফায় বসে সত্যি সত্যি বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। আলম বলল, বাসার খবর বল। সবাই আছে কেমন ?

তুই বাসায় যাস নি ?

না।

সরাসরি আমার এখানে এসেছিস ?

তাও না। ঢাকাতেই আছি কয়েকদিন ধরে।

তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঢাকায় আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি মামা।

আই সি।

এখন বল বাসার খবর।

বাসার খবর তোকে কেন বলব ? তোর কি কোন আগ্রহ আছে না কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে ? বোন আর মাকে ফেলে চলে গেলি দেশ উদ্ধারে। ওদের কথা ভাবলি না ?

তোমরা আছ, তোমরা ভাববে।

প্রথম রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে নিজের পরিবারের জন্যে। এই সাধারণ কথাটা তোরা কবে বুঝবি ?

আলম হেসে ফেলল। শরীফ সাহেব রেগে গেলেন। মানুষটি ছোটখাট। ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি। যতটা না বয়েস তার চেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে। মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। আলম বলল– মামা, বাসার খবর তো এখনো দিলে না। ওরা আছে কেমন ?

ভালই।

মা'র শরীর কেমন ?

শরীর ঠিকই আছে। শরীর একটা আশ্চর্য জিনিস, এটা ঠিকই থাকে।

তোমার তো তাও ঠিক নেই মামা। বুড়ো হয়ে গেছ।

তা হয়েছি। একা থাকি। রাতে ঘুম টুম হয় না।

আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকলেই পার।

পাগল হয়েছিস। ঐ বাড়ির উপর নজর রাখছে না। তুই যুদ্ধে গেছিস সবাই জানে। তোর মাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

আর কোন ঝামেলা করেনি ?

করত। তোর বাবার জন্যে বেঁচে গেলি। ভাগ্যিস সে মরবার আগে 'তমঘায়ে খিদমত'টা পেয়েছিল।

শরীফ সাহেব শার্ট গায়ে দিলেন। জুতো পরলেন।

যাচ্ছ কোথায় মামা ?

অফিসে। আর কোথায় যাব ? তুই কি ভেবেছিলি– যুদ্ধে যাচ্ছি ?

অফিস-টফিস করছ ঠিকমতই ?

করব না ? তোর মত কয়েকজন চেংড়া ছোড়া দু'একটা গুলি-টুলি করবে আর এতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে ? দিল্লী হনুজ দূরঅস্ত। তাছাড়া পলিটিক্যাল সল্যুশন হয়ে যাচ্ছে। খুব হাই লেভেলে কথাবার্তা হচ্ছে। আমেরিকা চাপ দিচ্ছে। আমেরিকার চাপ কি জিনিস তোরা বুঝবি না। স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।

আলম হাসতে লাগল। এই মামার সঙ্গে তার খুবই ভাব। একজন সৎ এবং সত্যিকার অর্থে ভাল মানুষ। তাঁর একটিমাত্র দোষ– উল্টো তর্ক করা। আলমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই তিনিই আবার পাকিস্তানী ভাব আছে এমন কারোর সঙ্গে কথা বলবার সময় এমন যুক্তি দেবেন যাতে মনে হবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দেশ স্বাধীন হচ্ছে।

আলম।

জ্বি।
তোর মার সঙ্গে দেখা করবি না?
না।
ভাল। লায়েক ছেলে তুই। যা ভাল মনে করিস তাই করবি। আমার এখানে থাকতে চাস?
না।
তোর কি ধারণা আমার এখানে উঠলেই তোকে আমি মিলিটারীর হাতে ধরিয়ে দেব।
তোমাদের কোন ঝামেলায় ফেলতে চাই না।
এসেছিস কি জন্য আমার কাছে?
দেখতে এলাম।
যা দেখার ভাল করে দেখে নে। দশ মিনিট সময়। দশ মিনিটের মধ্যেই বেরুব।
আলম উঠে দাঁড়াল। শরীফ সাহেব বললেন, তুই কোথায় আছিস ঠিকানাটা রেখে যা।
ঠিকানা দেয়া যাবে না মামা। মাকে বলবে আমি ভাল আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আমি বললে বিশ্বাস করবে না। তুই মরে গেছিস এটা বললে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে কিন্তু বেঁচে আছিস বললে করবে না। তুই একটা কাজ কর, একটা কাগজে লেখ- আমি ভাল আছি। তারপর নাম সই করে দে। আজকের তারিখ দিবি।

আলম লিখল- 'ভাল আছি মা'। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিখল, 'শিগগিরই তোমাকে দেখতে আসব' দ্বিতীয় লাইনটি লিখে তার একটু খারাপ লাগতে লাগল। 'শিগগিরই তোমাকে দেখতে আসব' এই লাইনটিতে কোথায় যেন একটু বিষাদের ভাব আছে। দেখতে আসা হবে না এই কথাটি যেন এর মধ্যে লুকানো।

শরীফ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, একটা লাইন লিখতে গিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস দেখি। তাড়াতাড়ি কর।

আলম কাগজটা মামার হাতে ধরিয়ে নিউ পল্টনে চলে এল। বসবার ঘরে সাদেক তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাদেককে কেমন অচেনা লাগছে।

ফর্সা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ। সে গোঁফ ফেলে দিয়েছে। লম্বা চুল ছিল। সেগুলি কেটেছে। জুতো জোড়াও চক চক করছে। আলম বলল, খোলশ পাল্টে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। চেনা যাচ্ছে না।

ঢাকা শহরে ঢুকলাম এতদিন পর। সেজেগুজে ঢুকব না? তুই ছিলি কোথায়? দেড় ঘন্টা ধরে এক জায়গায় বসে আছি।

আজ আসবি বুঝব কি করে? আমি তো ভাবলাম প্রোগ্রাম ক্যানসেল। সব বাতিল।
ক্যানসেল হওয়ার মতই।
কি বললি?
রহমানের খোঁজ নেই। নো ট্রেস।
নো ট্রেস মানে?

নো ট্রেস মানে নো ট্রেস। সে আমার সঙ্গেই ঢাকায় ঢুকেছে। তারপর যেখানে যাবার কথা সেখানে যায় নি। কোথায় আছে তাও কেউ জানে না। একগাদা এক্সপ্লোসিভ তার সাথে।

বলিস কি?

আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। ডুব মারলাম। তিনদিন ডুব দিয়ে থাকার পর গেলাম ঝিকাতলা। কনটাক্ট পয়েন্টে। সেখানেও ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই।

এখন ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে আছে?

বলছি। তার আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কিডনী ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা। হেভী প্রেসার।

আলম ইতস্তত করে বলল, এখানে বাথরুমের একটু অসুবিধা আছে। বাইরে চলে যা, রাস্তার পাশে কোথাও বসে পড়। সাদেক বেরিয়ে গেল। এ বাড়িতে এসে সে খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। দেড় ঘন্টা একা একাই বসে ছিল। এর মধ্যে ঘোমটা দেয়া এক মহিলা এসে বললেন, আলম বাইরে গেছে। এসে

পড়বে। তুমি বস। এর রকম শীতল কণ্ঠ সাদেক এর আগে শুনেনি। যেন একজন মরা মানুষ কথা বলছে।

প্রায় আধ ঘন্টা পর বাইশ তেইশ বছর বয়েসী চকলেট রঙা শাড়ি পরা একটি মেয়ে এসে ঢুকল এবং সরু চোখে তাকিয়ে রইল। এ রকম রূপবতী মেয়েদের সাধারণত সিনেমা পত্রিকার কভারে দেখা যায়। বাড়িতে তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সাদেক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কিছু বলবেন আমাকে ? মেয়েটি তার মার মত শীতল গলায় বলল, আপনি কি দুপুরে এখানে খাবেন ?

কি অদ্ভুত কথা। অচেনা, অজানা একটা মানুষকে কেউ এভাবে বলে নাকি ? সাদেক অবশ্যি নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে বলল, জ্বি খাব। দুপুরে কি রান্না হচ্ছে ?

মেয়েটি এই কথার জবাব দেয় নি। ভেতরে চলে গেছে। তারপর খটাং খটাং শব্দ। সেলাই মেশিন চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি চায়ের কাপ নিয়ে এসেছে কিছুক্ষণ পর। কাপ নামিয়ে বলেছে- চিনি লাগবে কিনা বলুন।

না লাগবে না।

চুমুক দিয়ে বলুন। চুমুক না দিয়েই কিভাবে বললেন ?

সাদেক চুমুক দিয়েছে। তার বাথরুমে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এ রকম রূপবতী একটি মেয়েকে নিশ্চয়ই বলা যায় না- আমি একটু ইয়েতে যাব। সাদেক বসে বসে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'প্রথম কদম ফুল' পড়ে ফেলল। বইটা থাকায় রক্ষা। নয়ত সময় কাটান মুশকিল হত। ফেরার সময় বইটা সঙ্গে করে নিতে হবে। কোন কাজ আধাআধি করে রাখা ঠিক না। মরে গেলে একটা আফসোস থাকবে।

সাদেক অল্প কথায় কিছু বলতে পারে না। কিংবা বলার চেষ্টাও করে না। রহমানের খোঁজ পাওয়া গেছে। সে ভালই আছে- এই খবরটা বের করতে আলমের এক ঘন্টা লাগল। তাও পুরোপুরি বের করা গেল না। কেন রহমান যেখানে উঠার কথা ছিল সেখানে উঠেনি সেটা জানা গেল না।

জিনিসপত্র সব এসেছে।

এসেছে কিছু কিছু।

কিছু কিছু মানে কি ?

কিছু কিছু মানে হচ্ছে কিছু কিছু।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, যা বলার পরিষ্কার করে বল। অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিচ্ছিস কেন ? কি কি জিনিসপত্র এসেছে ?

যা যা দরকার সবই এসেছে। শুধু এস এম জি আসে নি।

আসে নি কেন ?

আমাকে বলছিস কেন ? আর এ রকম ধমক দিয়ে কথা বলছিস কেন ? জিনিসপত্র আনার দায়িত্ব আমার ছিল না। এক্সপ্লোসিভ আনার কথা ছিল, নিয়ে এসেছি।

কোথায় সেগুলি ?

জায়গা মতই আছে।

প্রোগ্রামটা কি ?

সাদেক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, সেটা তুই ঠিক কর। তুই হচ্ছিস লিডার। তুই যা বলবি, তাই।

সবার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। ফাইন্যাল প্রোগ্রামটা শুধু ওদের জানাব। সেই ভাবে কাজ হবে। প্রথম দানেই ছক্কা ফেলতে হবে।

ছক্কা ফেলতে হবে মানে ?

সাদেক বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কি বাংলাও ভুলে গেছিস ? ছক্কা পাঞ্জাও তোর কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে ? প্রথম দানে ছক্কা মানে প্রথম অপারেশন হবে ক্লাস ওয়ান। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস। বুঝতে পারছিস ?

আলম চুপ করে রইল। সাদেক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, তুই কেমন অন্য রকম হয়ে গেছিস।

কি রকম ?

কেমন যেন সুখী সুখী চেহারা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুই এ বাড়ির জামাই। সাদেক গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। অস্বস্তিকর অবস্থা। আলম বিরক্তমুখে বলল, এত হাসছিস কেন ? হাসির কি হয়েছে ?

তুই কেমন পত্‌পত্‌ হয়ে গেছিস তাই দেখে হাসি আসছে। মোনালিসার প্রেমে পড়ে গেছিস নাকি ?

চুপ কর।

ভাবভঙ্গি তো সে রকমই। মজনু মজনু ভাব। অবশ্যি যে জিনিস দেখলাম প্রেমে পড়াই উচিত।

সাদেককে আটকান মুশকিল। যা মনে আসবে বলবে। আলম চিন্তায় পড়ে গেল। সে গম্ভীর গলায় বলল, আজেবাজে কথা বন্ধ কর। কাজের কথা বল। মোটামুটি একটা প্ল্যান দাঁড় করান যাক। আমরা বেরুব কখন ?

কার্ফুর আগে আগে বের হওয়াই ভাল। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল সে সময়টায় বেশি থাকে। গাড়ি-টারি চলে। সময়টা ধর সাড়ে তিন থেকে চার।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বিন্তি এসে বলল, আপনেরে খাইতে ডাকে। আহেন।

খাবার টেবিল বারান্দায়। খাবার দেয়া হয়েছে দুজনকেই। এ বাড়ির কেউ বসেনি। সুরমা দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, নিজেরা নিয়ে খাও। সাদেক সঙ্গে সঙ্গে বলল, কোন অসুবিধা নেই খালাম্মা। আপনার থাকতে হবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন লজ্জা নেই।

লজ্জা না থাকাই ভাল।

আমার কোন কিছুতেই লজ্জা নেই। আলমের সঙ্গে আমার বনে না এই জন্যেই। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভেজে আনতে বলুন তো খালাম্মা। ঝাল কম হয়েছে।

সুরমা নিজেই গেলেন। সাদেক মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। মৃদু স্বরে বলল, বেশি পরিষ্কার। ভাগ্যিস এ বাড়িতে আমি উঠিনি। আমার এখানে উঠার কথা ছিল। বাড়ির মালিক কি করেন ?

জানি না কি করেন ?

বলিস কি, ভদ্রলোক কি করেন জানিস না ?

না।

মেয়েটার নাম কি ? না তাও জানিস না ?

ওর নাম রাত্রি।

রাত্রি ? বাহ, চমৎকার তো ! জোছনা রাত্রি নিশ্চয়ই। হা হা হা।

আস্তে হাস।

সুরমা কাঁচের প্লেটে ভাজা শুকনা মরিচ নিয়ে ঢুকতেই সাদেক বলল, রাত্রি খাবে না ? হোস্টদের তরফ থেকে কারোর বসা উচিত। সুরমা শান্ত স্বরে বললেন, তোমরা খাও, ওরা পরে খাবে।

পরে খাবে কেন ? ডাকুন, গল্প গুজব করতে খাই।

সুরমা অনেকক্ষণ সাদেকের দিকে তাকিয়ে থেকে সত্যি সত্যি রাত্রিকে ডাকলেন। এবং আশ্চর্য ! রাত্রি একটি কথা না বলে খেতে বসল। সাদেক হাত-টাত নেড়ে একটা হাসির গল্প শুরু করল। ছোটবেলায় দৈ মনে করে এক খাবলা চুন খেয়ে তার কি দশা হয়েছিল। দশ দিন মুখ বন্ধ করতে পারেনি। হা করে থাকতে হত। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ভেটকি মাছ। ভেটকি মাছ মুখ বন্ধ করে না, হা করে থাকে। গল্প শুনে কেউ হাসল না। সাদেক একাই বারান্দা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।

ফার্স্ট ক্লাস রান্না হয়েছে খালাম্মা। খাওয়ার পর আমি পান খাব। পান আছে ঘরে ? না থাকলে বিন্তিকে পাঠিয়ে দিন, নিয়ে আসবে।

সুরমা বিন্তিকে পান আনতে পাঠালেন। সাদেক রাত্রির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন ? রাত্রি কিছু বলল না।

আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নিশ্চয়ই। চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েগুলি গম্ভীর হয় খুব।

আমি ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি।

কোন সাবজেক্ট ?

কেমিস্ট্রি।

সর্বনাশ ! মেয়েরা এত কঠিন কঠিন সাবজেক্ট কেন পড়ে বুঝতে পারি না। মেয়েরা পড়বে বাংলা।

রাত্রি উঠে পড়ল। আলম একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করল। রাত্রি মেয়েটি বিরক্ত হয়নি। সাদেকের কথাবার্তার ধরনে যে-কেউ বিরক্ত হত। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মেয়েটি হয়নি। হাত ধুয়ে এসে সে আবার চেয়ারে বসল এবং চামচে করে ভাত তুলে দিল সাদেকের প্লেটে। তুলে দেয়ার ভঙ্গিটা সহজ ও

স্বাভাবিক।

সাদেক দুপুর তিনটা পর্যন্ত থাকল। মৃদু গলায় প্ল্যান নিয়ে কথা বলল। প্রথম দিনের অপারেশনের জায়গাগুলি ঠিক করল। 'রেকি' করবার কি ব্যবস্থা করা যায় সে নিয়ে কথা বলল। অপারেশন চালাতে হবে অচেনা গাড়ি দিয়ে। সেই গাড়ির যোগাড় কিভাবে করা যায় সেই নিয়েও কথা হল। আগামীকাল ভোরে আবার বসতে হবে। এ বাড়িতে নয়। পাক মটরস-এর কাছের একটি বাড়িতে। সেখানে রহমানও থাকবে। প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করা হবে সেখানেই।

সাদেক যাবার আগে সুরমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুরমা হকচকিয়ে গেলেন। দোয়া করবেন খালাম্মা। হ্যাঁ নিশ্চয়ই দোয়া করব।

রাত্রিকে ডাকুন। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

রাত্রি এল। খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাদেক বলল, রাত্রি চলি। আবার দেখা হবে। যেন এ বাড়ির সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের চেনাজানা। রোজই আসছে, যাচ্ছে। রাত্রি হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভাল থাকবেন।

সাদেক ঘর থেকে বেরুবামাত্র রাত্রি বলল, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কোন মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ দু'রকম। ও কি আপনার খুব ভাল বন্ধু?

হ্যাঁ ভাল বন্ধু। ও কিন্তু একটি অসম্ভব ভাল ছেলে।

তা জানি।

কিভাবে জানেন?

কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। আপনার হয়ত ধারণা হয়েছে আমি উনার উপর বিরক্ত হয়েছি। এটা ঠিক না। আমি বিরক্ত হইনি।

অনেক দিন পর আলম দুপুর বেলা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মিলাবার পর। বিন্তি চায়ের পেয়ালা হাতে তাকে ডাকছে। বাইরে প্রবল বর্ষণ। ঘোর বর্ষা যাকে বলে। মতিন সাহেব বসে আছেন সোফায়। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে। আলম উঠে বসতেই তিনি বললেন, শরীর খারাপ করেছে নাকি?

জ্বি না।

হাত-মুখ ধুয়ে আস। একটা খারাপ খবর আছে।

কি সেটা?

আমেরিকানরা সেভেনথ ফ্লিট নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে।

আলম এই খবরে তেমন কোন উৎসাহ দেখাল না। তার কাজকর্মের সঙ্গে আমেরিকান সেভেনথ ফ্লিটের কোন সম্পর্ক নেই। মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, এর চেয়েও একটা খারাপ সংবাদ আছে।

বলুন শুনি।

ঢাকা শহরে চাইনিজ সোলজার দেখা গেছে।

আপনি নিজে দেখেছেন?

না, আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু দেখেছেন অনেকেই। নাক চেঁপ্টা বাঁটু সোলজার। দেখলেই চেনা যায়।

আলম বাসিমুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। গুজবে ভর্তি হয়ে গেছে ঢাকা শহর। মানুষের মরাল ভেঙে পড়ছে। ঢাকা শহরের গেরিলাদের প্রথম কাজই হবে এই মরাল ঠিক করা। নতুন ধরনের গুজবের জন্ম দেয়া।

যা শুনে একেকজনের বুকের ছাতি ফুলে উঠবে। এরা রাতে আশা নিয়ে ঘুমুতে যাবে। মতিন সাহেবের মত প্রাণহীন মুখ করে সোফায় বসে থাকবে না।

আলম।

বলুন।

শুনলাম তোমার এক বন্ধু নাকি এসেছিল?

জ্বি।

কাজ তাহলে শুরু হচ্ছে?

হচ্ছে।

অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে ওদের, কি বল?

তা হবে।
এক লাখ নতুন কবর হবে, কি বল?
হওয়ার তো কথা।
যশোহরের এক পীর সাহেব কি বলেছেন শুনবে কি?
বলুন।
খুবই কামেল আদমী। সূফী মানুষ।
মতিন সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যশোহরের পীর সাহেবের কথা বলতে লাগলেন। আলম কোন কথা না বলে গল্প শুনে গেল। ডুবন্ত মানুষরাই খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। ঢাকার মানুষ কি ডুবন্ত মানুষ? তারা কেন এ রকম করবে? আলম একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল।
রাত্রির ঘর অন্ধকার। সে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিল। অপালা এসে বলল, ফুফু টেলিফোন করেছে। তোমাকে ডাকে। রাত্রি একবার ভাবল টেলিফোন ধরবে না। বলে পাঠাবে- শরীর ভাল না, জ্বরজ্বর লাগছে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। ফুফু বলবেন রিসিভার এ ঘরে নিয়ে আসতে। তার চেয়ে টেলিফোন ধরাই ভাল।
কেমন আছিস রাত্রি?
ভাল।
তোদের ইউনিভার্সিটি নাকি খুলেছে? ক্লাস-টলাস হচ্ছে?
হ্যাঁ হচ্ছে।
তুই যাচ্ছিস না?
না।
পরীক্ষা নাকি ঠিকমত হবে শুনলাম?
হলে হবে।
তোর গলাটা এত ভারি ভারি লাগছে কেন? জ্বর নাকি?
না, জ্বর না।
কাল গাড়ি পাঠাব। চলে আসবি আমার এখানে।
আচ্ছা।
আরেকটা কথা শোন, ঐ ভদ্রমহিলা আসবেন তোকে দেখতে। দেখলেই যে বিয়ে হবে এমন তো কোন কথা না। তোর মত মেয়েকে কি কেউ জোর করে বিয়ে দিতে পারে? তোর অনিচ্ছায় কিছু হবে না। বুঝতে পারছিস?
পারছি।
কাজেই ভদ্রমহিলা এলে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবি।
ঠিক আছে বলব।
রাত্রি আরেকটা কথা শোন- আমাদের ড্রাইভার বলল সে দেখেছে কে একজন লোক তোদের বসার ঘরের ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে। কে সে?
আব্বার এক বন্ধুর ছেলে।
এখানে সে কি করছে?
কি একটা কাজে ঢাকায় এসেছে। থাকার জায়গা নেই। বুধবারে চলে যাবে।
নাসিমা বিরক্ত স্বরে বললেন- থাকার জায়গা নেই মানে? হোটেল আছে কি জন্যে? বাড়িতে সেয়ানা মেয়ে। এর মধ্যে ছেলে-ছোকরা এনে ঢুকানোর মানেটা কি? দেখি তোর বাবাকে টেলিফোনটা দে তো।
মতিন সাহেব টেলিফোনটা ধরতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি বিবিসি শুনছেন। এই অবস্থায় তাঁকে হাতী দিয়ে টেনেও কোথাও নেয়া যাবে না। বিবিসি একটা বেশ মজার খবর দিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমেরিকান টিভি এনবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- আলোচনার দ্বার রুদ্ধ নয়। এর মানে কি? কি আলোচনা? কার সঙ্গে আলোচনা? হাতী কি কাদায় পড়ে গেছে নাকি? এঁটেল মাটির কাদা। মতিন সাহেব অনেক দিন পর ঢাকা রেডিও খুললেন। মাঝে-মধ্যে এদের কথাও শোনা দরকার। তেমন কোন খবর নেই। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের কারণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমেদ। মুসলিম লীগের সভাপতি হাশিমউদ্দীনের বিবৃতিও খুব ফলাও করে প্রচার করা হল-

ছাত্র-ছাত্রীরা যেন দেশদ্রোহীদের দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়। তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর নষ্ট না করে। শান্তিপূর্ণভাবে মেট্রিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে সরকার যা করণীয় সবই করবেন।

পনেরই জুলাই থেকে মেট্রিক পরীক্ষা। ঐ দিন একটা শো-ডাউন হবে বলে মতিন সাহেবের ধারণা। মুক্তিবাহিনীর আজদহারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা বানচাল করবার কাজে নামবে। ঐ দিন একটা উলট পালট হয়ে যাবে। এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। মতিন সাহেব তাঁর রক্তের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন।

সুরমা রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন। তাঁর মুখ বিষণ্ণ। কোন কারণে তিনি খুবই বিচলিত। কারণটি কি নিজেও স্পষ্ট জানেন না। মাঝে মাঝে তাঁর এ রকম হয়। রাত্রি এসে মার পাশে দাঁড়াল। সুরমা বললেন, কিছু বলবি ?

হ্যাঁ মা, উনাকে ভেতরের ঘরে থাকতে দেয়া উচিত।

আলমের কথা বলছিস ?

হ্যাঁ। বসার ঘরে থাকলেই সবার চোখে পড়বে। ফুফু টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁদের ড্রাইভার দেখে গেছে।

এখন আবার ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলে সেটা কি আরো বেশি করে চোখে পড়বে না ?

রাত্রি কিছু বলতে পারল না। বেশির ভাগ সময়ই সুরমা চমৎকার যুক্তি দিয়ে কথা বলেন।

রাত্রি।

বল মা।

ভেতরে নেয়ার আরেকটি সমস্যা কি জানিস ? ছেলেটি অস্বস্তি বোধ করবে। একবার ভেতরে নেয়া হচ্ছে একবার বাইরে। আবার ভেতরে। আমি কি ঠিক বলছি রাত্রি ?

ঠিকই বলছ।

সুরমা অস্পষ্টভাবে হাসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, তোর যখন ইচ্ছা তাকে ভেতরেই নিয়ে আয়। বিন্তিকে বল ঘর পরিষ্কার করতে। অপালা কি করছে ? তাকে তো কোন কাজেই পাওয়া যায় না। মুখের সামনে গল্পের বই ধরে বসে আছে। ওকেও লাগিয়ে দে।

রাত্রি কাউকে লাগাল না, নিজেই পরিষ্কার করতে লাগল। সুরমা এক সময় উঁকি দিলেন। চমৎকার সাজান হয়েছে। জানালায় পর্দা দেয়া হয়েছে। একটা ছোট্ট বুক সেলফ আনা হয়েছে। বুক সেলফ ভর্তি বই। অপালার পড়ার টেবিলটিও আনা হয়েছে ঘরে। টেবিলে চমৎকার টেবিল ক্লথ। পিরিচ দিয়ে ঢাকা পানির জগ এবং গ্লাস। সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কি রাত্রি ?

রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেল। তার গাল ঈষৎ লাল হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনও সুরমার চোখ এড়িয়ে গেল না। তিনি হালকা স্বরে বললেন, ছেলেটা হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে কি ভাববে বলত ?

কিছুই ভাববেন না। উনি অন্য ব্যাপারে ডুবে আছেন। কিছুই তাঁর চোখে পড়বে না। উনি আছেন একটা ঘোরের মধ্যে।

তুই যা করেছিস চোখে না পড়ে উপায় আছে ?

আলমের কিছু চোখে পড়ল বলে মনে হল না। সে সহজভাবেই ভেতরের ঘরে চলে এল। 'প্রথম কদম ফুল'-এর পাতা উল্টাতে লাগল। রাত্রি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাসিমুখে বলল- বইটা কেমন লাগছে ?

ভাল।

ছেলেটার উপর আপনার রাগ লাগছে না ?

কোন ছেলেটার উপর ?

কাকলীর হাজবেণ্ড।

না, রাগ লাগবে কেন ?

আপনার কি আর কিছু লাগবে ?

না, কিছু লাগবে না।

ড্রয়ারে মোমবাতি আছে। যদি বাতি নিভে যায় মোমবাতি জ্বালাবেন।

ঠিক আছে, জ্বালাব।

রাত দশটায় মতিন সাহেব আলমকে ডাকতে এলেন ভয়েস অব আমেরিকা শুনবার জন্যে। আলম বলল তার মাথা ধরেছে, সে শুয়ে থাকবে। মতিন সাহেব তবু অনেকক্ষণ ঝুলাঝুলি করলেন। একা একা তার কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না। আজ রাত্রিও নেই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ঢুকলেন। সুরমা জেগে আছে এখনো। আলনায় কাপড় রাখছে। মতিন সাহেব ভয়ে ভয়ে বললেন, সুরমা ভয়েস অব আমেরিকা শুনবে? সুরমা শীতল গলায় বললেন, না। আজ কিছু ইন্টারেস্টিং ডেভলপমেন্ট শুনা যাবে বলে আমার ধারণা।

সুরমা জবাব দিলেন না।

পাঁচ

আলমের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আঁধার তখনো কাটেনি। চারদিকে ভোর হবার আগের অদ্ভুত নীরবতা। কিছুক্ষণের ভেতরই সূর্য উঠার মত বিরাট একটা ঘটনা ঘটবে। প্রকৃতি যেন তার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলম নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে আজানের শব্দ হতে লাগল। ঢাকা শহরে এত মসজিদ আছে? আলম হকচকিয়ে গেল। ভোরবেলায় অদ্ভুত অন্ধকারে চারদিক থেকে ভেসে আসা আজানের শব্দে অন্য রকম কিছু আছে। কেমন যেন ভয়ভয় লাগে। আলমের প্রায় সারাজীবন এই শহরেই কেটেছে কিন্তু সকালবেলার এই ছবির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সব মানুষই বোধ হয় অনেক কিছু না জেনে বড় হয়।

সুরমা বারান্দায় বসে অজু করছিলেন। আলমকে বেরুতে দেখে বেশ অবাক হলেন। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, রাতে ঘুম হয়নি? তাঁর গলায় খানিকটা উদ্বেগ ছিল। আলমকে তা স্পর্শ করল। সে হাসিমুখে বলল, ভাল ঘুম হয়েছে। খুব ভাল। আপনি কি রোজ এ সময়ে জাগেন?

হ্যাঁ। নামাজ পড়ি। নামাজ শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে রাত্রি ডেকে তুলে।

সুরমা হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটা হাসির কথা বলেছেন। ভোরবেলার বাতাসে কিছু একটা বোধ হয় থাকে। মানুষকে তরল করে ফেলে।

আলম বলল, আজ আমাদের একটা বিশেষ দিন।

বুঝতে পারছি। তোমার কি ভয় লাগছে?

ভয় না। অন্য রকম লাগছে। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ঘন্টা পড়বার সময় যে রকম লাগে সে রকম।

কিন্তু এ ধরনের কাজ তো তুমি এর আগেও করেছ।

তা করেছি। অবশ্যি এখানকার অবস্থাটা অন্য রকম।

তুমি কি আল্লাহ বিশ্বাস কর? তোমার বয়েসী যুবকরা খানিকটা নাস্তিক ধরনের হয় সেই জন্যে বলছি।

আলম কিছু বলল না। সুরমা তার প্রশ্নের জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। জবাব পেলেন না। তিনি হালকা গলায় বললেন, নামাজ শেষ করে এসে আমি একটা দোয়া পড়ে তোমার মাথায় ফুঁ দিতে চাই। তোমার কোন আপত্তি আছে?

না, আপত্তি থাকবে কেন?

ঠিক আছে, আমি নামাজ শেষ করে আসছি। রাত্রিকে ডেকে দিচ্ছি সে তোমাকে চা বানিয়ে দেবে।

ডাকতে হবে না। আমার এত সকালে চা খাবার অভ্যেস নেই।

সুরমা রাত্রিকে ডেকে তুললেন। সাধারণত ফজরের নামাজ তিনি চট করে সেরে ফেলেন কিন্তু আজ অনেক সময় নিলেন। কোথায় যেন পড়েছিলেন নামাজের শেষে পার্থিব কিছু চাইতে নেই। তাতে নামাজ নষ্ট হয়। কিন্তু আজ তিনি পার্থিব জিনিসই চাইলেন। অসংখ্যবার বললেন, এই ছেলেটিকে নিরাপদে রাখ। ভাল রাখ। সে যেন সন্ধ্যাবেলা আবার ঘরে ফিরে আসে। হারিয়ে না যায়।

বলতে বলতে এক সময় তাঁর চোখে পানি এসে গেল। একবার পানি এসে গেলে খুব মুশকিল। তখন যাবতীয় দুঃখের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুতেই আর কান্না থামান যায় না। সুরমার তাঁর বাবার কথা মনে পড়ল। ক্যানসার হয়ে যিনি অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে পানি খেতে চেয়েছিলেন। চামচে করে পানি খাওয়াতে হয়। কি আশ্চর্য! একটা চামচ সেই সময় খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হাতে আঁজলা করে পানি নিয়ে গেলেন সুরমা। সেই পানি মুখ পর্যন্ত নিতে নিতে আঙুল গলে নিচে পড়ে গেল। অতি কষ্টের মধ্যেও এই দৃশ্য দেখে তাঁর বাবা হেসে ফেললেন। তাঁর পানি খাওয়া হল না। কত অদ্ভুত মানুষের জীবন!

রাত্রি ঘরে ঢুকে দেখল, তার মা জায়নামাজে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছেন। কান্নার জন্যেই শরীর বারবার কেঁপে উঠছে। সে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। আলমকে চা দিয়ে আসা হয়েছে। আবার সেখানে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে অর্থহীন গল্পগুজব করতে ইচ্ছা করে। রাত্রি আলমের ঘরে উঁকি দিল।

আবার এলাম আপনার ঘরে।

আসুন।

চিনি হয়েছে কিনা জানতে এসেছি।

হয়েছে। থ্যাংকস।

রাত্রি খাটে গিয়ে বসল। আলমের কেমন লজ্জা করতে লাগল। রাত্রির গায়ে আলখাল্লা জাতীয় লম্বা পোশাক, সাধারণ নাইটির মত বাহারী কোন জিনিস নয়। এই পোশাকে তাকে অন্য রকম লাগছে। সে পা দোলাতে দোলাতে বলল, আপনি আজ এত ভোরে উঠেছেন কেন ?

জানি না কেন। ঘুম ভেঙে গেল।

টেনশন থাকলে ঘুম ভেঙে যায়।

তা যায়।

আমার উল্টোটা হয়। টেনশনের সময়ে শুধু ঘুম পায়।

একেকজন মানুষ একেক রকম।

তা ঠিক। আমরা সবাই আলাদা।

আলম সিগারেট ধরাল। তার সিগারেটের কোন তৃষ্ণা হয়নি। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে ধরানো। তার অস্বস্তির ব্যাপারটা কি মেয়েটি টের পাচ্ছে ? পাচ্ছে নিশ্চয়ই। এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি মেয়েরা সহজেই টের পায়। আলম বলল, আপনি খুব ভোরে উঠেন ?

হ্যাঁ উঠি। অন্ধকার থাকতে আমার ঘুম ভাঙে। খুব খারাপ লাগে তখন।

খারাপ লাগে কেন ?

সবাই ঘুমুচ্ছে আমি জেগে আছি এই জন্যে। যখন ছোট ছিলাম তখন গেট খুলে বাইরে যেতাম। একা একা হাঁটতাম। ছোটবেলায় আমি খুব সাহসী ছিলাম।

এখন সাহসী না ?

না। ছোটবেলায় আমি একটি কুৎসিত ঘটনা দেখি। তারপর আমার সব সাহস চলে যায়। আমি এখন একটি ভীরু ধরনের মেয়ে।

রাত্রি তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। পা দোলাচ্ছে না। কাঠিন্য চলে এসেছে তার চোখে-মুখে। আলম অবাক হয়ে এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ম পরিবর্তনটি লক্ষ্য করল। রাত্রি বলল, আমি কি দেখেছিলাম তা তো জিজ্ঞেস করলেন না ?

জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন না, তাই জিজ্ঞেস করিনি।

ঠিক করেছেন। আমি বলতাম না, কাউকেই বলিনি। মাকেও বলিনি। যাই কেমন ?

রাত্রি উঠে দাঁড়াল। এবং দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রির ফুফু নাসিমার বয়স চল্লিশের উপরে। কিন্তু তাঁকে দেখে সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। এখনো তাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণীর মত লাগে। ভিড়ের মধ্যে লোকজন তাঁর গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। একবার এরকম একটা ছোকরাকে তিনি হাতেনাতে ধরে ফেললেন এবং হাসিমুখে বললেন, তোমার বয়স কত খোকা ? ছেলেটি এ জাতীয় দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ঘেমে নেয়ে উঠল। নাসিমা ধারাল গলায় বললেন, আমার বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বুঝতে পারছ ?

তাঁর বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এটা ঠিক না। নাসিমার কোন ছেলেপুলে নেই। বড় মেয়ে বলতে তিনি বুঝিয়েছেন রাত্রিকে। বাইরের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে- আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ? তিনি সহজভাবেই বলেন, আমার কোন ছেলে নেই। দু'টি মেয়ে- রাত্রি এবং অপালা। এটা তিনি যে শুধু বলেন তাই না, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেন। তাঁর বাড়িতে এদের দুজনের জন্যে দু'টি ঘর আছে। সেই ঘর দু'টি ওদের ইচ্ছামত সাজান। সপ্তাহে খুব কম হলেও তিনদিন এই ঘর দু'টিতে দু'বোনকে থাকতে হয়। নয়ত নাসিমা অস্থির হয়ে যান। তাঁর কিছু বিচিত্র অসুখ দেখা দেয়। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে যার কিছু মিল আছে।

নাসিমার স্বামী ইয়াদ সাহেব লোকটি রসকষহীন। চেহারা চালচলন সবই নির্বোধের মত কিন্তু তিনি নির্বোধ নন। কোন নির্বোধ লোক একা একা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম শুরু করে বারো বছরের মাথায় কোটিপতি হতে পারে না। ইয়াদ সাহেব হয়েছেন। যদিও এই বিত্ত তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতির উপর কোন রকম ছাপ ফেলেনি। তিনি এখনো গায়ে তেল মেখে গোসল করেন। এবং স্ত্রীকে ভয় করেন। অসম্ভব রকম বিত্তবান লোকজন স্ত্রীদের ঠিক পরোয়া করে না।

ভোর আটটায় নাসিমা ইয়াদ সাহেবকে ডেকে তুললেন। তাঁর ডাকার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে ইয়াদ সাহেবের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। তিনি ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, কি হয়েছে ?

তোমার গাড়ি পাঠালাম রাত্রিদের আনবার জন্যে।

ও আচ্ছা।

ইয়াদ সাহেব আবার ঘুমুবার আয়োজন করলেন।

তুমি কিন্তু আজ অফিসে-টফিসে যাবে না।

কেন ?

আজ রাত্রিকে দেখতে আসবে। তোমার থাকা দরকার।

আমি থেকে কি করব ?

কিছু করবে না। থাকবে আর কি। এসব কাজে ব্যাকগ্রাউণ্ডে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার।

দরকার হলে থাকব। এখন একটু ঘুমাই, কি বল ?

আচ্ছা ঘুমাও।

ইয়াদ সাহেব চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরলেন। ছুটে যাওয়া ঘুম ফিরে এল না। কিছুদিন থেকেই তাঁর দিন কাটছে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায়। মোহাম্মদপুরের তাঁদের মূল বাড়িটি বিহারীদের দখলে। দেশ স্বাধীন না হলে এ বাড়ি ফিরে পাওয়া যাবে না। অসম্ভব। দেশ চট করে স্বাধীন হয়ে যাবে এ রকম কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। চট করে পৃথিবীর কোন দেশই স্বাধীন হয়নি। ইংরেজ তাড়াতে কত দিন লেগেছে ? এখানেও তাই হবে। বছরের পর বছর লাগবে। তারপর এক সময় বাঙালীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এই একটা অদ্ভুত জাতি। নিমিষের মধ্যে উৎসাহে পাগল হয়ে ওঠে, আবার সে উৎসাহ নিভেও যায়।

ইয়াদ সাহেব উঠে বসলেন। কাজের ছেলেটিকে বেড টি-র কথা বলে চুরুট ধরালেন। তাঁর বমি বমি ভাব হল। তিনি বিছানা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে বারান্দায় গেলেন। বারান্দার সামনে ঘুপচি মত গলি। মোহাম্মদপুরের বিশাল বাড়ি ছেড়ে তাকে থাকতে হচ্ছে ভাড়া বাড়িতে যার সামনে ঘুপচি গলি। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে কি দেশ স্বাধীন হবে ? ফিরে পাওয়া যাবে নিজের বাড়ি ? ইয়াদ সাহেব খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা চাইছেন ব্যক্তিগত স্বার্থে- এটা ঠিক হচ্ছে না।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে তিনি বাসিমুখে নিজের স্টাডি রুমে ঢুকলেন। তাঁর অফিসের যাবতীয় কাগজপত্র এই ছোট্ট ঘরটিতে আছে। এখানে তিনি দীর্ঘ সময় কাটান। নিজের তৈরি ব্লু প্রিন্টগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে তাঁর ভাল লাগে। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। আলস্য অনুভব করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কিছুই নেই। সব রকম কনসট্রাকশনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সরকারের কাছে মোটা অংকের টাকা পাওনা। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। যাবেও না সম্ভবত। সব জলে যাবে। তাঁর মতে বাঙালীদের এই যুদ্ধে সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কনসট্রাকশন ফার্মগুলি। এদের কোমর ভেঙে গেছে। এই কোমর আর ঠিক হবে না। দেশ স্বাধীন হলেও না। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। কলিং বেল বাজছে। মেয়ে দুটি এসেছে নিশ্চয়ই। এদের তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু তবু তিনি হাসিমুখে দরজা খুলে বের হলেন। এবং অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন- রাত্রি মা, কেমন আছ ?

ভাল আছি ফুফা।

অপালা মা, মুখটা এমন কালো কেন ?

অপালা জবাব দিল না। সে তার ফুফাকে পছন্দ করে না। একেবারেই না। ইয়াদ সাহেব বললেন, কি গো মা, কথা বলছ না কেন ?

কথা বলতে ভাল লাগছে না, তাই বলছি না।

ইয়াদ সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। এটিই কি সেই দোকান ? নাম অবশ্যি সে রকমই- মডার্ন নিওন সাইনস। এখানেই সবার জড় হবার কথা। কিন্তু দোকানটি সদর রাস্তার উপরে। তাছাড়া ভেতরে যে লোকটি বসে আছে তার চেহারা কেমন বিহারী বিহারী। কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কোন বাঙালী ছেলে এই সময়ে এমনভাবে হাসবে না। এটা হাসির সময় না। আলম দোকানে ঢুকে পড়ল।

চেক হাওয়াই শার্ট পরা ছেলেটির ঠোঁটের উপর সূঁচালো গোঁফ। গলায় সোনার চেইন বের হয়ে আছে। রোগা টিঙটিঙে কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি কেমন উদ্ধত। ছেলেটি টেলিফোন নামিয়ে রাগী গলায় বলল, কাকে চান ?

এটা কি মডার্ন নিওন সাইন ?

হ্যাঁ।

আমি আশফাক সাহেবকে খুঁজছি।

আমিই আশফাক। আপনার কি দরকার ?

আমার নাম আলম।

ছেলেটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হল কিন্তু কথা বলল নরম গলায়— আপনি ভেতরে ঢুকে যান। সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান।

আর কেউ এসেছে ?

রহমান ভাই এসেছে। যান, আপনি ভেতরে চলে যান।

ভেতরটা অন্ধকার। অসংখ্য নিওন টিউব চারদিকে ছড়ান। একজন বুড়োমত লোক এই অন্ধকারেই বসে কি সব নকশা করছে। সে একবার চোখ তুলে আলমকে দেখল। তার কোন রকম ভাবান্তর হল না। চোখ নামিয়ে নিজের মত কাজ করতে লাগল।

দোতলায় দু'টি ঘর। একটিতে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলছে। অন্যটি খোলা। রঙিন পর্দা ঝুলছে। রেলিং-এ মেয়েদের কিছু কাপড়। ঘরের ভেতর থেকে ক্যাসেটে গানের শব্দ আসছে— হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা মলমল। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। সে মৃদু স্বরে ডাকল, রহমান রহমান।

রহমান বেরিয়ে এল। তার গায়ে একটি ভারী জ্যাকেট। মুখ শুকনো। এমনিতেই সে ছোটখাট মানুষ। এখন তাকে আরো ছোট দেখাচ্ছে। রহমান হাসতে চেষ্টা করল।

আসুন আলম ভাই।

তোমার এই অবস্থা কেন ? কি হয়েছে ?

শরীর খারাপ করে ফেলেছে। জ্বর, সর্দি, কাশি বুড়োদের অসুখ-বিসুখ। একশ দুই। অসুবিধা হবে না। চারটা এ্যাসপিরিন খেয়েছি। জ্বর নেমে যাবে। সকালে একশ তিন ছিল। ভেতরে আসুন আলম ভাই।

ভেতরে কে কে আছে ?

কেউ এখনো এসে পৌঁছেনি। আমি ফার্স্ট, আপনি সেকেণ্ড। এসে পড়বে।

আলম ঘরে ঢুকল। ছোট্ট ঘর। আসবাবপত্রে ঠাসা। বেমানান একটা কারুকার্য করা বিশাল খাট। খাটের সঙ্গে লাগোয়া একটা স্টীলের আলমারী। তার একটু দূরে ড্রেসার। জানালার কাছে খাটের মতই বিশাল টেবিল। এত ছোট্ট একটা ঘরে এতগুলি আসবাবের জায়গা হল কিভাবে কে জানে।

আলম নিচু গলায় বলল, জিনিসপত্র সব কি এখানেই ?

সব না। কিছু আছে। বাকিগুলি সাদেকের কাছে। যাত্রাবাড়িতে।

আশফাক ছেলেটি কেমন ?

ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট গোল্ড। আপনার কাছে বিহারী বিহারী লাগছিল, তাই না ? চুল ছোট করে কাটায় এ রকম লাগছে। গলায় আবার চেইন-টেইন আছে। উর্দু বলে ফ্লুয়েন্ট।

বাড়ি কোথায় ?

খুলনার সাতক্ষীরায়।

ফ্লুয়েন্ট উর্দু শিখল কার কাছে ?

সিনেমা দেখে নাকি শিখেছে। 'নাচে নাগিন বাজে বীণ' নামের একটা ছবি নাকি সে ন'বার দেখেছে। আলম ভাই, পা তুলে বসেন।

আলম ঠিক স্বস্তি বোধ করছিল না। সে থেমে থেমে বলল, জায়গাটা কেমন যেন সেফ মনে হচ্ছে না।

প্রথম কিছুক্ষণ এ রকম মনে হয়। আমারো মনে হচ্ছিল। আশফাকের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বুঝবেন এটা অত্যন্ত সেফ জায়গা।

ছেলেটা একটু বেশি স্মার্ট। বেশি স্মার্ট ছেলেপুলে কেয়ারলেস হয়। আর জায়গাটা খুব এক্সপোজড। মেইন রোডের পাশে।

রহমান শান্ত স্বরে বলল, মেইন রোডের পাশে বলেই সন্দেহটা কম। আইসোলেটেড জায়গাগুলি বেশি সন্দেহজনক।

আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।

আপনার আসলে আশফাকের উপর কনফিডেন্স আসছে না। ও যাচ্ছে আমাদের সাথে।

ও যাচ্ছে মানে?

গাড়ি চালাবে। ওর একটা পিকআপ আছে। সাদেককে তো আপনিই বলেছেন দুটি গাড়ি থাকবে। পেছনেরটা কভার দেবে। অবশ্যি আপনি নিতে না চাইলে ওকে বাদ দেবেন।

নিচে বসে থাকা বুড়ো লোকটি চা আর ডালপুরি নিয়ে এল। রহমান শুয়ে পড়ল চোখ বন্ধ করে। তার বেশ ঘাম হচ্ছে। জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে বোধ হয়। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, চা খান আলম ভাই।

আলম চা বা ডালপুরিতে কোন রকম আগ্রহ দেখাল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। নায়িকাদের ছবি কেটে কেটে দেয়ালে লাগানো। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত আপত্তিকর। আলম বলল, মেয়েমানুষ কেউ কি থাকে এখানে?

জ্বি না।

রেলিং-এ মেয়েদের কিছু জামা-কাপড় দেখলাম।

আমি লক্ষ্য করিনি। আপনার মনের মধ্যে কিছু-একটা ঢুকে গেছে আলম ভাই।

আলম জবাব দিল না। গুনগুন করতে করতে আশফাক এসে ঢুকল। ফুর্তিবাজের গলায় বলল— চা-ডালপুরি কেউ খাচ্ছে না, ব্যাপারটা কি? ডালপুরি ফ্রেশ। আলম ভাই, খেয়ে দেখেন একটা। আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে এলাম।

বসুন।

ড্রাইভার হিসেবে আমাকে দলে নেন। দেখেন কি খেল দেখাই। আমার একটা পংখীরাজ আছে। দেখলে মনে হবে ঘণ্টায় দশ মাইলও যাবে না, কিন্তু আমি আশি মাইল তুলে আপনাকে দেখাব।

আলম শীতল গলায় বলল, আশফাক সাহেব, কিছু মনে করবেন না। এ জায়গাটা আমার সেফ মনে হচ্ছে না।

আশফাক হকচকিয়ে গেল। বিস্মিত গলায় বলল, সেফ মনে হচ্ছে না কেন?

জানি না কেন। ইনট্যুশন বলতে পারেন।

ঢাকা শহরে যে কয়টা সেফ বাড়ি আছে তার মধ্যে এটা একটা। আশেপাশের সবাই আমাকে কড়া পাকিস্তানী বলে জানে। মাবুদ খাঁ বলে এক ইনফেনট্রি মেজরের সঙ্গে আমার খুব খাতির। সে সপ্তাহে অন্তত একদিন আমার ঘরে আসে আড্ডা দেবার জন্যে।

আলম কিছু না বলে সিগারেট ধরাল। আশফাক বলল, এখনো কি আপনার এ বাড়ি আনসেফ মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তাহলে সবাই আসুক, তারপর আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। সবাই চুপ করে গেল। আশফাককে দেখে মনে হচ্ছে সে আহত হয়েছে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। নিষ্প্রাণ গলায় বলল, রহমান ভাই, আপনার জ্বর কি কমেছে?

বুঝতে পারছি না। ঘরে থার্মোমিটার আছে?

আছে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল জ্বর একশ-র অল্প কিছু উপরে কিন্তু রহমানের বেশ খারাপ লাগছে। বমির বেগ হচ্ছে। বমি করতে পারলে হয়ত একটু আরাম হবে। সে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগুলো। বাথরুমের দরজা খুলেই হড়হড় করে বমি করল। নাড়ীভুঁড়ি উল্টে আসছে বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। রহমান ক্লান্ত স্বরে বলল, মাথাটা ধুইয়ে দিন তো আশফাক সাহেব। অবস্থা কাহিল।

আলম চিন্তিত মুখে বলল, তোমার শরীর তো বেশ খারাপ। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলবেও না। ডেটটা কি পিছিয়ে দেব?

আরে না। আজই সেই দিন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। বমি করবার পর ভালই লাগছে। ঘণ্টা খানিক থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

রহমান চাদর গায়ে বিছানায় এসে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। নিচে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সাদেকের উঁচু গলায় ফূর্তির ছোঁয়া। যেন তারা সবাই মিলে পিকনিকে যাবার মত কোন ব্যাপার নিয়ে আলাপ করবে। রঙ্গ-তামাশা করবে।

মতিন সাহেব আজ অফিসে যাননি। যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। জামা জুতো পরেছিলেন। দশবার 'ইয়া মুকাদ্দেমু' বলে ঘর থেকেও বেরিয়েছিলেন। পিলখানার তিন নম্বর গেটের কাছে এসে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেলেন। খোলা ট্রাকে করে দু'টি অল্পবয়েসী ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে দু'টির হাত পেছন দিকে বাঁধা। ভাবশূন্য মুখ। একজনের চোখে আঘাত লেগেছে। চোখ এবং মুখের এক অংশ বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে। কালো পোশাক পরা এক দল মিলিশিয়া ওদের ঘিরে আছে। তাদের একজনের হাতে একটি রুমাল। সে রুমাল দিয়ে খেলার ছলে ছেলে দু'টির মাথায় ঝাপটা দিচ্ছে, বাকিরা সবাই হেসে উঠছে। ট্রাক চলছিল। কাজেই দৃশ্যটির স্থায়িত্ব খুব বেশি হলে দেড় মিনিট। এই দেড়মিনিট মতিন সাহেবের কাছে অনন্তকাল বলে মনে হল। সমস্ত ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড হৃদয়হীন কিছু আছে। মতিন সাহেবের পা কাঁপতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। ব্যাপারটা যে শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই ঘটল তা না। তাঁর আশেপাশে যারা ছিল সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। মতিন সাহেবের মনে হল ছেলে দুটিকে ওরা যদি মারতে মারতে নিয়ে যেত তাহলে তাঁর এমন লাগত না। রুমাল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তামাশা করছে বলেই এমন লাগছে। তিনি বাসায় ফিরে চললেন।

পানওয়ালা ইদ্রিস বলল, অফিসে যান না?

না। শরীরটা ভাল না। দেখি একটা পান দাও।

পান খাওয়ার তাঁর দরকার ছিল না। এ সময়ে সবাই অদরকারী কাজগুলি করে, অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। ভয় কাটানোর জন্যেই করে। ভয় তবু কাটে না। যত দিন যায় ততই তা বাড়তে থাকে।

দু'টা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। দেখলে ইদ্রিস মিয়া?

জ্বি দেখলাম। নেন পান নেন।

মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। আজদহা নেমে গেছে।

বলেই তিনি হকচকিয়ে গেলেন। একজন পানওয়ালার সঙ্গে এসব কি বলছেন? ইদ্রিস মিয়া হয়ত তাঁর কথা পরিষ্কার শুনেনি। কিংবা শুনলেও অর্থ বুঝতে পারেনি। সে একটি আগরবাতি জ্বালাল। আগেরটি শেষ হয়ে গেছে।

সুরমা একবার জিজ্ঞেসও করলেন না— অফিসে যাওনি কেন? তিনি নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগলেন। সাবান পানি দিয়ে ঘরের মেঝে নিজের হাতে মুছলেন। কার্পেট শুকাতে দিলেন। বাথরুমে ঢুকলেন প্রচুর কাপড় নিয়ে। আজ অনেকদিন পর কড়া রোদ উঠেছে। রোদটা ব্যবহার করা উচিত।

মতিন সাহেব কি করবেন ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন। তারপরই তাঁর মনে হল অফিসে না গিয়ে তিনি বারান্দায় বসে আছেন এটা লোকজনের চোখে পড়বে। তিনি ভেতরের ঘরে গেলেন। ঝকঝকে মেঝে মাড়িয়ে যেতে খারাপ লাগে। সুরমা কিছু বলছেন না কিন্তু তাকিয়ে আছেন কড়া চোখে। মতিন সাহেব বাগানে গেলেন। বাগান মানে বারান্দার কাছ ঘেঁষে এক চিলতে উঠোন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এখানে শাকসব্জি ফলাবার চেষ্টা করছেন। ফলাতে পারেননি। মরা মরা ধরনের কিছু গাছপালা হয়ে কিছুদিন পর আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়। সার-টার সব দিয়েও একই অবস্থা। নিজেই একবার মাটি নিয়ে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন সয়েল টেস্টিং-এর জন্যে। তারা এক সপ্তাহ পর যেতে বলল। তিনি গেলেন এক সপ্তাহ পর। তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর কামিজ পরা অত্যন্ত স্মার্ট একটি মেয়ে এসে বলল, আপনার স্যাম্পল তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি কষ্ট করে আরেকবার খানিকটা স্যাম্পল দিয়ে যেতে পারবেন? দু' একদিনের মধ্যে নিয়ে আসুন। তিনি নিয়ে যাননি।

কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যে বাগানে কাদা হয়েছে। জুতো শুদ্ধ পা অনেকখানি কাদায় ডেবে গেল। তিনি অবশ্যি তা লক্ষ্য করলেন না। কারণ তাঁর চোখ গিয়েছে কাকরল গাছের দিকে। কাকরল গাছ যে লাগান হয়েছে তা তাঁর মনে ছিল না। আজ হঠাৎ দেখলেন একটা সতেজ গাছ। চড়া সবুজ রঙের পাতা চকচক করছে। তার চেয়েও বড় কথা— পাতার ফাঁকে বড় বড় কাকরল ঝুলছে। কেউ লক্ষ্যই করেনি। একটি

আবার পেকে হলুদ বর্ণ হয়েছে। মতিন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন— রাত্রি, রাত্রি। রাত্রি বাসায় নেই। ভোরবেলায় তাঁর চোখের সামনে গাড়ি এসে নিয়ে গিয়েছে তা তাঁর মনে রইল না। উত্তেজিত স্বরে তিনি দ্বিতীয়বার ডাকলেন— রাত্রি, রাত্রি।

সুরমা ঘর মোছা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ বিষণ্ণ। খানিকটা উদ্বেগ মিশে আছে সেখানে। তিনি বললেন, কি হয়েছে?

সুরমা, কাকরল দেখে যাও। গাছ ভর্তি হয়ে আছে। কেউ এটা লক্ষ্যই করে নাই। কি কাণ্ড!

সুরমা সত্যি সত্যি নেমে এলেন। তাঁর যা স্বভাব তাতে নেমে আসার কথা নয়। নোংরা কাদা থিকথিক বাগানে পা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

সুরমা, দেখ দেখ, পুঁই গাছটার দিকে দেখ। কেন এসব এতদিন কেউ দেখল না?

মতিন সাহেব গভীর মমতায় গাছের পাতায় হাত বুলাতে লাগলেন।

শুধু পুঁই গাছ নয়। রান্নাঘরের পাশের খানিকটা জায়গায় ডাঁটা দিয়েছিলেন। লাল লাল পুরুষ্টু ডাঁটা সেখানে। নিষ্ফলা মাটিতে হঠাৎ করে প্রাণ সঞ্চার হল নাকি? আনন্দে মতিন সাহেবের দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হল। রাত্রিকে খবর দিতে হবে। ওরা এলে এক সঙ্গে সবজি তোলা হবে। তাছাড়া বাগান পরিষ্কার করতে হবে। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। এদের টেনে তুলতে হবে। মাটি কুপাতে হবে। ডাঁটা ক্ষেতে পানি জমেছে, নালা কেটে পানি সরাতে হবে। অনেক কাজ। অফিসে না গিয়ে ভাল হয়েছে। রাত্রিকে খবর দেয়া দরকার। মতিন সাহেব কাদামাখা জুতো নিয়েই শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। রাত্রিকে টেলিফোন করলেন। সুরমা দেখলেন তাঁর ধোয়া-মোছা মেঝের কি হাল হল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

রাত্রিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। নাসিমা বলল, ওর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না। তুমি ঘণ্টাখানিক পরে রিং করবে।

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এখন সে কি করছে?

একজন ভদ্রমহিলা তাকে দেখতে এসেছেন। সে কথা বলছে তাঁর সঙ্গে।

কেন দেখতে এসেছে রাত্রিকে?

কেন তুমি জান না? তোমাকে তো বলা হয়েছে।

নাসিমা ব্যাপারটা কি খুলে বল তো।

এখন বকবক করতে পারব না। রান্নাবান্না করছি। উনি খাবেন এখানে।

কে এখানে খাবেন?

দাদা, পরে তোমাকে সব গুছিয়ে বলব। এখন রেখে দেই। তুমি বরং অপালার সঙ্গে কথা বল। ওকে ডেকে দিচ্ছি।

মতিন সাহেব রিসিভার কানে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপালা আসছেই না। কোন একটা গল্পের বই পড়ছে নিশ্চয়ই। গল্পের বই থেকে তাকে উঠিয়ে আনা যাবে না। তিনি যখন টেলিফোন রেখে দেবেন বলে মন ঠিক করে ফেলছেন তখন অপালার চিকন গলা শোনা গেল।

হ্যালো বাবা।

হুঁ।

কি বলবে তাড়াতাড়ি বল।

মতিন সাহেব উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, তোদের ওখানে কি হচ্ছে?

আপার বিয়ে হচ্ছে।

কি বললি?

আপার বিয়ে হচ্ছে। বিবাহ। শুভ বিবাহ।

কি বলছিস এসব কিছু বুঝতে পারছি না।

অপালা বিরক্ত স্বরে বলল, বাবা, আমি এখন রেখে দিচ্ছি। সে সত্যি সত্যি টেলিফোন রেখে দিল।

রাত্রি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার সামনে বসে আছেন মিসেস রাবেয়া করিম। রাত্রির ধারণা ছিল একজন বুড়োমত মহিলা আসবেন। তাঁর পরনে থাকবে সাদা শাড়ি। তিনি আড়চোখে রাত্রিকে কয়েকবার দেখে ভাসা ভাসা ধরনের কিছু প্রশ্ন করবেন— বাড়ি কোথায়? ক' ভাইবোন? কি পড়? কিন্তু তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য রকম মহিলা। রেডক্রস লাগান কালো একটি মরিস মাইনর গাড়ি নিজে

চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। মহিলাদের গাড়ি চালান এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। অনেকেই চালাচ্ছে। নাসিমাও চালায় কিন্তু এই সময়ে একজন একা একা গাড়ি করে যাওয়া-আসা করে না।

ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। মাথার চুল কাঁচাপাকা। মুখটি কঠিন হলেও চোখ দুটি হাসি হাসি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী একজন মহিলা। রাত্রিকে দেখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে— তোমার ইন্টারভ্যু নিতে এলাম মা। রাত্রি হকচকিয়ে গেল।

প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে নেই। আমি একজন ডাক্তার। মেডিকেল কলেজে গাইনির এসোসিয়েট প্রফেসর। আমার নাম রাবেয়া। তোমার ভাল নামটি কি?

ফারজানা।

তুমি বস এবং বল এত সুন্দর তুমি কিভাবে হলে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। খুব কঠিন প্রশ্ন।

ভদ্রমহিলা হাসতে লাগলেন। রাত্রি কি বলবে ভেবে পেল না।

হঠাৎ করে কেউ সুন্দর হয় না। এর পেছনে জেনেটিক কারণ থাকে। মনের সৌন্দর্য একজন নিজে নিজে ডেভেলপ করাতে পারে কিন্তু দেহের সৌন্দর্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে হয়। বল, তোমার মা এবং বাবা এদের দুজনের মধ্যে কে সুন্দর?

মা।

শোন রাত্রি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তা কিছুই মিন করে না। তোমার পছন্দ-অপছন্দ আছে। এবং আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব খুঁতখুঁতে ধরনের মেয়ে। আমি কি ঠিক বলেছি?

ঠিকই বলেছেন।

ভদ্রমহিলা চা খেলেন। অপালার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন এবং এক পর্যায়ে একটি হাসির গল্প বললেন। হাসির গল্পটি একটি ব্যাঙ নিয়ে। পরপর কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঙটির সর্দি হয়ে গেছে। ব্যাঙ সমাজে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে। বেশ লম্বা গল্প। অপালা মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পর হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল।

ভদ্রমহিলা এসেই বলেছিলেন আধঘণ্টা থাকবেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি তিন ঘণ্টা থাকলেন। দুপুরের খাবার খেলেন। খাবার শেষ করে রাত্রিকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন। অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন, মা, তোমাকে কি আমি আমার ছেলের সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে পারি?

রাত্রি লজ্জিত স্বরে বলল, বলুন।

তার সবচে' দুর্বল দিকটির কথা আগে বলি। ওর থিংকিং প্রসেসটা একটু স্লো বলে আমার মনে হয়। যখন কেউ কোন হাসির কথা বলে তখন সে প্রায়ই বুঝতে পারে না। বোকা মানুষদের মত বলে— ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রাত্রি অবাক হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি এই কথাটি বলবেন তা বোধ হয় সে ভাবেনি।

এখন বলি ওর সবচে' সবল দিকটির কথা। পুরানো দিনের গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের নায়ক আছে যারা জীবনে কোন পরীক্ষাতে সেকেণ্ড হয় না। ও সে রকম একটি ছেলে। মা, আমি খুব খুশি হব তুমি যদি খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বল। আমার ধারণা, কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার ওকে পছন্দ হবে। অবশ্যি ও কথা বলবে কিনা জানি না। যা লাজুক ছেলে।

ছেলেটিকে না দেখেই রাত্রির কেমন যেন পছন্দ হল। কথা বলতে ইচ্ছা হল। তার একটু লজ্জা লজ্জাও লাগল। ভদ্রমহিলা বললেন, মা, তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলবে?

হ্যাঁ বলব।

থ্যাংক য়্যু। যাই কেমন?

যাই বলার পরও তিনি আরো কিছুক্ষণ থাকলেন। নাসিমার সঙ্গে গল্প করলেন। অপালাকে আরো একটি হাসির গল্প বললেন। সেই গল্পটি তেমন জমল না। অপালা গম্ভীর হয়ে রইল।

ওরা মডার্ন নিওন সাইন থেকে বেরুল দুপুর দুটায়। রহমানকে রেখে যেতে হল। কারণ তার উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। আলম চেয়েছিল রহমানকে তার জায়গায় রেখে আসতে। দলের সবাই আপত্তি করল। নাড়াচাড়া করার কোন দরকার নেই। এখানে বিশ্রাম করুক। আশফাক বলল, জহুর মিয়া আছে, সে দেখাশোনা করবে। দরকার হলে চেনা একজন ডাক্তার আছে তাকে নিয়ে আসবে। কোনই অসুবিধা নেই।

আলম গম্ভীর হয়ে রইল। রহমানকে বাদ দিয়ে আজকের অপারেশন শুরু করতে তার মন চাইছে না। এবং কেন যেন জায়গাটাকে তার নিরাপদ মনে হচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে কিছু-একটা হবে।

এ রকম মনে হবার তেমন কোন কারণ নেই। এই শহরে মিলিটারীরা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে। এরা এখানে শংকিত নয়। আলাদাভাবে কোন বাড়িঘরের দিকে নজর দেবে না। নজর দেবার কথাও নয়। সাদেক বল্ল, আলম, তুই এত গম্ভীর কেন? ভয় পাচ্ছিস নাকি? আলম বলল, বেরিয়ে পড়া যাক।

তারা উঠে দাঁড়াল। আশফাককে নিয়ে ছ'জনের একটি দল। আলম বলল, রহমান চললাম। রহমান উত্তর দিল না। তাকিয়ে রইল। তার জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে, চোখ ঘোলাটে। জ্বরের জন্য মুখ লাল হয়ে আছে।

তারা রাস্তায় বেরুতেই একটি মিলিশিয়াদের ট্রাক চলে গেল। মিলিশিয়ারা ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, অল্প কিছুদিন হল এ দেশে এসেছে। নতুন পরিবেশে নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

সাদেক বলল, রওনা হবার আগে পান খেলে কেমন হয়? কেউ পান খাবে?

জবাব পাওয়া গেল না। সাদেক লম্বা লম্বা পা ফেলে পান কিনতে গেল। নুরু বলল, সাদেক ভাইয়ের খুব ফুর্তি লাগছে মনে হয়। হাসতে হাসতে কেমন গল্প জমিয়েছে দেখেন।

সাদেক সত্যি সত্যি হাত-পা নেড়ে কি সব বলছে। সিগারেট কিনে শীস দিতে দিতে আসছে। এই ফুর্তির ভাবটা কতটুকু আন্তরিক বোঝার উপায় নেই। ফুর্তির ব্যাপারটা কারো কারো চরিত্রের মধ্যেই থাকে। হয়ত সাদেকেরও আছে।

আলম আকাশের দিকে তাকাল। নির্মেঘ আকাশ। ঘন নীলবর্ণ। বর্ষাকালের আকাশ এত নীল হয় না। আজ এত নীল কেন?

ছয়

ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাওয়াই শার্ট। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ হবে। কালো ফ্রেমের ভারি চশমার জন্যে বয়স কিছু বেশি মনে হচ্ছে। বেশ লম্বা, হাঁটছেন মাথা নিচু করে। তাঁর ডান হাতে একটি প্যাকেট। বাঁ হাত ধরে একটি মেয়ে হাঁটছে— তার বয়স পাঁচ-ছ'বছর। ভারি মিষ্টি চেহারা। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। ছোট মেয়েটি ক্রমাগত কথা বলছে। ভদ্রলোক তার কোন কথার জবাব দিচ্ছেন না। ভদ্রলোকের কম কথা বলার স্বভাবের সঙ্গে মেয়েটি পরিচিত। তাদের গাড়িটি বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা। তারা ছোট ছোট পা ফেলে গাড়ির দিকে যাচ্ছে। জায়গাটা বায়তুল মোকাররম। সময় তিনটা পাঁচ।

ভদ্রলোকের গাড়িটি নতুন। সাদা রঙের টয়োটা করোলা। ফোর ডোর। রাস্তার বাঁয়ে দৈনিক বাংলার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্যারালাল পার্ক করা। গাড়িটির কাছে পৌঁছতে হলে রাস্তা পার হতে হয়।

তিনি সাবধানে রাস্তা পার হলেন। লক্ষ্য করলেন তাঁর সঙ্গে দুটি ছেলেও রাস্তা পার হল। এরা বারবার তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই ছেলে দু'টি অনেকক্ষণ ধরেই আছে তাঁর সঙ্গে। ব্যাপার কি? তিনি গাড়ির হাতলে হাত রাখামাত্র চশমা পরা লম্বা ছেলেটি এগিয়ে এল।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমার সঙ্গে কি কথা? আমি আপনাকে চিনি না।

ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুললেন। ছেলেটি শীতল কণ্ঠে বলল, গাড়িতে উঠবেন না। আপনার গাড়িটি দরকার। চিৎকার-চেঁচামেচি কিচ্ছু করবেন না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। লম্বা ছেলেটি বলল, আমরা মুক্তিযোদ্ধার একটি গেরিলা ইউনিট, কিছুক্ষণের ভেতর ঢাকা শহরে অপারেশন চালাব। আপনার গাড়িটা দরকার। চাবি দিয়ে দিন।

ভদ্রলোক চাবি তুলে দিলেন।

গাড়িতে কোন সমস্যা নেই তো? ভাল চলে?

নতুন গাড়ি, খুবই ভাল চলে। তেল নেই। আপনাদের তেল নিতে হবে।

নিয়ে নেব।

তেল কিনবার টাকা আছে তো? টাকা না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন।

টাকা আছে।

ভদ্রলোক হাসছেন। তিনি তাঁর মেয়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন। নরম স্বরে বললেন, মা, এদের স্লামালিকুম দাও।

মেয়েটি চুপ করে রইল। তার চোখে স্পষ্ট ভয়। সে অল্প অল্প কাঁপছে।

আপনি এখন থেকে ঠিক দু'ঘণ্টা পর থানায় ডায়েরী করবেন যে আপনার গাড়িটি চুরি হয়েছে। এর আগে কিছুই করবেন না।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকালেন এবং হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের হাত মেয়েদের হাতের মত কোমল।

আমার নাম ফারুক চৌধুরী। আমি একজন ডাক্তার। এ তৃণা, আমার বড় মেয়ে। আজ ওর জন্মদিন। আমরা কেক কিনতে এসেছিলাম।

লম্বা ছেলেটি বলল, আমার নাম আলম। বদিউল আলম, শুভ জন্মদিন তৃণা।

আলম গাড়িতে উঠে দরজা লাগিয়ে দিল। গাড়ি চালাবে গৌরাঙ্গ। আলম বসেছে গৌরাঙ্গের পাশে। পেছনের সিটে সাদেক এবং নূরু।

আশফাকের গাড়িতে থাকবে শুধু নাজমুল। বেশি মানুষের সেখানে থাকার দরকার নেই। এটি হচ্ছে কভার দেয়ার গাড়ি। একটি সেলফ লোডিং রাইফেল হাতে নাজমুল একাই যথেষ্ট। সে মহা ওস্তাদ ছেলে। উৎসাহ একটু বেশি। তবে সেই বাড়তি উৎসাহের জন্যে এখন পর্যন্ত কাউকে বিপদে পড়তে হয়নি। আজও বিপদে পড়তে হবে না।

দু'টি গাড়ি মগবাজার এলাকার দিকে চলল। আশফাকের গাড়িটিতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তার কিছু কিছু সামনের টয়োটায় তুলতে হবে।

আলম ও সাদেকের হাতে থাকবে স্টেইনগান। ক্লোজ রেঞ্জ উইপন। ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এটি একটি চমৎকার অস্ত্র। গেরিলাদের জন্যে আদর্শ। ছোট এবং হালকা। নুরুর দায়িত্বে এক বাক্স গ্রেনেড। নুরু

হচ্ছে গ্রেনেড জাদুকর। নিশানা, ছুঁড়বার কায়দা, টাইমিং কোথাও কোন খুঁত নেই। অথচ এই ছেলে মহা বিপদ ঘটাতে যাচ্ছিল।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া গ্রেনেড ছুঁড়বার ট্রেনিং দিচ্ছেন। পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিলেন—

'পিনটা খুলবার পর হাতে সময় হচ্ছে সাত সেকেণ্ড। খেয়াল রাখবেন সাত সেকেণ্ড। মনে হচ্ছে খুব কম সময়। আসলে অনেক বেশি সময়। সাত সেকেণ্ডে অনেক কিছু করা যায়। ব্রাদারস, খেয়াল রাখবেন সাত সেকেণ্ড অনেক সময়। পিন খুলে নেবার পর যদি শুধু চিন্তা করতে থাকেন 'এই বুঝি ফাটল', 'এই বুঝি ফাটল' তাহলে মুশকিল। মনের ভয়ে তাড়াহুড়া করবেন, নিশানা ঠিক হবে না। খেয়াল রাখবেন, সাত সেকেণ্ড অনেক সময়। অনেক সময়।"

নুরুকে গ্রেনেড দিয়ে পাঠান হল। ছুঁড়বার ট্রেনিং হবে। নুরু ঠিকমতই গ্রেনেডের পিন দাঁত দিয়ে খুলল। তারপর সে আর 'ছুঁড়ে মারছে না। হাতে নিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ময়না মিয়া চেঁচাল, ছুঁড়ে মারেন, ছুঁড়ে মারেন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' নুরু কাঁপা গলায় বলল, আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে, ছুঁড়তে পারছি না। নুরুর মুখ রক্তশূন্য।

বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গেলেন ময়না মিয়া। গ্রেনেড কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। ময়না মিয়া নুরুকে নিয়ে মাটিতে শোবারও সময় পেলেন না। সৌভাগ্যক্রমে কারো কিছু হল না। ময়না মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বললেন, নুরু ভাই, আরেকটা গ্রেনেড ছুঁড়েন। এখন আমি আছি আপনার কাছে। নুরু বলল, আমি পারব না। ময়না মিয়া প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন। তারপর বললেন, যা বলছি করেন।

নুরু গ্রেনেড ছুঁড়ল। সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া বললেন, নুরু ভাই হবেন গ্রেনেড মারায় এক নম্বর।

ময়না মিয়ার কথা সত্যি হয়েছে। ময়না মিয়া তা দেখে যেতে পারেননি। মান্দার অপারেশনে মারা গেছেন।

আলম ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। ময়না মিয়ার কথা মনে হলেই মন দ্রবীভূত হয়ে যায়, বুক হু-হু করে। দেশ স্বাধীন হবার আগে কি দেশের বীরপুত্রদের সবাই শেষ হয়ে যাবে?

আলম।

বল।

গাড়ি কোথাও রাখতে হবে, আমার পেচ্ছাব করতে হবে। কিডনী প্রেসার দিচ্ছে। একটা নর্দমার কাছে গাড়িটা থামা তো গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ গাড়ি থামাল।

গাড়ি এগুচ্ছে খুব ধীরে। যেন কোন রকম তাড়া নেই। গৌরাঙ্গ পেছনের পিকআপটির দিকে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করছে। ব্যাক মিররটা ভাল না। বাঁকা হয়ে আছে। পেছনে কে আসছে দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকা করতে হয়। আলমের মনে হল গৌরাঙ্গ বেশ নার্ভাস।

গৌরাঙ্গ।

বলেন।

পেছনের দিকে লক্ষ্য রাখার তোমার কোন দরকার নেই। তুমি চালিয়ে যাও।

জ্বি আচ্ছা।

এত আস্তে না। আরেকটু স্পীডে চালাও। রিকশা তোমাকে ওভারটেক করছে।

গৌরাঙ্গ মুহূর্তে স্পীড বাড়িয়ে দিল। তার এতটা নার্ভাস হবার কারণ কি? আলম পরিবেশ হালকা করার জন্যে বলল, সেন্ট মেখেছ নাকি গৌরাঙ্গ? গন্ধ আসছে। কড়া গন্ধ।

গৌরাঙ্গ লজ্জিত স্বরে বলল, সেন্ট না। আফটার শেভ দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁফ গজাচ্ছে না। আফটার শেভ কেন?

সবাই হেসে উঠল। গৌরাঙ্গও হাসল। পরিবেশ হালকা করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা। সবার ভাবভঙ্গি এ রকম যেন বেড়াতে যাচ্ছে। আলগা একটা ফুর্তির ভাব। কিন্তু বাতাসে উত্তেজনা। রক্তে কিছু একটা নাচছে। প্রচুর পরিমাণে এড্রেনালিন চলে এসেছে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে। সবার নিঃশ্বাস ভারি। চোখের মণি তীক্ষ্ণ।

গৌরাঙ্গের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে সিগারেট ধরাল। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সিগারেট ধরানোর কৌশলটা চমৎকার। আলম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তামাকের গন্ধ ভাল লাগছে না। গা গুলাচ্ছে। আলম একবার ভাবল, বলে— সিগারেট ফেলে দাও গৌরাঙ্গ। বলা হল না।

সাদেক পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তার চোখ বন্ধ। সে বলল, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। সময় হলে জাগিয়ে দিও। রসিকতার একটা চেষ্টা। স্থূল ধরনের চেষ্টা। কিন্তু কাজ দিয়েছে। নুরু এবং গৌরাঙ্গ দাঁত বের করে হাসছে। সাদেক এই হাসিতে আরো উৎসাহিত হল। নাক ডাকার মত শব্দ করতে লাগল।

গাড়ি নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে সোজা ঢুকল মীরপুর রোডে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি এসে ডানদিকে টার্ন নিয়ে চলে যাবে ফার্মগেট। সেখান থেকে হোটেল ইন্টারকন। কাগজে-কলমে কত সহজ। বাস্তব অন্য জিনিস। বাস্তবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সমস্যা হয়। মিশাখালিতে যে রকম হল। খবর পাওয়া গেল দশজন রাজাকার নিয়ে তিনজন মিলিটারীর একটা দল সুলেমান মিয়ার ঘরে এসে বসে আছে, ডাব খাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সাদেক দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। দু'তিনটা গুলি ছুঁড়লেই রাজাকাররা তাদের পাকিস্তানী বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যাবে। অতীতে সব সময়ই এ রকম হয়েছে কিন্তু সেবার হয়নি। সুলেমান মিয়ার ঘরে যারা বসে ছিল তারা সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কমাণ্ডো ইউনিট। গ্রামে ঢুকেছে গানবোট নিয়ে। সাদেক মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। যাদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে প্রায় রেখে আসতে হয়েছিল। ভয়াবহ অবস্থা।

নাজমুল বলল, আপনার ভয় লাগছে নাকি আশফাক সাহেব?

আশফাক ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার এত ভয় নাই।

অ্যাকশন কখনো দেখেননি এই জন্যে ভয় নেই। একবার দেখলে বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। খুব খারাপ জিনিস।

আশফাক ব্রেকে পা দিল। সামনে একটা ঝামেলা হয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বোধ হয়। একটা ঠেলাগাড়ি উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে হেডলাইট ভাঙা একটা সবুজ রঙের জীপ। প্রচুর লোকজন এদের ঘিরে আছে। আশফাক ভিড় কমাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় কমছে না। একজন ট্রাফিক পুলিশ মেয়েদের মত মিনমিনে গলায় কি সব বলছে, কেউ তার কথা শুনছে না। নাজমুল বিরক্ত স্বরে বলল, ঝামেলা হয়ে গেল দেখি।

আশফাক নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। সে জানালা দিয়ে মাথা বের করে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে সে এই ঝামেলাটায় বেশ মজা পাচ্ছে। কত অদ্ভুত মানুষ থাকে!

ভিড় চট করে কেটে যেতে শুরু করেছে। কারণ হচ্ছে ইপিআর এক নম্বর গেট থেকে একটি সাদা রঙের জীপ বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে।

গৌরাঙ্গ একসিলেটরে পা দিল। নুরু বলল, যাত্রা শুভ না আলম ভাই। যাত্রা খারাপ।

এ ধরনের কথাবার্তা খুবই আপত্তিজনক। মনের উপর বাড়তি চাপ পড়ে। এই মুহূর্তে আর কোন বাড়তি চাপের প্রয়োজন নেই। আলম ঠাণ্ডা গলায় বলল, শুভ কাজের জন্যে যে যাত্রা তা সব সময়ই শুভ। গৌরাঙ্গ স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে। হু-হু করে হাওয়া আসছে জানালা দিয়ে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি আসতেই আবার ব্রেকে পা দিতে হল। গৌরাঙ্গ শুকনো গলায় বলল, আলম ভাই কি করব বলেন? ছুটে বেড়িয়ে যাব?

না, গাড়ি থামাও।

ভাল করে ভেবে বলেন।

গাড়ি থামাও। সবাই তৈরি থাক।

গাড়ি রাস্তার পাশে এসে থামল। আশফাকও তার পিকআপ থামিয়েছে।

তাদের সামনে দুটি গাড়ি থেমে আছে। একটি ত্রিপল ঢাকা ট্রাক, অন্যটি ভোক্সওয়াগন। মুখ কালো করে কয়েকজন লোক গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ভয়ে অস্থির।

যারা গাড়ি থামাচ্ছে তারা মিলিটারী পুলিশ। একেকটা গাড়ি আসছে— হুইসেল দিয়ে হাত ইশারা করছে। গাড়ি থামামাত্র এগিয়ে যাচ্ছে— কাগজপত্র নিয়ে আসছে।

সংখ্যায় তারা চারজন। ভাল ব্যাপার হচ্ছে এই চারজনই দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই। এদের একজনের সঙ্গে রিভলবার ছাড়া অন্য কিছু নেই। বাকি তিনজনের সঙ্গে আছে চাইনিজ রাইফেল।

আলম বলল, সাদেক তুই একা আমার সঙ্গে নামবি। অন্য কেউ না।

গৌরাঙ্গ।

বলুন।

সিগারেট এখন ফেলে দাও।

গৌরাঙ্গ সিগারেট ফেলে দিল। আলম জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাত ইশারা করে ওদের ডাকল। মিলিটারী পুলিশের দলটি ক্রুদ্ধ ও অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখল। হাত ইশারা করে ওদের ডাকার স্পর্ধা এখনো কারোর আছে। তা তাদের কল্পনাতেও নেই। একজন এগিয়ে আসছে, অন্য তিনজন দাঁড়িয়ে আছে।

আলম নামল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তার পেছনে নামল সাদেক। সাদেকের মুখ ভর্তি হাসি।

এরা বুঝতে পারল না এই ছেলে দু'টি ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। এদের স্নায়ু ইস্পাতের মত।

প্রচণ্ড শব্দ হল গুলির। একটি গুলি নয়। এক ঝাঁক গুলি। ফাঁকা জায়গায় এত শব্দ হবার কথা নয়, কিন্তু হল। চারজনেই গড়িয়ে পড়েছে। এখনো রক্ত বেরুতে শুরু করেনি। ওদের মুখে আতংক ও বিস্ময়।

নাজমুল নেমে পড়েছে তার হাতে এস এল আর। আলম বলল, গাড়িতে উঠ নাজমুল। নেমেছ কেন ?

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি একটা ঘোরের মধ্যে আছে। কি হয়ে গেল তারা এখনো বুঝতে পারছে না। স্যাদেক বলল, আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। লোকগুলির একজন শব্দ করে কাঁদছে। কি জন্যে কাঁদছে কে জানে। এখানে তার কাঁদবার কি হল ?

এখানকার ঘটনা প্রচার হতে সময় লাগবে। তারা ফার্মগেটে পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অবশ্যি গুলির শব্দ ওরা হয়ত পেয়েছে। এতে তেমন কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। এই শহরে গেরিলারা এসেছে এটা ওদের কল্পনাতেও নেই।

গাড়ি চলা শুরু করতেই সাদেক বলল, আমার বাথরুম পেয়ে গেছে। কেউ কোন উত্তর দিল না। সাদেক আবার বলল, ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি ? এই কথারও কোন জবাব পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ আবার একটি সিগারেট ধরিয়েছে। তার ফর্সা আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। আলম বলল, ভয় লাগছে গৌরাঙ্গ ?

গৌরাঙ্গ সত্যি কথা বলল।

হ্যাঁ, লাগছে। বেশ ভয় লাগছে।

আলম তাকাল পেছনে। সাদেক চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। স্টেইনগানটি তার কোলে। কেমন খেলনার মত লাগছে। নুরু বসে আছে শক্ত মুখে। আলমের দিকে চোখ পড়তেই সে বলল, কিছু বলবেন আলম ভাই ?

না কিছু বলব না।

সিগারেট ধরাবেন একটা ?

না

ঠিক এই মুহূর্তে কিছুই বলার নেই। কিছুই করার নেই। এটা হচ্ছে প্রতীক্ষার সময়। আলম লক্ষ্য করল বারবার তার মুখে থুথু জমা হচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে ? তার কি ভয় লাগছে ? তার সঙ্গে আছে চমৎকার একটি দল। এরা প্রথম শ্রেণীর কমাণ্ডো ট্রেনিং পাওয়া দল। এদের সঙ্গে নিয়ে যে কোন পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায়। কোন রকম ভয় তার থাকা উচিত নয়। কিন্তু আছে। ভালই আছে। নয়ত বারবার মুখে থুথু জমত না। সেই আদিম ভয় যা যুক্তি মানে না। মনের কোন এক গহীন অন্ধকার থেকে বিড়ালের মত নিঃশব্দে বের হয়ে আসে এবং দেখতে দেখতে ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে। গাড়ির বেগ কমে আসছে। গৌরাঙ্গের চোখ-মুখ শক্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আলম ডাকল, সাদেক সাদেক। সাদেক ভারি গলায় বলল, আমি আছি। গৌরাঙ্গ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আলমের কেমন বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তার জানতে ইচ্ছা করছে অন্যদেরও তার মত হচ্ছে কি-না। কিন্তু জানার সময় নেই। গাড়ি থেমে আছে। মিলিটারীদের তাঁবু দশ-পনেরোগজ দূরে।

দরজা খুলে তিনজনই লাফিয়ে নামল। নাজমুল তখনো নামেনি।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুড়িজনের একটি ইউনিট ছিল ফার্মগেটে। তাদের দলপতি সুবেদার মেজর মাবুদ খাঁ। এই দলটিকে এখানে রাখার উদ্দেশ্য মাবুদ খাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এদের উপর তেমন কোন ডিউটি নেই। মাঝে মাঝে রোড ব্লক করে যে চেকিং হয় তা করে এমপি-রা। ওদের সঙ্গে ইদানীং যোগ দিয়েছে মিলিশিয়া।

তাঁবুর ভেতরটা বেশ গরম কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সৈন্যই ঘুমুচ্ছিল। বা ঘুমের ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল।

যদিও এটা ঘুমুবার সময় নয়। কিছুক্ষণের ভেতরই বৈকালিক চা আসবে। চা আসতে আজ দেরি হচ্ছে। কেন দেরি হচ্ছে কে জানে।

মাবুদ খাঁ তাঁবুর বাইরে চেয়ারে বসে ছিল। শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। কিন্তু তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কোন কাজ নেই। তাঁবুর ভেতর হৈচৈ হচ্ছে। তাস খেলা হচ্ছে সম্ভবত। এই খেলাটি তার অপছন্দ। সে মুখ বিকৃত করল এবং ঠিক তখনই সে লক্ষ্য করল তিনটি ছেলে দৌড়ে আসছে। দীর্ঘদিনের সামরিক ট্রেনিং তার পেছনে। তার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না যে ছেলে তিনটি কেন ছুটে আসছে। সে মুগ্ধ হল এদের অর্বাচিন সাহসে। কিছু একটা বলল চিৎকার করে। সেটা শোনা গেল না। কারণ আকাশ কাঁপিয়ে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে।

চিৎকার, হৈচৈ, আতংকগ্রস্ত মানুষদের ছুটাছুটি। সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে।

নুরু শান্ত। সে দু'টি গ্রেনেড পরপর ছুঁড়েছে। এখন তার করবার কিছু নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। চোখের সামনে যা ঘটছে তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আলম ভাই দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটি ফিট করছেন। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এখন উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। যে বিকট বিস্ফোরণ হয়েছে অর্ধেক শহর নিশ্চয়ই কেঁপে উঠেছে। এয়ারপোর্ট থেকে টহলদারী জীপ নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে।

গৌরাঙ্গ ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

নুরু চেঁচিয়ে বলল, আলম ভাই গাড়িতে উঠেন।

একটি সরকারী বাস যাত্রী নিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। ড্রাইভার বাস থামিয়ে হতভম্ব হয়ে তার সিটে বসে আছে। বাসটি এমনভাবে সে রেখেছে যে গৌরাঙ্গ তার গাড়ি বের করতে পারছে না। সাদেক এগিয়ে গেল। তার হাতে স্টেইনগান। বাস ড্রাইভারকে আশ্চর্যরকম নরম গলায় বলল, ড্রাইভার সাহেব, গাড়িটা সরিয়ে নিন। আমাদের আরো কাজ আছে।

হতভম্ব ড্রাইভার মুহূর্তে তার গাড়ি নিয়ে গেল থার্ড গিয়ারে।

ঘন্টার শব্দ আসছে। দমকল নাকি ?

ওরা গাড়িতে উঠে বসল। গৌরাঙ্গ গাড়িটিকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলম বলল, আস্তে যাও। আস্তে। কোন ভয় নেই।

গাড়ি যাচ্ছে ইন্টারকনের দিকে। এই প্রোগ্রামটিতে কোন ঝামেলা নেই। কেউ গাড়ি থেকে নামবে না। ছুটে যেতে যেতে কয়েকটি গ্রেনেড ছুঁড়তে হবে। হোটেলের বিদেশী সাংবাদিকরা জানবে ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। আলমের মনে হল বড় রকমের ঝামেলা হয়ত ইন্টারকনের সামনেই অপেক্ষা করছে। যেখানে কোন ঝামেলা হবে না মনে করা হয় সেখানেই ঝামেলা দেখা দেয়। আলম বলল, স্পীড কমাও গৌরাঙ্গ। করছ কি তুমি ? মারবে নাকি ?

গৌরাঙ্গ স্পীড কমাল। সাদেক বলল, প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে, কি করা যায় বল তো আলম ?

আলম জবাব দিল না। ইন্টারকন এসে পড়েছে। আলমের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। আবার মুখে থুথু জমছে। গা গুলাচ্ছে।

ছ'টায় কার্ফু শুরু হবে।

রাত্রি সাড়ে পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করল। ফোন ধরলেন সুরমা। তিনি বুঝতে পারছেন রাত্রির গলা কাঁপছে। অনেক চেষ্টা করেও সে তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না।

তিনি নরম গলায় বললেন, কি হয়েছে রাত্রি ?

কিছু হয়নি মা। তুমি কি খবর শুনেছ ?

না। কি খবর ?

টেলিফোনে বলা যাবে না। দারুণ সব কাণ্ড হয়েছে মীরপুর রোডে। ফার্মগেটে। কিচ্ছু জান না ?

না। জানি না।

আমরা বাড়ি আসবার জন্যে গাড়ি বের করেছিলাম। ওরা আসতে দেয়নি। রোড ব্লক করেছে। মা শোন—

শুনছি।

উনি কি এসেছেন ?

না।

বল কি মা ?

সুরমা চুপ করে রইলেন। রাত্রি টেলিফোন ধরে রেখেছে। যেন সে আরো কিছু শুনতে চায়। সুরমা বললেন, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলবি ?

না। মা শোন, উনি এলেই তুমি টেলিফোন করবে।

সুরমা জবাব দিলেন না।

মা।

বল শুনছি।

উনি এলেই টেলিফোন করবে। আমার খুব খারাপ লাগছে মা। আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সুরমার মনে হল উনি কান্নার শব্দ শুনলেন। তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কেন রাত্রি কাঁদছে ? এই বয়েসী একটি মেয়ে যদি কোন পুরুষের কথা ভেবে কাঁদে তার ফল শুভ হয় না। বিয়ের আগে তিনি নিজেও একটি ছেলের জন্যে কাঁদতেন। তার ফল শুভ হয়নি। যদিও সেই ছেলেটির কথা তিনি একবারও ভাবেন না। তবু কোথাও যেন একটা শূন্যতা অনুভব করেন। ছেলেটি তাঁর হৃদয়ের একটি অংশ খালি করে গেছে। সেখানে কোন স্মৃতি সেই, স্বপ্ন নেই, প্রগাঢ় শূন্যতা।

সুরমা টেলিফোন নামিয়ে বসার ঘরে ঢুকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলম এল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। সে সুরমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। সুরমা বললেন, তুমি ভাল আছ তো ?

জ্বি।

সবাই ভাল আছে ?

হ্যাঁ, আপনি কি আমাকে একটু গরম পানি করে দিতে পারবেন ? গরম পানি দিয়ে গোসল করব।

আলম ক্লান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল বারান্দায়। মতিন সাহেব বাগানে কাজ করছেন। আগাছা পরিষ্কার করে বাগানটিকে এত সুন্দর করে ফেলেছেন— শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

সুরমা গরম পানি বাথরুমে দিয়ে আলমকে খবর দিতে গেলেন। আলম হাত-পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। কাপড় ছাড়েনি। পা থেকে জুতা পর্যন্ত খোলেনি।

ঘুমের মধ্যেই আলম একটি অস্ফুট শব্দ করছে। প্রচণ্ড জ্বর হলে মানুষ এমন করে। ওর কি জ্বর ? ঘরে ঢুকবার সময় দেখেছেন চোখ টকটকে লাল। সুরমা আলমের কপালে হাত রাখতেই আলম উঠে বসল।

তোমার পানি গরম হয়েছে।

থ্যাংক য়্যু।

কিন্তু তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

আমার এ রকম হয়। হট শাওয়ার নিয়ে শুয়ে থাকলে জ্বর নেমে যাবে।

আলম তোয়ালে টেনে নিয়ে মাতালের ভঙ্গিতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রি সন্ধ্যা সাতটায় আবার টেলিফোন করল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মা উনি আসেননি। তাই না ?

এসেছে।

এসেছেন তাহলে আমাকে টেলিফোন করনি কেন ? আমি তখন থেকে টেলিফোনের সামনে বসে আছি।

রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সুরমা টেলিফোনে সেই কান্না শুনলেন। তাঁর নিজেরো চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। তিনি নিজেও কিশোরী বয়সে এভাবে কেঁদেছেন। কেউ তার কান্না শুনেনি। তিনি টেলিফোন নামিয়ে রেখে আলমের ঘরে এলেন। আলম খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার মুখে সিগারেট। সে সুরমাকে দেখে সিগারেট নামাল না। সুরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

আলম বলল, আপনি কি কিছু বলবেন ?

সুরমা থেমে থেমে বললেন, তুমি বলেছিলে এ বাড়িতে সাত দিন থাকবে। আজ সাতদিন শেষ হয়েছে।

আমি আগামীকাল চলে যাব। আগামীকাল সন্ধ্যায়।

তোমাকে কি এক কাপ চা বানিয়ে দেব ?

দিন। আপনার কাছে এ্যাসপিরিন আছে ?

আছে। দিচ্ছি। বলেও সুরমা গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আলম বলল, আপনি কি আরো কিছু বলবেন ?

না

মতিন সাহেবের নাক ফুলে উঠছে বারবার। হাত মুঠিবদ্ধ হচ্ছে। কারণ বিবিসি ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের খবর ফলাও করে বলেছে। এত তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছল কিভাবে ? সাহেবদের কর্মদক্ষতার উপর তাঁর আস্থা সব সময়ই ছিল। এখন সেটা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

সুরমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি বললেন, ব্রিটিশদের মত একটা জাত আর হবে না। সুরমা তার কথা বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ বৃটিশ প্রসঙ্গ এল কেন কে জানে।

সুরমা, আজদহারা ছারখার করে দিয়েছে। অর্ধেক ঢাকা শহর বার্ন করে দিয়েছে। একেবারে ছাতু। হ্যাভক।

সুরমা কিছুই বললেন না। মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। রাত্রিকে টেলিফোন করে জানতে হবে বিবিসি শুনছে কিনা।

টেলিফোন ধরল অপালা। সে হাই তুলে বলল, বাবা আপাকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। তার কি জানি হয়েছে, দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এ রকম খুশির দিনে কাঁদছে কেন ?

সাত

রাত্রি ভোরবেলাতেই চলে এসেছে।

সুরমা রান্নাঘরে ছিলেন। সে চলে গেল রান্নাঘরে। সুরমা মেয়েকে দেখে বিস্মিত হলেন। এ কি চেহারা হয়েছে মেয়ের! মুখ শুকিয়ে কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে। চোখ লাল।

তোর কি হয়েছে?

কিছু হয়নি।

ঠিক করে বল কি হয়েছে?

রাতে ঘুম হয়নি মা। সারারাত জেগে ছিলাম।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। রুটি বেলতে লাগলেন। বিন্তি রুটি সেঁকছে এবং নিজের মনেই হাসছে। রাত্রি হালকা গলায় বলল, আজ কি নাশতা মা?

সুরমা কঠিন গলায় বললেন— দেখতেই পাচ্ছিস কি! জিজ্ঞেস করছিস কেন?

রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, আমার উপর কেন তুমি রেগে যাচ্ছ মা? আমি কি কখনো তোমাকে রাগানোর জন্যে কিছু করেছি?

সুরমা উত্তর দিলেন না। রাত্রি আবার বলল, চুপ করে থাকবে না। বল তুমি, কখনো কি তোমাকে রাগানোর মত কোন কারণ ঘটিয়েছি?

সুরমা দেখলেন রাত্রির চোখে জল টলমল করছে। যেন এক্ষুণি সে কেঁদে ফেলবে। তাঁর নিজেরো কান্না পেয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, কেউ যেন আমার এই মেয়েটির মনে কষ্ট না দেয়। বড় ভাল মেয়ে। বড় ভাল।

রাত্রি।

কি মা। আলমের ঘুম ভেঙেছে কিনা দেখে আয়।

বলেই সুরমা পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। কেন রাত্রিকে এই কথা বললেন? তিনি ভালই জানেন আলম জেগে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি তাকে চা দিয়ে এসেছেন। রাত্রিকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি তাকে খুশি করতে চেয়েছেন? কী ভয়ানক কথা! রাত্রি কি তার এই উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে? নিশ্চয় পেরেছে। সে বোকা মেয়ে নয়। নিজেকে সামলাবার জন্যে তিনি থেমে থেমে বললেন—

আজ চলে যাবে। একটু যত্ন-টত্ন করা দরকার।

আজ চলে যাবেন নাকি?

হ্যাঁ। এক সপ্তাহ থাকার জন্যে এসেছিল। এক সপ্তাহ তো হয়ে গেল।

তিনি কি বলেছেন আজ চলে যাবেন?

হ্যাঁ বলেছে।

রাত্রি হালকা পায়ে ঘর ছেড়ে গেল। তার গায়ে একটা ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। শাড়িতে বেগুনি ফুল। কি চমৎকার লাগছে রাত্রিকে। তাঁর মনে হল শুধুমাত্র মেয়েরাই সৌন্দর্য বুঝতে পারে। পুরুষরা না। ওদের নজর থাকে শরীরের দিকে। সৌন্দর্য দেখবার সময় কোথায় ওদের।

আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার কোলের উপর একটি বই। সে পা দোলাচ্ছে। রাত্রিকে ঢুকতে দেখে সে অল্প হাসল।

কখন এসেছেন?

এই তো কিছুক্ষণ আগে। কি বই পড়ছেন এত মন দিয়ে?

আলম একটু উঁচু করে দেখাল 'দত্তা'। রাত্রি হাসিমুখে বলল, অপালা এই বইটা মুখস্থ বলতে পারে। পাঁচ ছ'দিন পর পর এই বইটা সে একবার পড়ে ফেলে।

আলম বলল, আপনি কি অসুস্থ? কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।

না, অসুস্থ না। আমি বেশ ভাল। দেখতে এসেছি আপনি কেমন আছেন। কাল সন্ধ্যাবেলা যা ভয় পেয়েছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে আপনার। কি যে কষ্ট হচ্ছিল আপনি কোনদিন কল্পনাও করতে পারবেন না।

আলমের অস্বস্তি লাগছে। এসব কি বলছে এই মেয়ে? কিন্তু এ তো সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছে।

আলম কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, কাল কি হয়েছে শুনতে চান?

না শুনতে চাই না। যুদ্ধ-টুদ্ধ আমার ভাল লাগে না।

কারোরই ভাল লাগে না।

রাত্রি খাটে আলমের মত পা ঝুলিয়ে বসল। মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। সৌরভ কি মানুষের মনে বিষাদ জাগিয়ে তুলে? তুলে বোধ হয়। আলমের কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি বলল, আপনি নাকি আজ চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ

কখন যাবেন?

বিকালে

আপনি কি ঢাকাতেই থাকবেন, না চলে যাবেন অন্য কোথাও?

ঢাকাতেই থাকব।

আর আসবেন না আমাদের এখানে?

আসব না কেন, আসব।

আমার মনে হচ্ছে আপনি আর আসবেন না।

এ রকম মনে হচ্ছে কেন?

কেউ কথা রাখে না।

রাত্রি হঠাৎ উঠে চলে গেল। কারণ তার চোখ জলে ভরে আসছে। এই জল একান্তই নিজের, লুকিয়ে রাখার জিনিস। সে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

অপালা সেখানে বসে আছে। তার হাতে একটা গল্পের বই। সে বই নামিয়ে বলল, কাঁদছ কেন আপা?

মাথা ধরেছে।

অপালা চোখ নামিয়ে নিল বইয়ে। সে নিজেও কাঁদছে কারণ এই মুহূর্তে সে খুবই দুঃখের একটা ব্যাপার পড়ছে। নায়িকা সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়েছে এবং চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সে আর্তস্বরে চিৎকার করছে— অরুণ! অরুণ! সে ডাক শুনেও নির্বিকার ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে।

সুরমা নাশতা টেবিলে দিয়ে আলমকে ডাকতে এসেছে। আলম জুতো পরছে।

কোথাও বেরুচ্ছ?

জ্বি।

কখন ফিরবে?

বিকেলে এসে বিদেয় নিয়ে যাব।

সুরমা একবার ভাবলেন বলেন, মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু বলতে পারলেন না। যে সব কথা আমরা বলতে চাই তার বেশির ভাগই আমরা বলতে পারি না।

নাশতা খেতে আস বাবা।

আসছি।

মতিন সাহেব ঢাকা রেডিও খুলে বসেছিলেন। বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিচির মিচির করছে একদল বাচ্চা।

আপা, আমি একটা ছড়া বলব। আমার নাম রুমানা— ময়না ময়না কোন কথা কয় না···।

বাহ বাহ বেশ হয়েছে। এবার তুমি আস। পরিষ্কার করে নাম বল।

আপা, আমার নাম সুমন, আমি একটা গান গাইব। রচনা বিদ্রোহী কবি নজরুল— কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা···

চমৎকার হয়েছে। এবার তুমি আস।

মতিন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন— এদের ধরে চাবকান উচিত। এ সময়ে গান গাচ্ছে, ছড়া বলছে, কতবড় স্পর্ধা!

সুরমা এসে বললেন, নাশতা দেয়া হয়েছে। খেতে আস।

মতিন সাহেব শিশুর মত রেগে গেলেন।

যাও, আমি খাব না কিছু। যত ইডিয়টের দল। গান গাইছে, ছড়া বলছে। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয়।

শরীফ সাহেব আলমকে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি যেন মনে মনে তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

মামা কি খবর তোমার?

ভাল। তুই এখনো বেঁচে আছিস?

আছি।

কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম গুলি খেয়েছিস। তখন বুঝলাম তুই ভাল আছিস। আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়।

শরীফ সাহেব কোমরের লুঙ্গি আঁট করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। ন'টা বাজে। অফিসে যাবার জন্য তৈরি হতে হয়। কিন্তু কেন যেন অফিসে যেতে ইচ্ছা করছে না। লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে।

চা খাবি?

না।

কফি। কফি খাবি? একটা ইনসটেন্ট কফি কিনেছি। চা বানানোর মহা হাঙ্গামা। কাজের ছেলেটা আমার একটা স্যুটকেস নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বলতে বলতে তাঁর হাসি পেয়ে গেল। কারণ স্যুটকেসটিতে কিছু পুরানো ম্যাগাজিন ছাড়া কিছু ছিল না। ছাত্র জীবনে কিছু গল্প, কবিতা লিখতেন। তার কয়েকটি ছাপাও হয়েছিল। স্যুটকেস বোঝাই সেই সব ম্যাগাজিনে।

হাসছ কেন?

ব্যাটা খুব ঠক খেয়েছে। স্যুটকেস খুলে হাউমাউ করে কাঁদবে।

আলমের মনে হল, তার মামার হাসির ভঙ্গিটি কেমন যেন অস্বাভাবিক। সুস্থ মানুষের হাসি নয়। অসুস্থ মানুষের হাসি।

আলম।

বল

তোর চিঠি তোর মাকে পৌঁছে দিয়েছি।

মা ভাল আছেন?

জানি না।

জানি না মানে?

দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভাল করেছ। ভাবছি নিজেও চলে যাব। রাতে ঘুম হয় না।

যাও, চলে যাও।

কিন্তু ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে। ফখরুদ্দীন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিলেন? মানিকগঞ্জ তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন বোধ হয় মেরেই ফেলেছে। খাবি তুই কফি?

দাও।

ফার্মগেটের অপারেশনে তুই ছিলি?

হুঁ।

ভালই দেখিয়েছিস।

আলম হাসল। হাসিমুখে বলল, তোমার সামনে সিগারেট খেলে তুমি রাগ করবে?

খেতে ইচ্ছা হলে খা। লায়েক হয়ে গেছিস, এখন তো খাবিই।

কফি ভাল হল না। অতিরিক্ত কড়া হয়ে গেল। হালকা করার জন্য দুধ ও গরম পানি মেশানোর পর তার স্বাদ হল আরো কুৎসিত। শরীফ সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, পেচ্ছাবের মত লাগছে। ফেলে দে। আবার বানাব।

আর বানাতে হবে না। মামা একটা কথা শোন।

বল, শুনছি।

আমি যদি তোমার এখানে থাকি কয়েকদিন তোমার অসুবিধা হবে?

না। আগে যেখানে ছিলি সেখানে কি অবস্থা? জানাজানি হয়ে গেছে?

তা না। ভদ্রমহিলা একটু ভয় পাচ্ছেন। তাছাড়া আমি বলেছিলাম এক সপ্তাহ থাকব। এক সপ্তাহ হয়ে গেছে।

কখন আসবি?

বিকেলে। আমাকে একটা চাবি দাও।

শরীফ সাহেব চাবি বের করে দিলেন। এবং দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করলেন। আলম এখানে থাকলে অফিস মিস করা উচিত হবে না।

আলম।

বল মামা।

একটা সাকসেসফুল অপারেশনের পর ওভার কনফিডেন্ট হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। খুব সাবধান। এরা এখন পাগলা কুত্তার মত। দারুণ সতর্ক। পাগলা কুত্তারা খুব সতর্ক হয় জানিস তো?

আমরাও সতর্ক।

স্বপ্ন দেখে মনটা একটু ইয়ে হয়ে গেল। যদিও জানি আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়। প্রমোশন পাওয়ার একটা স্বপ্ন দেখলাম একবার, হয়ে গেল ডিমোশন। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বানিয়ে বেইজ্জত করল।

শরীফ সাহেব আবার হাসতে শুরু করলেন। অন্য রকম হাসি। অসুস্থ মানুষের হাসি।

বুঝলি আলম, এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে। মে বি ফর ইয়ারস। চায়না কেমন চুপ মেরে আছে দেখছিস না? অন্য দেশগুলি চুপ করে আছে আমি মাইণ্ড করছি না, কিন্তু চায়না পাকিস্তানকে সমর্থন করবে কেন? হোয়াই? মানুষের জন্য মমতা নেই চায়নার এটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। হোয়াই চায়না? হোয়াই?

অফিসে যাবে না মামা?

না ইচ্ছা করছে না। শুয়ে থাকব। সিক রিপোর্ট করব। আসলেই সিক সিক লাগছে। দেখ তো কপালে হাত দিয়ে জ্বর আছে কিনা।

জ্বর নেই।

না থাকলেও হবে। জ্বর হবে, সর্দি হবে, কাশি হবে। ডায়রিয়া হবে।

শরীফ সাহেব শব্দ করে হাসতে লাগলেন। গা দুলিয়ে হাসি।

ঝিকাতলার একটি বাসায় সবাই একত্র হয়েছে। রহমানও আছে। সে এখন মোটামুটি সুস্থ। জ্বর নেমে গেছে। দাড়ি-গোঁফ কামানোয় তাকে বালক-বালক লাগছে। পরবর্তী অপারেশন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। নতুন মানুষের ভেতর মিনহাজ উদ্দিনকে দেখা যাচ্ছে। তার কাছ থেকেই জানা গেল আরো কিছু ছোট ছোট গ্রুপ শহরে ঢুকেছে। এরা পাওয়ার স্টেশন নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দেয়ার কাজটা বাইরে থেকে বোমা মেরে করা যাবে না। সাহায্য আসতে হবে ভেতর থেকে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

সাহায্য করতে সবাই আগ্রহী কিন্তু সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে না। ঠিক লোকটিকে বেছে নিতে হবে। সাহসী এবং বুদ্ধিমান একজন মানুষ। মুশকিল হচ্ছে— এই দু'টি জিনিস খুব কম সময়ই একত্রে পাওয়া যায়। সাধারণত সাহসী লোকদের বুদ্ধি কম থাকে। মিনহাজ সাহেব বললেন, আলম সাহেব, আপনারা যা করছেন এটা হচ্ছে হিরোইজম। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের বীরত্বের দরকার নেই। আমরা এখন চাই ওদের বিরক্ত করতে। বোমা ফাটিয়ে, গ্রেনেড ফাটিয়ে নার্ভাস করে ফেলতে। বুঝতে পারছেন?

পারছি।

কথাগুলি কিন্তু আমার না। কমাণ্ড কাউন্সিলের।

তাও জানি।

এমন সব জায়গায় যান যেখানে মিলিটারী নেই। সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। যেমন ধরুন, পেট্রল পাম্প। পেট্রল পাম্প উড়িয়ে দিন। দর্শনীয় ব্যাপার হবে।

আলম হাই তুলল। মিনহাজ সাহেব একজন বিরক্তিকর মানুষ। কথা বলে মাথার পোকা নড়িয়ে দেয়। একই কথা একশ বার বলে।

আলম সাহেব।
বলুন শুনছি।
আজ আপনাদের কি প্রোগ্রাম?
আছে কিছু।
বলুন শুনি।
বলার মত কিছু না।
মিনহাজ সাহেব মুখ কালো করে ফেললেন। এত অল্পতে মানুষ এমন আহত হয় কেন আলম ভেবে পেল না। মিনহাজ সাহেবের অন্য দল। তাদের সঙ্গে এ দলের কাজকর্মের আলোচনার কি তেমন কোন দরকার আছে? কোন দরকার নেই।

আশফাক তার পিকআপ নিয়ে উপস্থিত হল দু'টার সময়। তার সঙ্গে সাদেক।
আশফাক দাঁত বের করে বলল, নিজের গাড়িই আনলাম। নিজের জিনিস ছাড়া কনফিডেন্স পাওয়া যায় না।
আলম বিরক্ত হয়ে বলল, একই গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয়বার বের হতে চাই না।
সাদেক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ঢাকা শহরে এ রকম পিকআপ পাঁচ হাজার আছে। তুই ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না, উঠে আয়। রোজ একটা করে নতুন গাড়ি পাব কোথায়? ছোট কাজ চট করে সেরে চলে আসব। সবার যাওয়ার দরকার নেই।
গাড়িতে উঠল তিনজন। ড্রাইভারের পাশে আলম। পেছনের সিটে নুরু এবং সাদেক। তারা চলে গেল মগবাজারের একটা পেট্রল পাম্পে। জায়গাটা খারাপ না। ওয়ারলেস স্টেশনের কাছে। ঠিকমত বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে পাকিস্তানীদের বড় ধরনের একটা চমক দেওয়া যাবে।
সবাই বসে রইল পিকআপে। লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে গেল সাদেক। যেতে যেতে শীস দিচ্ছে।
কাঁচের ঘরের ভেতর যে গোলগাল লোকটি বসে ছিল তাকে হাসিমুখে বলল, মন দিয়ে শুনেন কি বলছি। আমরা আপনার এই পেট্রল পাম্পটা উড়িয়ে দেব। আপনি লোকজন নিয়ে সরে পড়ুন। কুইক।
লোকটি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেল। তাকিয়ে রইল মাছের মত। সাদেক বলল, আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?
জ্বি পারছি।
তাহলে দেরি করছেন কেন?
আপনারা মুক্তিবাহিনী?
হ্যাঁ।
লোকটি হাসের মত ফ্যাসফ্যাস গলায় ডাকতে লাগল— হিসামুদ্দিন, হিসামুদ্দিন ও হিসামুদ্দিন!

বিস্ফোরণ হল ভয়াবহ। বিশাল আগুন দাউদাউ করে আকাশ স্পর্শ করল। বিকট শব্দ হতে থাকল। কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। অসংখ্য লোকজন ছুটাছুটি করছে। চিৎকার। হৈ-চৈ। হিসহিস শব্দ হচ্ছে। ভয়াবহ ব্যাপার!
আশফাকের পিকআপ ছুটে চলছে। নুরু ফিসফিস করে বলল, পেট্রল পাম্পে গ্রেনেড না ছোঁড়াই ভাল। এই অবস্থা হবে কে জানত।
ঘন্টা বাজিয়ে চারদিক থেকে ফায়ার ব্রিগেড আসছে। বিস্ফোরণে যারা ভয় পায়নি তারা এবার ভয় পাবে। ফায়ার ব্রিগেডের ঘন্টা অতি সাহসী মানুষের মনেও আতংক ধরিয়ে দেয়।
আলম হঠাৎ করে লক্ষ্য করল পেছন থেকে দৈত্যাকৃতি একটি ট্রাক ছুটে আসছে। অনুসন্ধানী ট্রাক। বিস্ফোরণের রহস্যের সন্ধান করছে নিশ্চয়ই। ট্রাকের মাথায় দুটি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন গানার। এরা কি তাদের পিকআপ থামাবে এবং বলবে— তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছ? বের হয়ে আস। হাত মাথার উপর তোল।
আলমের মাথা ঝিমঝিম করছে। পেটের ভেতর কি জানি পাক খাচ্ছে। এই ট্রাক ওদের থামাবে। নিশ্চয়ই থামাবে। বোঝা যায়। কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে সিক্সথ সেন্স কাজ করে।

আলম ফিসফিস করে বলল, আশফাক সাইড দাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখ সবাই।

আশফাক গাড়ি প্রায় ফুটপাতের উপর তুলে ফেলল। ট্রাক থামল না। গানার দুজন পলকের জন্য তাকাল তাদের দিকে। ওদের চোখ কাঁচের মত ঠাণ্ডা।

সাদেক কপালের ঘাম মুছে বলল, একটা বড় ফাঁড়া কাটা গেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এরা আমাদের জন্যেই এসেছে। আলম, তোর কি এরকম মনে হয়েছে?

আলম জবাব দিল না। সাদেক বলল, কেন জানি দারুণ একটা ভয় লেগে গেল। আমার কখনো এ রকম হয় না। মরার ভয় আমার নেই।

আশফাক সিগারেট ধরিয়েছে। সে বেশ সহজ স্বাভাবিক। সিগারেটে টান দিয়ে একসিলেটরে চাপ দিয়ে হালকা গলায় বলল, চলেন ঘরে ফিরে যাই।

নিউ ইস্কাটনের কাছে এসে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সেই ট্রাকটি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে মুখ করে। গানার দুজন মেশিনগান তাক করে আছে। কিছু সৈন্য নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের একজন মাঝ রাস্তায় চলে এসেছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এবং গাড়ি থামাতে বলছে। এর মানে কি?

আলম ফিসফিস করে বলল, আশফাক, কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা কর। নুরু, দেখ কিছু করতে পার কিনা।

ওরা বন্দুক তাক করছে। বুঝে ফেলেছে এ গাড়ি থামবে না। সাদেক স্টেইনগানের মুখ গাড়ির জানালায় রাখল। নুরু দুটি গ্রেনেডের পিন খুলে হাতে নিয়ে বসে আছে। সাত সেকেণ্ড সময় আছে। সাত সেকেণ্ড অনেক সময়। কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকা যায়।

আশফাকের গাড়ি লাফিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে উড়ে চলে যাবে। নুরু দুটি গ্রেনেডই ছুঁড়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়ার আগেই ওদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল। আলম নিজের স্টেইনগানের উপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল— মাথা ঠাণ্ডা রাখ, মাথা ঠাণ্ডা।

শরীফ সাহেব বাড়ি ফিরবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। তখন খবরটা পেলেন। মিলিটারীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে গেরিলাদের। গেরিলাদের কিছুই হয়নি কিন্তু মিলিটারীদের একটা ট্রাক উড়ে গেছে। এ জাতীয় খবর কখনো পুরোপুরি সত্যি হয় না। উইসফুল থিংকিংয়ের একটা ব্যাপার আছে। বাস্তবে নিশ্চয়ই অন্যরকম কিছু হয়েছে। গেরিলাদের গায়ে আঁচড়ও পড়বে না তা কি হয়!

শরীফ সাহেব খুব আশা করতে লাগলেন যেন সংঘর্ষের খবরটা সত্যি না হয়। সত্যি না হবার কথা। দিনে দুপুরে ওরা কি আর মিলিটারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? অবশ্যি পড়তেও পারে। রোমান্টিসিজম! ওদের যা বয়স তাতে রোমান্টিসিজমই প্রাধান্য পাবে। এ জাতীয় অপারেশনে আসা উচিত মধ্য বয়স্কদের। যারা সাবধানী।

তিনি বাড়ি ফিরে কাপড় না ছেড়েই বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে রইলেন। আলমের জন্যে অপেক্ষা। সে আসছে না। দেরি করছে কেন? খোঁজখবর নেবারও কোন উপায় নেই। সে কোথায় থাকে তাঁর জানা নেই। সাবধানতা! যেখানে ওদের সাবধানী হওয়া উচিত সেখানে না হয়ে অন্য জায়গায়। কোন মানে হয়?

দুপুর তিনটায় নিয়ামত সাহেব টেলিফোন করলেন।

খবর শুনেছেন? ভেরি অথেনটিক।

কি খবর?

গেরিলাদের একটা পিকআপ ধরা পড়েছে। দুজনের ডেড বডি পাওয়া গেছে।

কে বলেছে আপনাকে? যত উড়ো খবর। এইসব খবরে কান দেবেন না। এবং টেলিফোনে এসব ডিসকাসও করবেন না।

শরীফ সাহেব টেলিফোন নামিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসলেন।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন একটা বেবী টেক্সি এসে তাঁর বাড়ির সামনে থেমেছে। বেবী টেক্সি ড্রাইভার এবং একটি অচেনা লোক আলমকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, কি হয়েছে? অপরিচিত লম্বা ছেলেটি বলল, গুলি লেগেছে। আপনারা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করুন। আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার নাম আশফাক। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। এসে ধরুন।

তারা বসার ঘরে ঢুকল। আলমের জ্ঞান আছে। সে হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ চেপে ধরে আছে। ফোঁটা ফোঁটা

রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। তার মুখ রক্তশূন্য। সে একটি কথাও বলছে না। মতিন সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, মা একে ধর। রাত্রি নড়ল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভেতর থেকে সেলাই মেশিনের শব্দ হচ্ছে। আশফাক শান্ত স্বরে বলল, আলম ভাই, আপনি কোন রকম চিন্তা করবেন না। কারফিউয়ের আগেই আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করব। যেভাবেই হোক।

বেবীটেক্সির বুড়ো ড্রাইভারটির মুখ ভাবলেশহীন। যেন এ জাতীয় ঘটনা সে জীবনে বহু দেখেছে।

আশফাক তার ঘরে পৌঁছল পাঁচটায়। এখান থেকে সে যাবে ঝিকাতলা ওদের খবর দিয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। কার্ফু শুরু হবে সাড়ে ছ'টায়। হাতে অনেকখানি সময়।

সে গেঞ্জি বদলে একটা শার্ট পড়ল। অভ্যাস বসে চুল আঁচড়াল, নিচে নামল। গালে ক্রীম দিল। মুখের চামড়া টানছে। এসব শীতকালে হয়। চামড়া শুকিয়ে যায়। কিন্তু তার এখন হচ্ছে কেন? বড্ড ক্লান্ত লাগছে। নিচে নামতে গিয়ে পা কাঁপছে। কেন এ রকম হচ্ছে? সে এখনো বেঁচে আছে। বিরাট ঘটনা। আনন্দে চিৎকার করা উচিত। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে না। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে।

তার জন্যে কালো রঙের জীপ নিয়ে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকজন অপেক্ষা করছে।

আশফাক তোমার নাম?

হ্যাঁ।

চল আমাদের সঙ্গে। তোমার জন্যে গত এক ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

আট

রাত্রি পাথরের মূর্তির মত একা একা বসার ঘরে বসে আছে। দুপুর থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল। এখন বৃষ্টি নামল। প্রবল বর্ষণ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘনঘন বাজ পড়ছে। রাস্তার লোক চলাচল একেবারেই নেই। দু'একটা রিকশা বা বেবীটেক্সির শব্দ শোনামাত্র রাত্রি বের হয়ে আসছে। বোধ হয় ডাক্তার নিয়ে কেউ এসেছে। না কেউ না। কার্ফুর সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর হয়ত একটি রিকশা বা বেবীটেক্সির শব্দ কানে আসবে না। দ্রুতগামী জীপ কিংবা ভারি ট্রাকের শব্দ কানে আসবে। রাত্রি ঘড়ি দেখে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।। সামনের পুকুরে এই অবেলায় একজন লোক গোসল করছে। কোথাও কেউ নেই। এমন ঘোর বর্ষণ-এর ভেতর নিজের মনে লোকটা সাঁতার কাটছে। দেখে মনে হচ্ছে এই লোকটির মনে কত আনন্দ।

জামগাছওয়ালা বাড়ির উকিল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরছিলেন। তাঁর এক হাতে ছাতি, তবু তিনি পুরোপুরি ভিজে গেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে রাত্রিকে দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন মা ? ভেতরে যাও। কখনো বারান্দায় থাকবে না। যাও যাও, ভেতরে যাও। দরজা বন্ধ করে দাও।

রাত্রি বলল, কার্ফু কি শুরু হয়েছে চাচা ?

না, এখনো ঘন্টা খানিক আছে। যাও মা, ভেতরে যাও।

উকিল সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুলেন। তাঁর এক মেয়ে যুথী রাত্রির সঙ্গে পড়ত। মেট্রিক পাস করবার পরই তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছরের মাথায় বাচ্চা হতে গিয়ে যুথী মারা গেল। বিয়ে না হলে মেয়েটা বেঁচে থাকত। মেয়েদের জীবন বড় কষ্টের।

লোকটা পুকুরে এখনো সাঁতার কাটছে। চিৎ হয়ে, কাত হয়ে নানান রকম ভঙ্গি করছে। পাগল নাকি ?

ভেতর থেকে সুরমা ডাকলেন— রাত্রি !

রাত্রি জবাব দিল না। সুরমা বারান্দায় এসে তাঁর মেয়ের মতই অবাক হয়ে সাঁতার কাটা লোকটিকে দেখতে লাগলেন। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, কেউ তো এখনো এল না মা।

সুরমা শান্ত গলায় বললেন, এসে পড়বে। এখনি এসে পড়বে। তুই ভেতরে আয়। আলমের কাছে গিয়ে বস।

রাত্রি বসার ঘরে এসে সোফায় বসল। ভেতরে গেল না। ভেতরে যেতে তার ইচ্ছা করছে না।

মতিন সাহেব একটা পরিষ্কার পুরানো শাড়ি ভাঁজ করে আলমের কাঁধে দিয়েছেন। তিনি দু'হাতে সেই শাড়ি চেপে ধরে আছেন। একটু পরপর ফিসফিস করে বলছেন, তোমার কোন ভয় নাই। এক্ষুনি ডাক্তার চলে আসবে। তাছাড়া রক্ত বন্ধ হওয়াটাই বড় কথা। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

মতিন সাহেবের কথা সত্যি নয়। কাঁধের শাড়ি ভিজে উঠছে। রক্ত জমাট বাঁধছে না। আলম নিঃশ্বাস নিচ্ছে হা করে। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্টভাবে আহ-উহ করছে। কিন্তু জ্ঞান আছে পরিষ্কার। কেউ কিছু বললে জবাব দিচ্ছে। সে একটু পরপর পানি খেতে চাইছে। চামচে করে মুখে পানি দিয়ে দিচ্ছে বিন্তি। এই প্রথম বিন্তির মুখে কোন হাসি দেখা যাচ্ছে না। সে পানির গ্লাস এবং চামচ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। তার সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপালা। সে দারুণ ভয় পেয়েছে। একটু পর পর কেঁপে কেঁপে উঠছে। এক সময় আলম গোঙাতে শুরু করল। অপালা চমকে উঠল। তারপরই কেঁদে উঠে ছুটে বের হয়ে গেল।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। তার মুখ ভাবলেশহীন। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

আলম কাৎরাতে কাৎরাতে বলল, ব্যথাটা সহ্য করতে পারছি না। একেবারেই সহ্য করতে পারছি না।

মতিন সাহেব তাকিয়ে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ডাক্তার এসে পড়বে। একটু ধৈর্য ধর। একটু। রাত্রি, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? কিছু একটা কর।

কি করব বল ?

মতিন সাহেব কিছু বলতে পারলেন না।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর হাওয়া আসছে। বৃষ্টি ভেজা হাওয়া।

জানালা বন্ধ করে দে।

রাত্রি জানালা বন্ধ করবার জন্যে এগিয়ে যেতেই আলম বলল, বন্ধ করবেন না। প্লীজ, বন্ধ করবেন না। সে পাশ ফিরতে চেষ্টা করতেই তীব্র ব্যথায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাকে ডাকতে ইচ্ছা করছে।

ব্যথার সময় মা মা বলে চিৎকার করলেই ব্যথা কমে যায়। এটা কি সত্যি, না এটা সুন্দর একটা কল্পনা ?

খোলা জানালার পাশে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। আহ্‌ কি সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে ! বেঁচে থাকার মত আনন্দ আর কিছুই নেই। কত অপূর্ব সব দৃশ্য চারদিকে। মন দিয়ে আমরা কখনো তা দেখি না। যখন সময় শেষ হয়ে যায় তখনি শুধু হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হয়। রাত্রি কি যেন বলছে। কি বলছে সে ? আলম তার ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ করতে চেষ্টা করল।

আপনি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন। জানালা বন্ধ করে দি ?

না না। খোলা থাকুক। প্লীজ।

এই জানালা বন্ধ করা নিয়ে কত কান্ড হত বাড়িতে। শীতের সময়ও জানালা খোলা না রেখে সে ঘুমুতে পারত না। মা গভীর রাতে চুপিচুপি এসে জানালা বন্ধ করে দিতেন। এই নিয়ে তার কত ঝগড়া।

নিউমোনিয়া হয়ে মরে থাকবি একদিন।

জানালা বন্ধ থাকলে নিউমোনিয়া ছাড়াই মরে যাব মা। অক্সিজেনের অভাবে মরে যাব।

অন্য কারো তো অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে না।

আমার হয়। আমি খুব স্পেশাল মানুষ তো তাই।

সেই খোলা জানালা দিয়ে চোর এল এক রাতে। আলমের টেবিলের উপর থেকে মানিব্যাগ, ঘড়ি এবং একটা ক্যামেরা নিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গেল। সকালবেলা দেখা গেল— চোর তার স্পঞ্জের স্যান্ডেল বাগানে ফেলে গেছে। আলম সেই স্যান্ডেল জোড়া নিয়ে এল। হাসিমুখে মাকে বলল, শোধ-বোধ হয়ে গেল মা। চোর নিয়েছে আমার জিনিস, আমি নিলাম চোরের। এখন থেকে এই স্যান্ডেল আমি ব্যবহার করব।

এই নিয়ে মা বড় ঝামেলা করতে লাগলেন। চিৎকার চেঁচামেচি। চোরের স্যান্ডেল ঘরে থাকবে কেন ? এসব কি কান্ড ! আলম হেসে হেসে বলত, বড় সফট স্যান্ডেল মা। পরতে খুব আরাম।

স্যান্ডেল জোড়া কি আছে এখনো ? মানুষের মন এত অদ্ভুত কেন ? এত জিনিস থাকতে আজ মনে পড়ছে চোরের স্যান্ডেল জোড়ার কথা ?

মতিন সাহেব ঘড়ি দেখলেন। কারফিউর সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছেলেটি কি ডাক্তার নিয়ে আসবে না ? তাঁর নিজেরই কি যাওয়া উচিত ? আশেপাশে ডাক্তার কে আছেন ? একজন লেডি ডাক্তার এই পাড়াতেই থাকেন। তার বাড়ি তিনি চেনেন না। কিন্তু খুঁজে বের করা যাবে। সেটা কি ঠিক হবে ? গুলি খেয়ে একটি ছেলে পড়ে আছে। এটা জানাজানি করার বিষয় নয়। কিন্তু ছেলেটার যদি কিছু হয় ? বৃষ্টি-বাদলার জন্যেই অসময়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। এ অঞ্চলে অল্প হাওয়া দিলেই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। মতিন সাহেব বললেন, একটা হারিকেন নিয়ে আয় তো মা।

রাত্রি ঘর থেকে বেরুবামাত্র আলম দুইবার ফিসফিস করে তার মাকে ডাকল— আম্মি আম্মি। শিশুদের ডাক। যেন একটি নয়-দশ বছরের শিশু অন্ধকারে ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকছে। রাত্রি নিঃশব্দে এগুচ্ছে রান্নাঘরের দিকে। শোবার ঘর থেকে অপালা ডাকল, আপা, একটু শুনে যাও।

অপালা বিছানার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। অসম্ভব ভয় লাগছে তার। সে চাদরের নিচে বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাত্রি ঘরে ঢোকামাত্রই সে উঠে বসল।

কি হয়েছে অপালা ?

খুব ভয় লাগছে।

মার কাছে গিয়ে বসে থাক।

না।

অপালা আবার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত্রি এসে হাত রাখল তার মাথায়। গা গরম। জ্বর এসেছে।

অপালা ফিসফিস করে বলল, আপা, উনি কি মারা গেছেন ?

না, মারা যাবেন কেন ? ভাল আছেন।

তাহলে কোন কথাবার্তা শুনছি না কেন ?

রাত্রি কোন জবাব দিল না। অপালা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি একটু আমার পাশে বসে থাক আপা। রাত্রি বসল। ঠিক তখনি শুনতে পেল আলম আবার তার মাকে ডাকছে। আম্মি। আম্মি।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

সুরমা হারিকেন জ্বালিয়ে রান্নাঘরেই বসে আছেন। রাত্রি ছায়ার মত রান্নাঘরে এসে ঢুকল। কাঁপা গলায় বলল, মা, তুমি উনার হাত ধরে একটু বসে থাক। উনি বারবার তাঁর মাকে ডাকছেন। সুরমা নড়লেন না। হারিকেনের দিকে তাকিয়ে বসেই রইলেন। রাত্রি বলল, মা এখন আমরা কি করব।

সুরমা ফিসফিস করে বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না।

হাওয়ার ঝাপটায় হারিকেনের আলো কাঁপছে। বিচিত্র সব নকশা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে। প্রচন্ড শব্দে কাছে কোথাও যেন বাজ পড়ল। মতিন সাহেব ও-ঘর থেকে চেঁচাচ্ছেন— আলো দিয়ে যাচ্ছ না কেন ? হয়েছে কি সবার ? ভয় পেয়ে অপালা তার ঘরে কাঁদতে শুরু করেছে। কি ভয়ংকর একটি রাত। কি ভয়ংকর !

গত দেড় ঘন্টা যাবত আশফাক একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কোন বোধশক্তি নেই। চারপাশে কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কেও কোন আগ্রহ নেই। তার সামনে একজন মিলিটারী অফিসার বসে আছে। অফিসারটির গায়ে কোন ইউনিফর্ম নেই। লম্বা কোর্তার মত একটা পোশাক। ইউনিফর্ম না থাকায় তার র‍্যাংক বোঝা যাচ্ছে না। বয়স দেখে মনে হয় মেজর কিংবা লেফটেন্যান্ট কর্নেল। জুলপির কাছে কিছু চুল পাকা।

চেহারা রাজপুত্রের মত। কথা বলে নিচু গলায়। খুব কফি খাওয়ার অভ্যাস। আশফাক লক্ষ্য করেছে এই এক ঘন্টায় সে ছয় কাপের মত কফি খেয়েছে। কফি খাওয়ার ধরনটিও বিচিত্র। কয়েক চুমুক দিয়ে রেখে দিচ্ছে। এবং নতুন আরেক কাপ দিতে বলছে। এখন পর্যন্ত আশফাকের সাথে তার কোন কথা হয়নি। আশফাক বসে আছে। অফিসারটি কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং নিজের মনে কি সব লেখালেখি করছে। মনে হচ্ছে আশফাক সম্পর্কে তার কোন উৎসাহ নেই।

ঘরটি খুবই ছোট। তবে মেঝেতে কার্পেট আছে। দরজায় ফুল তোলা পর্দা। অফিস ঘরের জন্যে পর্দাগুলি মানাচ্ছে না। কার্পেটের রঙের সঙ্গেও মিশ খাচ্ছে না। কার্পেট লাল রঙের, পর্দা দুটি নীল। আশফাক বসে বসে পর্দায় কতগুলি ফুল আছে তা গোনার চেষ্টা করছে। তার প্রচন্ড সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেট আছে সঙ্গে, তবে ধরাবার সাহস হচ্ছে না।

মিলিটারী অফিসারটির কাজ মনে হয় শেষ হয়েছে। সে ফাইলপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে আশফাকের দিকে তাকিয়ে চমৎকার ইংরেজীতে বলল, কফি খাবে ? ঝড়বৃষ্টিতে কফি ভালই লাগবে।

আশফাক কোন উত্তর দিল না।

আশফাক তোমার নাম ?

হ্যাঁ।

তোমার গাড়িতে যে দুটি ডেড বডি পাওয়া গেছে ওদের নাম কি ?

আশফাক নাম বলল। অফিসারটির মনে হল নামের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। সে হাই তুলে উঁচু গলায় দু'কাপ কফি দিতে বলল। কফি চলে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

খাও, কফি খাও। আমার নাম রাকিব। মেজর রাকিব। আমি কফিতে দুধ চিনি খাই না। তোমারটাতেও দুধ চিনি নেই। লাগলে বলবে। তুমি সিগারেট খাও ?

হ্যাঁ।

তাহলে সিগারেট ধরাও। স্মোকাররা সিগারেট ছাড়া কফি খেতে পারে না।

আশফাক কফিতে চুমুক দিল। চমৎকার কফি। সিগারেট ধরাল। ভাল লাগছে সিগারেট টানতে। মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। তার চোখ দুটি হাসি হাসি।

আশফাক।

বলুন।

আমরা দুজন পনের মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরুব। ঝড়টা কমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এবং তোমার সহকর্মীরা যেসব জায়গায় থাকে সেসব আমাদের দেখিয়ে দেবে। আমরা আজ রাতের মধ্যেই সবাইকে ধরে ফেলব।

আশফাক তাকিয়ে রইল।

তোমার সাহায্য আমি মনে রাখব এইটুকু শুধু তোমাকে বলছি।

আশফাক নিচু গলায় বলল, ওরা কোথায় থাকে আমি জানি না। মেজর রাকিব এমন ভাব করল যে সে

এই কথাটি শুনতে পায়নি। হাসি হাসি মুখে বলল, কেউ কথা না বলতে চাইলে আমাদের বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। কিছু কিছু পদ্ধতি বেশ মজার। একটা তোমাকে বলি। এক বুড়োকে আমরা ধরলাম গত সপ্তাহে। আমার ধারণা হল সে কিছু খবরাখবর জানে। ভাব দেখে মনে হল কিছু বলবে না। আমি তখন ওর মেয়েটিকে ধরে আনলাম এবং বললাম, মুখ না খুললে আমার একজন জোয়ান তোমার সামনে মেয়েটিকে রেপ করবে। পাঁচ মিনিট সময়। এর মধ্যে ঠিক কর বলবে কি বলবে না। বুড়ো এক মিনিটের মাথায় বলতে শুরু করল।

আশফাক বলল, স্যার আমি এদের কারোরই ঠিকানা জানি না।

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

এরা আমার কাছে এসেছে, আমি ওদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছি। আমি নিজেও মুক্তিযোদ্ধা না।

ওরা তোমাকে জোর করে নিয়ে গেছে, তাই না ? গান পয়েন্টে না গেলে তোমাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলত ?

জ্বি।

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি এই কাজটি করেছ।

জ্বি স্যার।

তা তো করবেই। গান পয়েন্টে কেউ কিছু বললে না শুনে উপায় নেই। শুনতেই হয়।

মেজর রাকিব আরেক কাপ কফির কথা বলল। কফি নিয়ে যে লোকটি ঢুকল তাকে বলল, তুমি একে নিয়ে যাও। ওর দুটি আঙুল ভেঙে আবার আমার কাছে নিয়ে আস। বেশি ব্যথা দিও না।

রাকিব হাসিমুখে তাকাল আশফাকের দিকে এবং নরম গলায় বলল, তুমি ওর সঙ্গে যাও। এবং শুনে রাখ এখন বাজে ন'টা কুড়ি, তুমি ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রচুর কথা বলবে। সবার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে। আমি এই নিয়ে তোমার সঙ্গে দশ হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি।

যে লোকটি আশফাকের ডান হাত নিজের মুঠোয় ধরে রেখেছে তার মুখ গোলাকার। এ রকম গোল মানুষের মুখ হয় ? যেন কম্পাস দিয়ে মুখটি আঁকা। তার হাতটিও মেয়েদের হাতের মত তুলতুলে নরম। লোকটি পেনসিলের মত সাইজের একটি কাঠি আশফাকের দু'আঙলের ফাঁকে রাখল। আশফাকের মনে হচ্ছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। বাস্তবে এ রকম কিছু ঘটছে না। গোলাকার মুখের এই লোকটি তার হাত নিয়ে খেলা করছে। আশফাক নিজেই বুঝতে পারল না যে সে পশুর মত আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠেছে। কেউ কি টেনে তার হাতটি ছিঁড়ে ফেলেছে ? কি করছে এরা ? কি করছে ? তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। দ্বিতীয়বারের মত চিৎকার করেই সে জ্ঞান হারাল।

মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি সুন্দর চেহারা এই লোকটির ! নাদিমের সঙ্গে মিল আছে। নাকটা লম্বা।

আশফাক, তোমার জ্ঞান ফিরেছে মনে হচ্ছে। ভালই হয়েছে। গাড়ি এসে গেছে। চল, যাওয়া যাক। নাকি যাবার আগে আরেক কাপ কফি খাবে ?

আশফাক তাকিয়ে আছে। লোকটি নাদিমের মত লম্বা নয়। একটু খাট। বড়জোর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আশফাক, তুমি ওদের ঠিকানা জান নিশ্চয়ই। জান না ?

কয়েকজনের জানি। সবার জানি না।

ওতেই হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে মাকড়সার জালের মত। একটা সুতার সন্ধান পাওয়া গেলে গোটা জালটা খুঁজে পাওয়া যায়। আশফাক।

বলুন।

চল, রওনা হওয়া যাক।

আমি আপনাকে কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না।

না।

মাত্র দুটি আঙুল তোমার ভাঙা হয়েছে। তোমার হাতে আরো আটটি আঙুল আছে।

আমি কিছুই বলব না।

তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। অনেক সময় ব্যথার পরিমাণ বেশি হলে মাথা গরম হয়ে যায়। তুমি মাথা ঠান্ডা কর। কফি খাও, সিগারেট খাও। তারপর আমরা কথা বলব। নাকি সলিড কিছু খাবে ? গোশত পরোটা ?

আশফাক কিছু বলল না। সে তাকিয়ে আছে তার বাঁ হাতের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কেমন ফুলে উঠেছে। এটি কি সত্যি তার হাত ?

আশফাক গোশত পরোটা খুব আগ্রহ করে খেল। তার এতটা ক্ষিধে পেয়েছিল সে নিজেও বুঝতে পারেনি। ঝাল দিয়ে রান্না করা গোশত। চমৎকার লাগছে। পশ্চিমারা এতটা ঝাল খায় তার জানা ছিল না।

আশফাক !

জ্বি।

আরো লাগবে ?

জ্বি না।

কফি চলবে ?

একটা পান খাব।

পান পাওয়া যাবে না। দোকানপাট বন্ধ। এখন কার্ফু চলছে। সিগারেট আছে তো ? না থাকলে বল।

জ্বি আছে।

চল, তাহলে রওনা দেওয়া যাক।

কোথায় ?

তুমি তোমার বন্ধুদের দেখিয়ে দিবে। বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

আশফাক অনেক কষ্টে এক হাতে দেয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। অনেকখানি সময় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। বেশ লাগছে সিগারেট।

মেজর সাহেব।

বল।

আমি কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না ?

জ্বি না। আপনি তো আমাকে মেরেই ফেলবেন। মারেন। কষ্ট দেবেন না। কষ্ট দেয়া ঠিক না।

মরতে ভয় পাও না ?

জ্বি পাই। কিন্তু কি করব বলেন। উপায় কি ?

উপায় আছে। ধরিয়ে দাও ওদের। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গ্যারান্টি তোমাকে দিচ্ছি।

মেজর সাহেব, এটা সম্ভব না।

সম্ভব না ?

জ্বি না। আমি তো মানুষের বাচ্চা। কুকুর বিড়ালের বাচ্চা তো না।

তুমি মানুষের বাচ্চা ?

জ্বি, আমাকে কষ্ট দিবেন না মেজর সাহেব। মেরে ফেলতে বলেন। কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

মেজর রাকিব দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটির যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান করবার জন্যে তার ইচ্ছা করছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। খবর বের করতেই হবে। এটা একটা মাকড়সার জাল। একটা সুতা পাওয়া গেছে। জালটিও পাওয়া যাবে। যেতেই হবে। মানুষ আসলে একটি দুর্বল প্রাণী। মেজর রাকিব আশফাকের আরো দু'টি আঙুল ভেঙে ফেলার হুকুম দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল।

বাইরে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে।

রাত এগারোটায় টেলিফোন। নাসিমা ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরলেন।

কে ?

ফুফু আমি।

কি ব্যাপার রাত্রি ? গলা এরকম শুনাচ্ছে কেন ? কি হয়েছে ?

কিছু হয়নি। ফুফু তোমার কাছে যে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন মেডিকেল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মিসেস রাবেয়া করিম, উনার টেলিফোন নম্বরটা দাও।

কেন?

খুব দরকার ফুফু। তুমি দাও।

কি হয়েছে বল?

বলছি। নম্বরটা দাও আগে। তোমার পায়ে পড়ি ফুফু।

নাসিমা অবাক হয়ে শুনলেন রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি নম্বর এনে দিলেন।

সেই নম্বরে বারবার টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া গেল না। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না।

মতিন সাহেব ঠিক একই ভঙ্গিতে কাঁধ চেপে ধরে আছেন। তাঁর ধারণা রক্ত বন্ধ হয়েছে। তিনি মনে মনে সারাক্ষণ সুরা এখলাস পড়ছেন।

আলম এখন আর পানি খেতে চাচ্ছে না। খানিকটা আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছে। সুরমা এক কাপ গরম দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। এটা সে খেতে পারল বলে মনে হল।

তার জ্ঞান আছে। ডাকলে সাড়া দেয়। চোখ মেলে তাকায়। সেই চোখ টকটকে লাল।

মতিন সাহেব বললেন, মাথায় জলপট্টি দেয়া দরকার। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সুরমা ভেজা তোয়ালে নিয়ে এস।

ভেজা তোয়ালে দিয়ে কপাল স্পর্শ করতেই আলম কেঁপে উঠল। সুরমা মৃদু স্বরে বললেন, বাবা, এখন রাত দুটো বাজে। ভোর হতে বেশি বাকি নেই। ভোর হলেই যে ভাবেই হোক তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তুমি শক্ত থাক।

আশফাক তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে। মেজর রাকিবের মুখ এমন গোলাকার লাগছে কেন? তার মুখ তো এমন ছিল না। গোল মুখ ছিল ঐ লোকটির যে আঙুল ভাঙে। ভাঙার সময় কেমন টুক করে শব্দ হয়।

আশফাক।

জ্বি।

চিনতে পারছ আমাকে?

জ্বি। আপনি মেজর রাকিব।

তুমি কি এখন বলবে?

জ্বি না। মেজর সাহেব, আপনি আমাকে মেরে ফেলেন, কষ্ট দেবেন না।

মেজর রাকিব তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটি কোন কথা বলবে না এ বিষয়ে সে এখন নিঃসন্দেহ। তার প্রচন্ড রাগ হওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি হতে পারছে না। সে ঠান্ডা গলায় বলল, তুমি কি কিছু খেতে চাও? কফি কিংবা সিগারেট। খেতে চাইলে খেতে পার। চাও কিছু?

জ্বি না। ধন্যবাদ মেজর সাহেব। বহুত শুকরিয়া।

আশফাক।

জ্বি।

তুমি কি বিবাহিত?

জ্বি স্যার।

ছেলেমেয়ে আছে?

জ্বি না।

নতুন বিয়ে?

জ্বি।

স্ত্রীকে ভালবাস?

আশফাক জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মেজর রাকিব সহজ ভঙ্গিতে বলল, জবাব দাও। ভালবাস?

জ্বি স্যার

তাহলে তো ওর জন্যেই বেঁচে থাকা উচিত। উচিত নয় কি?

জ্বি, উচিত।

তাহলে বোকামি করছ কেন ? তোমার কি ধারণা কয়েকটি ছেলে ধরা পড়লে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে ? তা তো না। নতুন নতুন ছেলে আসবে। এবং কে জানে এক সময় যুদ্ধে তোমরা জিতেও যেতে পার। পার না ?

জ্বি স্যার, পারি।

নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। এটা একটা সহজ সত্য। তুমি নেই তার মানে তোমার কাছে পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব নেই— দেশ তো অনেক দূরের কথা। আমি কি ঠিক বলছি ?

জ্বি স্যার, ঠিক।

বেশ এখন তুমি কথা বল। চল আমার সঙ্গে। শুধুমাত্র একজনকে ধরিয়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, ভোরবেলায় তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

আশফাক অনেকক্ষণ মেজর রাকিবের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তাকাল তার ফুলে উঠা হাতের দিকে। আহ কি অসম্ভব যন্ত্রণা। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করে। খুবই ইচ্ছা করে। চল, আশফাক। চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

স্যার, আমি কিছু বলব না।

বলবে না ?

জ্বি না।

দুজন দীর্ঘ সময় দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। মেজর রাকিব বেল টিপে কাকে যেন ডাকল। শীতল গলায় আশফাককে মেরে ফেলবার নির্দেশ দিল। আশফাক বিড়বিড় করে বলল, স্যার যাই। স্লামালিকুম।

আলম কোন সাড়াশব্দ করছে না। তার পা আগুনের মত গরম। কিছুক্ষণ আগেও ছটফট করছিল। এখন সে ছটফটানি নেই। একবার শুধু বলল, পানি খাব। পানি দিন।

মতিন সাহেব চামচে করে পানি দিলেন। সে পানি সে খেল না। মুখ ফিরিয়ে নিল।

পানি চেয়েছিলে তুমি। একটু হা কর।

না।

ব্যথা কি খুব বেশি ?

না বেশি না।

মতিন সাহেব চিন্তিত বোধ করলেন। হঠাৎ করে ব্যথা কমে যাবে কেন ? এর মানে কি ?

আলম ! আলম !

জ্বি।

ভোর হতে খুব দেরি নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজন কাকে খবর দেব বল তো।

আলম জবাব দিল না। মতিন সাহেব এই প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন। আলম বলল, কাউকে বলতে হবে না।

কেন বলতে হবে না। নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কেন বিরক্ত করছেন ?

মতিন সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম বিড়বিড় করে বলল, আমার মাথার নিচে আরেকটা বালিশ দিন।

তার কাছে মনে হচ্ছে তার মাথা ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। টেনে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে অতলান্তিক জলে। কিছুতেই ভাসিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঘরবাড়ি অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সে কি মারা যাচ্ছে ! মরবার আগে সমস্ত অতীত স্মৃতি নাকি ঝলছে উঠে। কই সে রকম তো কিছু হচ্ছে না। চোখের সামনে কিছুই ভাসছে না কোন স্মৃতি নেই। চেষ্টা করেও কোন কিছু মনে করা যাচ্ছে না। যতবার সে কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে ততবারই সাদেকের মুখ ভেসে উঠছে। নুরুর মুখের ছবি আসছে না। অথচ গাড়ি থেকে বের হবার সময় সে এই দুজনের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নুরুকে সে অনেক বেশি পছন্দ করে। অনেক বেশি। কি ঠান্ডা একটা ছেলে। বয়স কত হবে ? কুড়ি একুশ ? তার চেয়েও কম হতে পারে। কোনদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

মতিন সাহেব

কি বাবা ?
আমাদের সঙ্গে দুটি ছেলে ছিল। ওরা মারা গেছে।
বাবা, তুমি চুপ করে থাক। কথা বলবে না। কোন কথা বলবে না।
পানি খাব।
বিন্তি এক চামচ পানি দিল মুখে। রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। সেখান থেকেই সে বলল, আপনার কি এখন একটু ভাল লাগছে ? রাত সাড়ে তিনটা, সকাল হতে বেশি বাকি নেই।
আলমের মাথা আবার কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে। সে কি আবার তলিয়ে যেতে শুরু করেছে ? কিন্তু সে তলিয়ে যেতে চায় না। জেগে থাকতে হবে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।
পাশা ভাইও এ রকম গুলি খেয়েছিল। গুলি লেগেছিল পেটে। ভয়াবহ অবস্থা। কিন্তু পাশা ভাই ছিলেন ইস্পাতের মত। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও বললেন— আমাকে মেরে ফেলা এত সহজ না। সামান্য একটা সিসার গুলি আমাকে মেরে ফেলবে। পাগল হয়েছিস তোরা ? 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী'। কথায় কথায় কবিতা বলতেন। ছড়া বলতেন। দেশের সেরা সন্তানদের আমরা হারাচ্ছি। এরা দেশের শ্রেষ্ঠতম ফসল। এই দেশ বীর প্রসবিনী।
রাত্রির পাশে তার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। কি করুণ লাগছে ভদ্রমহিলার মুখ। আলম একবার ভাবল বলবে, আপনাদের অনেক ঝামেলায় ফেললাম। কিন্তু বলা গেল না। বললে নাটকীয় শুনাবে। বাড়তি নাটকের এখন কোন দরকার নেই। আলম বলল, ক'টা বাজে ?
তিনটা পঁয়ত্রিশ।
মাত্র পাঁচ মিনিট গিয়েছে ? সময় কি থেমে গেছে ? কে একজন ছিল না যে সময়কে থামিয়ে দিয়েছিল ? কি নাম যেন ? মহাবীর থর ? না অন্য কেউ ? সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আবার সাদেকের মুখটা ভাসছে। মৃত মানুষদের কথা এখন আমি ভাবতেই চাই না। কিছুতেই না। আমি ভাবতে চাই জীবিত মানুষদের কথা। মার কথা ভাবতে চাই। বোনের কথা ভাবতে চাই এবং এই মেয়েটির কথাও ভাবতে চাই। রাত্রি ! কি অদ্ভুত না।
আলম পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার সে ডুবে যেতে শুরু করেছে। সে বিড়বিড় করে বলল, মতিন সাহেব মাথাটা একটু উঁচু করে দিন।
রাত্রি একা একা বারান্দায় বসে আছে। সে তাকিয়ে আছে নারকেল গাছের দিকে। সেখানে বেশ কিছু জোনাকি ঝিকমিক করছে। শহরেও জোনাকি আছে তার জানা ছিল না।
ভাল লাগছে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে।
পাশের বাড়িতে দোতলা ফ্ল্যাটে একটি ছোট বাচ্চা কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।
আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটি দু'টি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। রাত্রি লক্ষ্য করল আকাশের তারার সঙ্গে জোনাকিদের চমৎকার মিল আছে।
বাচ্চাটা কান্না থামিয়েছে। হয়ত দুধ বানিয়ে দিয়েছে তার মা। নিশ্চিত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আহ্ শিশুরা কত সুখী !
সুরমা বারান্দায় এসে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল
রাত্রি !
কি মা !
একা একা বসে আছিস কেন ?
রাত্রি জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল জোনাকির দিকে। সুরমা ক্লান্ত স্বরে বললেন, ভোর হতে দেরি নেই।
রাত্রি ঠিক আগের মতই বসে রইল। সুরমা বললেন, তুই চিন্তা করিস না। আমার মনে হয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে। তোর মনে হয় না ?
আমার কিছু মনে-টনে হয় না।
বলতে গিয়ে রাত্রির গলা ধরে গেল। ইচ্ছা করলো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে।
সুরমা বসলেন মেয়ের পাশে। একটি হাত রাখলেন তার পিঠে। অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বললেন, দেশ

স্বাধীন হয়ে যাবার পর আমি আলমের মা'র কাছে গিয়ে বলব— চরম দুঃসময়ে আমরা আপনার ছেলের কাছে ছিলাম। তার উপর আমাদের দাবি আছে। এই ছেলেটিকে আপনি আমায় দিয়ে দিন।

দুজনে অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। রাত্রির চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে লাগল। সুরমা মেয়েকে কাছে টানলেন। চুমু খেলেন তার ভেজা গালে।

রাত্রি ফিসফিস করে বলল, জোনাকিগুলিকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন মা?

জোনাকি দেখা যাচ্ছে না কারণ ভোর হচ্ছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করছে। গাছে গাছে পাখ-পাখালি ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। জোনাকিদের এখন আর প্রয়োজন নেই।

# #